তাজমহল:
হিন্দু মন্দির

তাজমহল হিন্দু মন্দির

মূল রচনা ঃ

—The Taj Mahal is a
Hindu Palace
P. N. Oak.

সন্ধানী আলোতে শাজাহান-মমতাজ
প্রেম কাহিনীর ইতিকথার
অলীকত্বের পর্য্যালোচনা।

ভাষান্তর ঃ দীপক কুমার ভট্টাচার্য
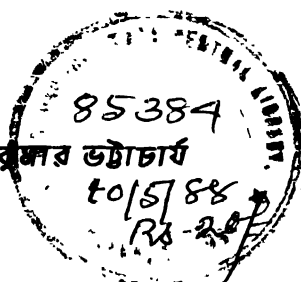
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ছায়া ভট্টাচার্য
১১বি, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : বিজয়কৃষ্ণ দাস
৩৬, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রণে : মহামায়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৬৬বি, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

স্মরণ

(১) যাঁর সাহচর্য ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাকে এই অনভ্যস্ত কর্মে প্রবৃদ্ধ করেছিলো, গুরুতর ঝুঁকি নিয়েও বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সমূহ দায়িত্ব যিনি সানন্দে বহন করেছিলেন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকালে প্রয়াতা আমার সহধর্মিনীকে এই দ্বিতীয় প্রয়াসের প্রাক্কালে হর্ষে ও বেদনায় স্মরণ করছি।

শুক্লা ভট্টাচার্য

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৮

উৎসর্গ

ভারতের মুক্তির যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য যে বীর স্বেচ্ছানির্বাসনের অনিশ্চয়তা বরণ করে নিয়েছেন; পরাজয়, লঞ্ছনা, বিদ্রূপ, কিছুই যাঁর গতিপথ রুদ্ধ করিতে পারে নি, আজো যাঁর অতন্দ্র শৌর্য দেশমাতৃকার দুঃখ নিবারণের উপায় সন্ধানে ব্যস্ত, সেই ভারত-পথিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পুণ্য নামের উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিবেদিত হলো।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রী পি. এন. ওকের চাঞ্চল্যকর বক্তব্য সম্পর্কে পাঠকের সুগভীর আগ্রহের পরিচয় পেয়ে আমরা তাজমহল সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত পুস্তকের বঙ্গানুবাদের একটি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হই। অল্পসময়ের মধ্যেই পাঠকের সমাদর লাভে ধন্য পুস্তকটির সমস্ত মুদ্রিত সংখ্যা নিঃশেষিত হয়। সাহসী হয়ে আমরা বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি।

পূর্বের মত বর্তমান সংস্করণও পাঠকের সমাদর লাভে ধন্য হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো।

তাড়াহুড়ো করে মুদ্রণ শেষ করতে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ পুস্তকটিতে রয়ে গিয়েছে। এরজন্য আগাম ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রকাশক

বিষয় সূচী

অনুবাদকের ভূমিকা

বইটির প্রথম বাংলা সংস্করণ ছাপা হবার কালে জরুরী অবস্থার বিধান নেমে আসে দেশে। শুভার্থীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রকাশ বন্ধ রাখতে। কিন্তু সত্যের প্রতি অবিচল অনুরাগ ও মঙ্গলময়ের করুণার ওপর আস্থা আমাদের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে প্রবুদ্ধ করে।

বইটির বিষয়বস্তু খুবই অভিনব। তিনশো বছর ধরে চলে আসা কল্পকথায় শাজাহান মমতাজের তথাকথিত অলৌকিক প্রেমের মহিমার স্মারক হিসেবে মেনে নেওয়া তাজমহল যে মূলত বহু পূর্বেকার হিন্দু মন্দির প্রাসাদ এবং স্ত্রীর মৃত্যুর অজুহাতে শাজাহান এটি জবরদখল করে অভ্যন্তরস্থ মণিমুক্তো আত্মসাৎ করেছিলেন, বইটির মূল বক্তব্য হচ্ছে তাই।

ইংরেজীর মতো বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরও আমরা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হই। বেশ কিছু সংখ্যক পাঠক (এর মধ্যে তথাকথিত পণ্ডিতেরাও আছেন), আমাদের উন্মাদ আখ্যা দিয়ে মূল বক্তব্য উড়িয়ে দিতে চান। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমাদের সবিনয় নিবেদন, ব্যক্তিগত গালাগাল না দিয়ে আমাদের বক্তব্যের সঠিকতা যে কোন কষ্টিপাথরে যাচাই করুন; প্রয়োজনে প্রশ্ন তুলে সন্দেহ নিরসন করুন। চলে আসা মতবাদই যে সঠিক, এমন সিদ্ধান্ত আঁকড়ে থাকার কি কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে?

সরকারী স্তরে সহযোগিতা আমরা পাইনি, পাবার আশাও রাখিনা। সহৃদয় পাঠক সহজেই এর বিভিন্ন কারণ অনুমান করতে পারেন। বরং, কিছুটা বিরোধিতারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। জরুরী অবস্থার কালে বাংলা অনুবাদকে কেন্দ্র করে পুলিশ কিছুটা তৎপর হয়েছিলেন। কেউ কেউ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়েছেন। আমাদের উত্তর, বক্তব্য সঠিক কিনা যাচাই করুন, দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তোলার কি প্রয়োজন?

সুখের বিষয়, বহুসংখ্যক পাঠক আমাদের যুক্তি ও বক্তব্য সমর্থন করে এবং বিভিন্ন কৌতূহল নিরসনের জন্য প্রশ্ন তুলে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

সরকারী বা বেসরকারী স্তরে যে কোন উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশনের সম্মুখে আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করাতে আমরা আগ্রহী। জনমত গঠন করে সে সুযোগ আমাদের দিন, এই আহ্বানই রাখছি পাঠকের প্রতি।

বর্তমান সংস্করণে 'কার্বন-১৪' পরীক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে, যা মূল গ্রন্থেও নেই। এছাড়া কয়েকটি অধ্যায় পুনর্লিখিত বা পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছে।

বিশদ জানতে ইচ্ছুক পাঠক মূল গ্রন্থকারের সাথে ইংরেজীতে পত্রালাপ করতে পারেন। ঠিকানা:—Shri P. N. Oak, President, Institute for Rewriting Indian History, N-128, Greater Kailash,—1, New Delhi – 48। আগ্রহী হলে অনুবাদকের সাথেও বাংলা বা ইংরেজীতে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

পরম স্নেহভাজন শম্পা ও কল্যাণ নানা ব্যাপারে উৎসাহ জুগিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এদের কাছে ঋণ স্বীকার করে নিচ্ছি।

কোন সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বিন্দুমাত্র আঘাত দেবার ইচ্ছা গ্রন্থকার বা অনুবাদকের নেই, তবু পুস্তকের কোথাও যদি অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি ঘটে থাকে, তার জন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

১১-বি বলাই সিংহ লেন, দীপককুমার ভট্টাচার্য
কলিকাতা-৯

উপক্রমিকা

এই বইটি ছাড়া তাজমহল সম্পর্কে গত তিনশ বছর ধরে যে সমস্ত বই এবং বিবরণী লেখা হয়েছে তার সবটাই কষ্টকল্পনা। তাজমহলের ওপর লেখা নানা বৈচিত্র্যময় মুদ্রিত বইয়ের অভাব অবশ্য নেই। কিন্তু এমন একটাও বইও নেই, যাতে সেই সময়কার ওয়াকিবহাল মহলের উদ্ধৃতি নিয়ে তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো বিবরণ আছে। পরবর্তীকালের আলগাভাবে শোনা বিবরণ কখনই ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসাকে তৃপ্ত করতে পারে না। স্বভাবতই, এরকম একজন লেখকের মতামত অন্য একজনের লেখার চাইতে বেশী মূল্যবান বিবেচনার কারণ নেই।

তাজমহল প্রাসাদ-সমষ্টি পৃথিবী বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও এর সম্বন্ধে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ও অবিসম্বাদীভাবে গ্রহণীয় বিবরণের অভাব সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেন সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বিশ্ববিদ্যালয় এবং তথ্যানুসন্ধান কেন্দ্রসমূহ তাজমহলের উৎপত্তি সংক্রান্ত এতবড় একটা আকর্ষণীয় বিষয়কে পাশ কাটিয়ে গেছেন? কেনই বা এর উৎপত্তি, নির্মাণের আনুমানিক সময়, খরচের পরিমাণ এবং তার সূত্র, বাস্তুকার ও শ্রমিকের পরিচয়, মমতাজকে কবরস্থ করার সঠিক সময় ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়েই একই ধরণের বিভ্রান্ত কষ্টকল্পিত বিবরণী পাওয়া যায়?

একপক্ষে এটা হয়তো ভালই হয়েছে যে, কোন বিদ্বৎসভা তাজমহলের নির্মাণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন সুশৃঙ্খল ও প্রামাণিক বিবরণ তৈরী করতে পারেন নি। চেষ্টা করেছেন অনেকে, কিন্তু সকলেই এ সম্বন্ধে প্রচলিত নানা ধরণের পরস্পর বিরোধী কাহিনীর অরণ্যে হারিয়ে গিয়ে অসহায়ভাবে সেই পুরনো কাসুন্দীই ঘাঁটতে বাধ্য হয়েছেন। পাঠকের সম্মুখে তাঁরা কিছু শিথিল, অযৌক্তিক এবং পরস্পরবিরোধী ঘটনার উল্লেখ করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। অবশ্য তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথার সবটাই সন্দেহজনক। কাজেই, এই ইতিকথাকে ভিত্তি করে তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন প্রামাণিক বিবরণী লেখার চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে শেষ বিশ্বাসযোগ্য কথাটা বলতে কেউই এ পর্যন্ত সফলকাম হননি বা হবেন আশা করতে পারেন না। ভ্রান্ত ধারণার ওপর নির্ভর করার জন্য এ সম্পর্কে সমস্ত পূর্বতন প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

তাজমহল কথাটার মানে হচ্ছে 'আলয়ের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ'। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে প্রমাণ করবো যে, এটি একটি সুপ্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ এবং মুসলমান কবর হিসেবে এর উৎপত্তির ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমরা আরও দেখাবো, তাজমহল সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রচলিত শিথিল রটনাগুলি কিভাবে আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এই বইতে আমরা শাজাহানের সময়কার সরকারী বিবরণী 'বাদশানামা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করা আছে যে, তাজমহল হচ্ছে একটি জোর করে দখল করা হিন্দু প্রাসাদ। ফরাসী বণিক Tavernier থেকেও আমরা উদ্ধৃতি দিয়েছি, যাতে বলা আছে, ভারা বাঁধার খরচ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের খরচের চাইতেও বেশী পড়েছিলো। অর্থাৎ শাজাহানকে যা করতে হয়েছিলো তা হচ্ছে, ঐ প্রাসাদের দেয়ালে কোরাণের বয়েত উৎকীর্ণ করানো মাত্র। আমরা Encyclopaedia Britannica থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছি, যার মর্ম হচ্ছে যে, তাজমহল প্রাসাদ সমষ্টিতে আস্তাবল, অতিথিশালা ও রক্ষীদের থাকবার ঘর আছে। আমরা শ্রীনুরুল হাসান সিদ্দিকীর উদ্ধৃতিও নিয়েছি, যাতে বাদশানামার মতো স্বীকার করা আছে যে, মমতাজকে কবর দেবার জন্য একটি হিন্দু প্রাসাদ দখল করা হয়েছিলো। আমরা শাজাহানের উর্দ্ধতন পঞ্চমপুরুষ বাবরের উদ্ধৃতি নিয়েও প্রমাণ করেছি যে, যে মহিলার স্মৃতিরক্ষার্থে এই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিলো বলে বিশ্বাস, তাঁর মৃত্যুর একশ বছর আগে বাবর স্বয়ং সেই প্রাসাদে বাস করে গেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Vincent Smith-এর মতও আমরা উদ্ধৃত করেছি, যার মর্ম, বাবর এই প্রাসাদেই পরলোকগমন করেন। কার্বন-১৪ পরীক্ষা, আওরেঙ্গজেবের চিঠি, জয়পুর মহাফেজখানায় রক্ষিত শাজাহানের চিঠি, সাম্প্রতিক খননের সাক্ষ্য প্রভৃতি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণও আমরা আলোচনা করেছি। এই সমস্ত প্রমাণ ছাড়াও আমরা শাজাহান-ইতিকথা বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করে আরও নানা বিস্তারিত প্রমাণ দিয়েছি সুনিশ্চিতভাবে এটাই জানাতে যে, তাজমহল একটি সুপ্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ।

যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আমরা এই বইতে দিয়েছি; তা আমাদের আবিষ্কৃত

তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহবাদীনের তুষ্ণীভূত করবে। তাঁরা এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, সমগ্র পৃথিবীর ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেও একটা লোক সত্যি উদ্ঘাটন করতে পারে।

নেহাৎ সৌভাগ্যবশতই, তাজমহল সম্পর্কে আমাদের আগের আবিষ্কৃত তথ্যকে দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা 'বাদশানামা', শ্রীসিদ্দিকীর বই, Tavernier-এর ভ্রমণ পঞ্জীতে উল্লেখিত বিবরণ এবং 'বাবরের স্মৃতিকথাতে' তাজমহল সম্পর্কে অনেক বিবরণ পেয়েছি। এই সুযোগে আমরা পরবর্তীকালের এবং বর্ত্তমানের অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের সতর্ক করে দিতে চাই যে, আমাদের পূর্ববর্ত্তী পুস্তক (তাজমহল রাজপুত প্রাসাদ ছিলো) যে সমস্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিলো তাই একথা ঘোষণা করার পক্ষে যথেষ্ট যে, মমতাজের মৃত্যুর বহু আগেই এই প্রাসাদ বর্ত্তমান ছিলো। পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত প্রমাণ সমূহ এই উক্তিকেই জোরদার করে।

আমরা এই বইতে প্রমাণ করেছি যে তাজমহল তার সূক্ষ্মতম বৈচিত্র্যে নির্মিত হয়েছিলো প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নির্দেশ অনুযায়ী, হিন্দুদের দ্বারা এবং হিন্দুর জন্য। এরপর এটা আশা করা যায় যে, মানসিংহ ও বাবরের অধিকারে আসার আগে তাজমহলের ইতিহাস অনুসরণ করে এর হিন্দু নির্মাতার সম্পর্কে সঠিক বিবরণ জানার চেষ্টা করা হবে। বিকানীরে অবস্থিত রাজস্থান মহাফেজখানায় অথবা জয়পুর রাজপরিবারের অধিকারে রক্ষিত ঐ পরিবারের প্রাচীন বিবরণী থেকেও এই সম্পর্কে মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। তাজমহলের উৎপত্তি 'তেজমহালয়' হিসেবে ১১৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হয়ে থাকতে পারে, এই ইঙ্গিত আমরা বইতে রেখেছি।

যখন আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য প্রথম প্রকাশ করি, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা, অপমান এবং তদপেক্ষা ক্ষতিকর অনেক কিছুর সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। তবু নিজেদের বিশ্বাসে আমরা অটল আছি। উপহাস সবদিক থেকেই এসেছিলো, কিন্তু সবচাইতে বেদনাদায়ক সেইগুলো, যার উৎস প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরা। বেশীর ভাগ লোকই শ্রুতিগোচর ভাবে অথবা অন্য উপায়ে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। আর সাধারণ মানুষ অবিশ্বাসে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে আছে ইতিহাসের অধ্যাপকদের দিকে, যেন তাঁরাই সবজান্তার মতো বলে দেবেন আমরা প্রশংসা বা নিন্দার যোগ্য।

আমরা লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছি যে, পদগত বা শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্বৎসমাজ তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথায় একান্ত বিশ্বাসী। তাঁরা কেউ কেউ এ সম্পর্কে নিজেরা বই লিখেছেন বা বহুল প্রচলিত পথে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের গবেষণায় সাহায্য করেছেন বা করছেন। অনেকে ক্রুদ্ধভাবে এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, আমরা নাকি আমাদের বিবৃতি প্রমাণ করতে পারিনি। এই দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই বিদ্বৎসুলভ নয়। প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানের দিকে তাঁদের লক্ষ্য থাকলে, তাঁরা এ ব্যাপারে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতেন। তাঁরা সঠিক হলে, তা ভরাট করার সুযোগে তাদের আগেকার বিশ্বাসই দৃঢ়ীভূত হতো। আর যদি তাঁরা ভ্রান্ত হন তবে তাঁদের সংস্কারকে আঁকড়ে থাকাটাই অযৌক্তিক।

সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসুকে আমাদের অনুরোধ, প্রচলিত বিশ্বাসে যে সমস্ত অসঙ্গতি দেখিয়েছি, তাকে ভিত্তি করে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান আরো জোরদার করুন। আমাদের বিরুদ্ধে রাগ ও ঘৃণা প্রকাশেই যেন তা থেমে না থাকে প্রচলিত বস্তাপচা ধারণাকে যারা সন্দেহ করে, তাদের দোষ ধরাটাই সত্যি-কারের পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নয়। হয়তো আমাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি প্রচলিত নিয়মানুগ হয়নি। কিন্তু এর ফলশ্রুতি কি দাঁড়াচ্ছে, তা নিয়েই মাথা ঘামানো উচিত। পরে আমাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানাতে চাইলেই তা শোভন হতো।

সৌভাগ্যের কথা, আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য প্রথম প্রকাশিত হবার পর থেকে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল অন্তত কিছু লোক আছেন, যাঁরা আমাদের আবিষ্কারকে উদ্ভট বা একপেশে বলে উড়িয়ে দেন না।

তাজমহলকে 'ইন্দো-সারাসেনীয়' স্থাপত্যবিদ্যার প্রস্ফুটিত কুসুম হিসেবে চিরকাল ভুল করে আসা হয়েছে। আমরা একে প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ হিসেবে প্রমাণিত করেছি। 'ভারতীয় ইতিহাস গবেষণায় কিছু শোচনীয় ভ্রান্তি' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আমাদের আগেকার মতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে এর পর পাঠকদের অসুবিধা হবার কথা নয়। আমাদের মতে, ভারতে উল্লেখযোগ্য যত প্রাচীন মসজিদ এবং কবর আছে, তা সবই হিন্দু প্রাসাদ এবং মন্দির বই কিছুই নয়। অর্থাৎ গোয়ালিয়রে মহম্মদ ঘউসের কবর, আজমীরে মইনুদ্দীন চিশতীর মকবারা, দিল্লীতে নিজমুদ্দীনের কবর প্রভৃতি সবই পুরাতন হিন্দু প্রাসাদ, যা মুসলমানেরা দখল করে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলো।

তাজমহল সম্পর্কে আমাদের আবিষ্কৃত তথ্যের একটি আনুষঙ্গিক হচ্ছে, ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কষ্টকল্পনা বই আর কিছুই নয়। বাস্তুবিদ্যা এবং স্থাপত্য বিদ্যার পাঠ্যসূচী থেকে এই মতবাদ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য অতটা না করলেও চলে, ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্যবিদ্যার জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যা মনে করলেই চলবে।

তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত এই যে, গম্বুজ হিন্দু রীতির স্থাপত্য।

চতুর্থ অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, পশ্চিম এশিয়া এবং ভারতে তাজমহলের মতো দেখতে যত প্রাসাদ আছে, তা সবই হিন্দু স্থাপত্যের কীর্তি। বর্তমান সময়ে আমরা যেমন পৃথিবীতে পাশ্চাত্য শিল্পকলার প্রাচুর্য দেখি, সেই রকম প্রাচীন কালে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন প্রাসাদ যে উদ্দেশ্যেই নির্মিত হোক না কেন, তা হিন্দু স্থাপত্যের অনুসারী ছিলো।

এই বইটি পড়ার পর পাঠক জানবেন, আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য ভারতের এবং পৃথিবীর ইতিহাসের উপর কি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে। তাজমহল সম্পর্কে সমস্ত পর্যটন পুস্তিকা, ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণী এবং অন্যান্য সমস্ত সরকারী প্রকাশন যথোপযুক্ত সংশোধন করার জন্য সরকারের অবিলম্বে অগ্রণী হওয়া উচিত। এই সঙ্গে জনগণেরও উচিত নিজেদের প্রস্তুত করে তোলা, যাতে ইতিহাস এবং পরিবেশ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটে।

তাজমহল হিন্দু মন্দির

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন কাহিনী পুনরায় পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

উত্তর ভারতে যমুনা নদীর তীরে আগ্রা সহরে আছে জাকজমকপূর্ণ অতি সুন্দর কিছু প্রাসাদগুচ্ছ, তাজমহল নামে যার পরিচিত। এটি ভারতে পর্যটকদের আকর্ষণের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র, যার খ্যাতি সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। তিনশো বছরের অবিরত মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত দর্শকেরা তাজের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরিহার করে অভ্যন্তরের দুটি কবরের প্রতিই তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে বাধ্য হন। ফলে এই অপূর্ব প্রাসাদের ইতিহাস ও স্থাপত্যের দিক আলোচনার বহির্ভূতই রয়ে যায়।

আমাদের পুস্তক The Tajmahal was a Rajput Palace'এ পৃথিবীর বিভিন্ন সরকার ও জনসাধারণকে সতর্কিত করার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, তাজমহলের উৎপত্তি মুখ্যতঃ কবর হিসেবে। শুধুমাত্র শোনাকথার উপর নির্ভর করে অজ্ঞ সাধারণ দর্শক বিশ্বাস করেন যে, পঞ্চম মুঘল সম্রাট শাজাহানের অতুলনীয় পত্নীপ্রেমের ফলশ্রুতি এই তাজমহল। তাঁদের বিশ্বাস, পত্নীর মৃত্যুর পর প্রেমের স্মারক হিসেবে সম্রাট এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

ইতিহাসের ছাত্র, শিক্ষক, পণ্ডিত, গবেষক এবং ইতিহাস ও স্থাপত্যবিদ্যার সঙ্গে জড়িত সরকারী কর্মচারীরাও সাধারণ দর্শকের চাইতে বিশেষ অবহিত নন। অধিকপক্ষে, ইতিহাসের অধ্যাপক ও আমলারা তাজ নির্মাণ সম্পর্কে কিছু অকিঞ্চিৎকর বাড়তি তথ্য জানার গৌরব করতে পারেন। এই বাড়তি তথ্য যে সবই অসঙ্গতিপূর্ণ, জাল ও পরস্পরবিরোধী, তার সহজ প্রমাণ পাওয়া যায় এগুলো একত্র জড় করে পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা করলে।

গত তিনশো বছর ধরে শাজাহান কর্তৃক তাজ নির্মাণের ইতিকথা বা কল্পিত বিবরণী এমনভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে যে, কারণ থাকা সত্ত্বেও তা সন্দেহের উদ্রেক করেনি। তাই দেখা যায় জগতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে

ভারতীয় ইতিহাসের প্রবক্তারা বিশেষভাবে বলে চলেছেন যে, তাজ নির্মাণের খরচ চার লাখ টাকাও হতে পারে, ন' কোটি টাকাও হতে পারে, এর নির্মাণের কাল দশ থেকে ২১ বছর, আর তাজের সেই তথাকথিত মহিলা মমতাজ তাঁর মৃত্যুর পর ছয় মাস থেকে নয় বছর পর্যন্ত সময়ের যে কোন ক্ষণে তাজে সমাহিত হয়ে থাকতে পারেন। এগুলো অসংখ্য অসঙ্গতির মাত্র কয়েকটি। এই ধরণের আরো কিছু তথ্যবিকৃতির নজির আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করবো।

প্রথমেই আমরা অবাক হই এই ভেবে যে, কি করে তিনশো বছর ধরে সমগ্র পৃথিবী এই নগ্ন মিথ্যে কথা মেনে নিয়েছে যে, অন্ততঃ ভারতে তাজমহলের মতো মর্মর স্বপ্ন তৈরীর পশ্চাতে দৈহিক ভালোবাসা প্রেরণা জুগিয়েছে। বর্তমান যুগে হয়তো এই ধরণের উদ্ভট কারণ প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ হতে পারে। কিন্তু মধ্যযুগের মুঘল রাজসভার ন্যক্কারজনক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক ঠেকে।

'ব্যয়বহুল স্মৃতিসৌধের' মতবাদে বিশ্বাস করার আগে দুটো প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। প্রথম, হারেমের পাঁচ হাজার রমণীর অন্যতমা মমতাজের জীবিতাবস্থায় তাঁর প্রতি সম্রাটের গভীর আসক্তির কথা কোন ঐতিহাসিক নথিতে নেই। দ্বিতীয়, তাঁর এই প্রিয়তমা (?) মহিষীর বেঁচে থাকা অবস্থায় সম্রাট তাঁর থাকার জন্য কয়টি প্রাসাদ বানিয়েছিলেন, মৃতদেহের ওপর কবর নির্মাণের আগে পর্যন্ত?

এই উভয় প্রসঙ্গেই ইতিহাস নীরব। প্রথমটির উত্তর হচ্ছে এই যে, শাজাহানের ধারাবাহিক প্রেমের কোন লিখিত বিবরণী নেই কেননা, এই ধরণের কোন ভালোবাসার অস্তিত্ব ছিলো না। বিস্ময়কর প্রাসাদ তাজমহলের কবর হিসেবে উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবেই এই প্রেমের কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, জীবিত বা মৃত মমতাজের জন্য শাজাহান কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেন নি।

প্রতি পদেই এই ধরণের বিতর্কমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে জবাব আহরণের এই চেষ্টার আমরা প্রশংসাই করি। এর ফলে গবেষণায় অগ্রসর হবার সিদ্ধান্তগুলো ত্রুটিশূন্য হয়।

আমরা জোরগলায় ঘোষণা করতে চাই যে, মমতাজের প্রতি শাজাহানের সুমহান ভালোবাসার স্মারক হিসেবে তাজের উৎপত্তির কাহিনী পশ্চিমী মানসকে যতই খুশী করুক না কেন, ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মধ্যযুগীয় ভারতে অনুরূপ উদাহরণ নেই, সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোথাও নয়। প্রত্যেক মুঘল শাসকের হারেমে ছিলো কম পক্ষে ৫০০০ হারেমের অধিবাসিনী ছাড়াও অগণিত

নর্মসহচরী। এই সহস্র সহস্র নারীর মাত্র একজনের স্মৃতি জাগরূক রাখার সময় অথবা মনোবৃত্তি কোনটাই তাঁদের ছিলো না।

খুবই বেদনার বিষয় যে, মমতাজের প্রতি শাজাহানের ভালোবাসার ভ্রান্ত ধারণায় বশীভূত ঐতিহাসিকেরা তিনশো বছর ধরে অসংখ্য মিথ্যার জাল বুনে গেছেন। প্রচলিত বিবরণীগুলি মিলিয়ে দেখতেও তাঁরা ভুলে না গেলে বুঝতেন যে এগুলো সবই পরস্পরবিরোধী। তাই, এঁদের লেখা ইতিহাস ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে অজস্র স্ববিরোধী বর্ণনা ও তথ্যের সমাবেশ।

তাজমহল সম্বন্ধে প্রচলিত নানা ধরণের বিবরণী সংগ্রহ ও নথিবদ্ধ করা দুরূহ কাজ। গত তিনশো বছরে শাজাহানের প্রেমাপ্লুতার ইতিকথায় বিশ্বাসী অজস্র লোক পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য কাহিনীর জন্ম দিয়েছেন। আমরা বর্তমান পুস্তকে কিছু নির্বাচিত বিবরণীর আলোচনা করে দেখাবো যে, এগুলো খুবই অবাস্তব ও স্ববিরোধী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাজাহানের নিজের বাদশানামায় স্বীকৃতি।

তাজমহল যে মুসলিম কবর হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে দখল করা হিন্দু প্রাসাদ, তার স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি পাওয়া যায় মোল্লা আবদুল হামিদ লাহোরী নামে একজন বেতনভুক সভাসদ লিখিত শাজাহানের রাজত্বকালের বিবরণ থেকে।

Elliot & Dowson এ লেখা আছে, আবদুল হামিদ লাহোরীর বাদশানামায় শাজাহানের রাজত্বকালের প্রথম ২০ বৎসরের বিবরণ লিখিত আছে…। আবদুল হামিদ নিজে মুখবন্ধে বলছেন যে, আবুল ফজলের আকবরনামার রীতিতে তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য সম্রাট আগ্রহী হলেন।…সম্রাটের কাছে কাজের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করা হয় এবং তাঁর অবসর জীবনযাপনের স্থান পাটনা থেকে তাঁকে ডাকিয়ে এনে এই কাজের ভার দেওয়া হয়। উপরের পরিচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট যে, মোল্লা আবদুল হামিদ শাজাহানের নির্দেশে (ফার্সীতে) বাদশানামা লেখেন রাজত্বের সরকারী বিবরণ হিসেবে। [illegible] মূল ফার্সী পাণ্ডুলিপি বাংলার Asiatic Society প্রকাশ করেছেন।

বাদশানামা

বাদশানামার ৪০২ পাতায় আছে ২২টি এবং ৪০৩ পাতায় আছে ১৯টি পংক্তি।

লাইন অনুযায়ী আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে। (পৃঃ ৪০২)

১। পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ও অন্যায় উৎপীড়নের শিকার হয়ে উভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

২। তাঁর পিতার রাজত্বের কালে কোন এক সময় তিনি মারা গেলেন। এর আগে যেহেতু ফতেখান।

৩। অম্বরের পুত্র, জামিমুদ্দৌলা আসফখানের মারফৎ এক আবেদন পেশ করলেন।

৪। তাঁর আনুগত্য ও প্রভুভক্তির বর্ণনা করে প্রার্থনা করলেন।

৫। এই অনুগত ভৃত্য সবিনয়ে নিবেদন করছে যে, তলিয়ে না দেখে নিষ্ঠুর ভাবে।

৬। বদ-মতলবে আমার বিরোধিতার জন্য রাজকর্মচারীদের মন্ত্রণায়।

৭। আমাকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং আমি রাজকীয় ক্ষমার প্রার্থী হয়েছি। সেই দণ্ডের পরিপূর্ণ পালনের।

৮। জন্যে সম্রাটের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই বক্তব্যের যদি বিন্দুমাত্র ও সত্যতা না থাকে।

৯। তবে এই পৃথিবী থেকে এরূপ লোকেয় অস্তিত্ব মুছে দেওয়া উচিত। যেহেতু ফতেখান।

১০। ঐ রাজকীয় হুকুম পেয়ে, যা সারা পৃথিবীতে মান্য হয়, তার কুশাসনের সপক্ষে নানা যুক্তি ও অজুহাতের অবতারণা করলেন।

১১। এবং একে স্বাভাবিক মৃত্যুর চেহারা দিতে চাইলেন, দারাসালের পুত্র হোসেন কে।

১২। অবৈধভাবে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা হলো এবং সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ করে।

১৩। তাঁর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী মোহম্মদ ইব্রাহীমের মারফৎ এক আবেদন পেশ করা হলো।

১৪। রাজাদের রক্ষক সম্রাটের দরবার থেকে এক আদেশজারী হলো যা সর্বাংশে মান্য করতে হবে।

১৫। যে এই আবেদনকারীকে দওলাতাবাদ দুর্গে নিয়ে গিয়ে অনাহারে মারা হবে।

১৬। এবং তিনি সমস্ত আড়ম্বর ও গৌরবের সাথে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের

১৭। ঐতিহ্য অনুযায়ীই তাঁকে সমারোহের সাথে বিদায় জানানো হলো যাতে বোঝা যায় যে, তাঁর প্রার্থনা পূরণ হয়েছে।

১৮। সেই দয়ালু রাজকীয় ফরমান আর তার সঙ্গে দুটো ঘোড়া যার একটা ইরাকী, সোনালী জিন সহ।

১৯। অপরটা তুর্কী, অলঙ্কারপূর্ণ এর জিনটিও সোনালী। শুকরুল্লাহ আরব ও ফতেখান।

২০। এগুলো নিয়ে দওলাতাবাদ গেলেন আর উদজাহান কে ৪০০০০ টাকা দিয়ে সম্মান দেখানো হলো।

২১। শুক্রবার—১৫ জমাদিয়ল আওল, স্বর্গরাজ্যের পথিকের পবিত্র মৃতদেহ।

২২। হজরত মুমতাজুল জামানি যিনি সাময়িকভাবে সমাহিত ছিলেন, পাঠানো হলো। (পৃঃ ৪০৩)

২৩। সঙ্গে গেলেন রাজপুত্র মোহম্মদ শাহসুজা বাহাদুর, ওয়াজির খান।

২৪। এবং সতিউন্নিসা খানম, যিনি মৃতার মেজাজ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন।

২৫। (পরিচারিকার) কাজে ছিলো তাঁর দক্ষতা এবং মহামান্যা মহিষীর মতামত তাঁর মাধ্যমেই ব্যক্ত হতো।

২৬। রাজধানী আকবরাবাদে (আগ্রায়) মৃতদেহ আনীত হবার পর সেই দিনই এক আদেশ জারী হলো।

২৭। যে ঐ মরদেহ নিয়ে যাত্রায় ফকির ও দুঃস্থদের অজস্র অর্থ বিতরণ করা হোক। ঐ স্থানটিতে

২৮। বিশাল নগরীর দক্ষিণে একটি অতিসুন্দর, বর্ণময় উদ্যান শোভিত ছিলো এবং

২৯। সেই উদ্যান পরিবেষ্টিত করেছিলো রাজা মানসিংহের মঞ্জিল নামে পরিচিত প্রাসাদ, যার বর্তমান উত্তরাধিকারী জয়সিংহ।

৩০। মানসিংহের নাতি। নির্বাচন করা হলো সম্রাজ্ঞীর সমাধির জন্য,

৩১। যদিও তাঁর পৈত্রিক ঐতিহ্যময় এই সম্পত্তিকে জয়সিংহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, তথাপি সম্রাট শাজাহানের মনতুষ্টির জন্য বিনামূল্যে এটি ছেড়ে দিতে তার হয়তো আপত্তি হতো না।

৩২। কিন্তু শোকাভিভূত হলেও ধর্মীয় অনুশাসনের বলে (বিনামূল্যে প্রাসাদটি দখল করা অনুচিত মনে করে)

৩৩। সেই আলি মঞ্জিলের (বৃহৎ প্রাসাদ) পরিবর্তে জয়সিংহকে এক টুকরো সরকারী জমি দেওয়া হলো।

৩৪। ১৫ জমাদিয়ল সানিয়াতে মৃতদেহ সেই সুমহান নগরী আগ্রায় আনীত হবার পর।

৩৫। পরের বৎসর সেই স্বর্গতা মহিষীর পবিত্র দেহ সমাহিত করা হলো।

৩৬। রাজকীয় আদেশে সরকারী কর্মচারীরা আকাশচুম্বী সুউচ্চ স্মৃতি-সৌধে।

৩৭। সেই পুণ্যাত্মা মহিষীর মরদেহ জগতের চক্ষু থেকে লুক্কায়িত রাখলেন এবং এই প্রাসাদ (ইমারত এ আলিশান) খুবই সমারোহ পূর্ণ ও একটি গম্বুজ শোভিত ছিলো।

৩৮। এবং সুউচ্চ এই প্রাসাদটি মনে করিয়ে দেয় আকাশ ছোঁয়া সাহসের কথা।

৩৯। 'সাহেব কিরাণে সানী, সম্রাটের, যিনি শৌর্যে অতুলনীয় এবং।

৪০। প্রতিজ্ঞায় অনড়। ভিত্তি শুরু হলো এবং দূরদর্শী জ্যামিতিবিদ ও প্রতিভাধর শিল্পীদের আনা হলো।

৪১। ঐ নির্মাণের কাজে খরচ হলো ৪০ লক্ষ টাকা।

বাংলায় অর্থগ্রাহ্য ভাবে লাইনগুলি সাজালে তা হবে :

"মমতাজ-উল-জামানির মৃতদেহ যা বুরহানপুরে সমাধিস্থ ছিল (কেননা তিনি সেখানে মারা গিয়েছিলেন) উত্তোলন করা হয় (ছয় মাস পর) এবং নিয়ে যাওয়া হয় আকবরাবাদে (ওরফে আগ্রায়)। সঙ্গে ছিলেন শাজাহানের পুত্র মোহাম্মদ শাহ্ সুজা বাহাদুর, ওয়াজির খান ও (পরিচারিকা) সত্তুউন্নিসা খানম যিনি মৃত মহিষীর স্বভাবের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতা ছিলেন এবং সম্রাজ্ঞীর অভ্যাস এবং প্রয়োজন যিনি ভালভাবেই জানতেন। আগ্রায় মৃতদেহটি উপস্থিত হওয়ার পর শবযাত্রার প্রারম্ভে ফকীর ও অন্যান্য দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে মুদ্রা বিতরিত হয়। সমাধির জন্য বাছাই করা হয়েছিলো একটা প্রকাণ্ড সুন্দর বাগান যা 'রাজা মানসিংহের প্রাসাদ'কে ঘিরে ছিলো। মানসিংহের প্রপৌত্র জয়সিংহ তখন সেই প্রাসাদের অধিকারী ছিলেন। জয়সিংহ যদিও কোন মূল্য ছাড়াই পৈত্রিক সম্পত্তি হাতছাড়া করতে স্বীকৃত ছিলেন, তবু কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে প্রাসাদটি নিয়ে নেওয়া সঙ্গত মনে করা হয়নি। কাজেই জয়সিংহকে একখণ্ড সরকারী জমি দেওয়া হয়েছিলো সেই বিরাট প্রাসাদের (আলীমঞ্জিলের) বদলে। মৃতদেহটি আগ্রায় এসেছিলো ১৫ই জমাদিয়ুল সানীতে। পরের বৎসর রানীকে সমাহিত করা হয়। সরকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা গগনচুম্বী প্রকাণ্ড স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে মৃতদেহটি সমাহিত করেন। এই স্মৃতিসৌধটি একটি অভূতপূর্ব জাকজমকপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রাসাদ যার উপরে আছে একটি গম্বুজ (ইমারত-এ আলিশান-ওয়া গুম্বজে)। তারপর কিছু জ্যামিতিক (নক্সাকারক)-দের ডাকা হয়েছিলো এবং মোট ব্যয় হয়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা।"

উপরের উদ্ধৃতিটি সুসংবদ্ধ ও প্রাঞ্জল করার জন্য কয়েকটি প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে দেওয়া দরকার।

সম্রাট শাজাহানের পত্নী আর্জুমন্দ বানু বুরহানপুরে ১৬২৯ থেকে ১৬৩২ এর মধ্যে কোন এক সময় মারা যান। ওখানকারই এক বাগানে তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। কিন্তু কথিত আছে যে, পরে তা উত্তোলন করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই একটি মাত্র বর্ণনাই চিন্তাশীল এবং বিবেচক পাঠককে সতর্ক করার পক্ষে যথেষ্ট যে, শাহাজান নিশ্চয়ই হাতের কাছে একটা তৈরী করা প্রাসাদ পেয়েছিলেন। তা না হলে, কেন তিনি শান্তিতে সমাহিত

একটি মৃতদেহ উত্তোলন করিয়ে ৬০০ মাইল দূরে আগ্রায় নিয়ে যাবেন? কোন উদ্দেশ্য ছাড়া তিনি এই দেহটিকে একটি উন্মুক্ত কবর থেকে আরেকটিতে স্থানান্তরিত করতে চাইবেন না। সাধারণ লোকের মৃতদেহও এতটা নাড়াচাড়া করা হয় না, রানীর ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, বিশেষ—সেই রানী যদি অত্যধিক ভালোবাসার পাত্রী হিসাবে উল্লেখিত থাকেন। সঠিক ইতিহাস গবেষণার পক্ষে অপরিহার্য প্রত্যেক পর্যায়ে এই ধরণের সতর্ক অনুসন্ধান ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত খুব একটা দেখা যায়নি।

মমতাজের মৃতদেহ বুরহানপুর থেকে সরানো হয়েছিলো (যদি আদৌ হয়ে থাকে) কেননা, ঐ সময়ের মধ্যে তাঁকে আগ্রায় পুনরায় সমাহিত করার জন্য জয়সিংহের প্রাসাদের দখল নেওয়া হয়ে গিয়েছিলো। আগ্রায় তাঁর সমাধির জন্য নির্বাচিত জায়গাটিতে ছিলো তৃণরাশি ('সব্জ জমিনি'—বাদশানামার মতে)।—এটাই দেখাচ্ছে যে, ঐ জায়গাটিতে ছিলো রসালো বৃক্ষশোভিত উদ্যান। এই প্রাঙ্গনের অভ্যন্তরে ছিলো মানসিংহের প্রাসাদ (মঞ্জিল), যা তখন ছিলো তাঁর পৌত্র জয়সিংহের অধিকারে। একথা বাদশানামাতেই লেখা আছে।

অবশ্য রাজা মানসিংহের প্রাসাদ বললেই বোঝায় না যে, মানসিংহ এই প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। বরং বোঝাচ্ছে যে, জয়সিংহের আমলে এটি মানসিংহের প্রাসাদ নামেই খ্যাত ছিলো কেননা, মানসিংহ ছিলেন এর শেষ বিখ্যাত অধিপতি। এটা ছিলো মানসিংহের অধিকারে আসা একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখতে হবে যে, ঠিক উত্তরাধিকারের সূত্রেই যে এই প্রাসাদটি মানসিংহে বর্তেছিলো, তা নাও হতে পারে। অন্যান্য সম্পত্তির মতো এই ধরণের প্রাসাদও বদল, বিক্রী, দান, যৌতুক বা জয়ের অঙ্গ হিসেবে হাত বদল হতে পারে। সময় সময় এই প্রাসাদটি নানা লোকের হাতে গিয়ে পড়ে, যার মধ্যে মুসলিম বিজেতারাও আছেন। আমরা পরে আরো বিশদ ব্যাখ্যা দেবো এ বিষয়ে।

বাদশানামা বলছেন যে, আগ্রায় আনার পর রাজকীয় নির্দেশে গম্বুজযুক্ত মানসিংহের প্রাসাদের অভ্যন্তরে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। আরও আগে বলেছেন যে, যদিও জয়সিংহ রাজকীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত তাঁর পৈত্রিক প্রাসাদ দখল করাটা তাঁর প্রতি রাজার অনুগ্রহের একটা নমুনা হিসেবেই গ্রহণ করেন, কিন্তু ধর্মীয় নীতিজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে তাঁকে এর বদলে 'শফিয়াবাদ' দেওয়া হয়েছিলো। জানা যায় না, এই শফিয়াবাদ একটা গ্রাম বা উন্মুক্ত জমির খণ্ড ছিলো অথবা ছিলো প্রস্তরসঙ্কুল পরিত্যক্ত জায়গা, যা পুরোপুরিই কাল্পনিক নাম, এবং এই নগ্ন আত্মসাতের ব্যাপারটা অন্তত লিখিত বিবরণীতে সম্ভ্রান্ত করে

তুলবার জন্য বানানো হয়েছিলো। কিছু লোক শফিয়াবাদের ব্যাখ্যা করেছেন একখণ্ড উন্মুক্ত জমি হিসেবে। কিন্তু এই ধরণের অনুমানের কোন ভিত্তি নেই। বস্তুত, 'আবাদ' এই শব্দটি বোঝায় জনপদকে। কি জয়সিংহকে দেওয়া এই ধরণের কোন নগর চিহ্নিত করা যায় না। ঐতিহাসিকরা তাঁদের খুশীমতো শফিয়াবাদকে একখণ্ড উন্মুক্ত জমি হিসাবে ব্যাখ্যাত করেছেন। বিভ্রান্তিকে আরো বাড়িয়ে তুলে তাঁরা ভিত্তিহীনভাবে ধারণা করে নিয়েছেন যে, শাজাহান নিজেও এর বদলে একখণ্ড উন্মুক্ত জমি নিয়েছিলেন। শাজাহান কেন একটার বদলে আরেকটা উন্মুক্ত জমি নেবেন? তিনি যদি তাই নিয়ে থাকেন, তবে কেন জয়সিংহকে দেওয়া জমির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু লেখা নেই? তাছাড়াও বাদশানামা স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, জয়সিংহকেই দেওয়া হয়েছিলো শফিয়াবাদ (তা যাই বোঝাক না কেন) আর শাজাহান পেয়েছিলেন মানসিংহের উদ্যান প্রাসাদ। তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথা যে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কতখানি বানানো, তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে এইটে।

স্পষ্টতই, এই তথাকথিত বদলের কাহিনী চোখে ধুলো দেবার জন্য লেখা হয়েছে। কেই বা ওদার্যের সঙ্গে সহ্য করতে পারবেন একটা ব্যয়বহুল প্রাসাদের সঙ্গে একখণ্ড উন্মুক্ত জমির বিনিময়? দ্বিতীয়ত, এই বদলের ব্যাপারটাও মনে হয় কাল্পনিক, কেন না, এই জমিগুলোর আয়তন এবং অবস্থান সম্পর্কে কোন উল্লেখই নেই। তৃতীয়ত, প্রভুত্বকামী, দাম্ভিক, মুসলিক শাসক শাজাহানের সঙ্গে তাঁর হিন্দু অমাত্যদের কোন সম্প্রীতিই ছিলো না। খুব সম্ভব যে, জয়সিংহকে তাঁর পৈত্রিক প্রাসাদ থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছিলো।

তিনশো বছর ধরে পৃথিবীর লোক বিশ্বাস করে আসছে যে, শাজাহান জয়সিংহের কাছ থেকে একখণ্ড উন্মুক্ত জমি নিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটাতেই ইতিহাসের ছাত্রদের মধ্যে পুনরায় চিন্তার প্রেরণা জাগা উচিত। অধীনস্থ এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে একখণ্ড জমি ভিক্ষা করতে যাবার প্রয়োজন কেন শাজাহানের মত সম্রাটের হবে? শাজাহানের নিজের অধিকারেই কি অনেক জমি ছিলো না? কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি জয়সিংহের কাছ থেকে তাঁর মহিষীকে কবরস্থ করার পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত একটি সুন্দর প্রসাদ জবরদখল করেন।

বাদশানামার লেখক আমাদের বলছেন যে, মমতাজের মৃতদেহ পৃথিবীর চক্ষু থেকে লুক্কায়িত (সমাধিস্থ) ছিলো গম্বুজযুক্ত প্রাসাদের অভ্যন্তরে। শাজাহানের 'নির্দেশে' সরকারী কর্মচারীরা নাকি ঐ দেহ রেখেছিলেন। এই

'নির্দেশের' প্রয়োজনীয়তাই বা কি, যদি না অন্যের সম্পত্তিতে মমতাজের দেহ সমাহিত করা হয়ে থাকে? এই 'নির্দেশ' শব্দটার ব্যবহার অর্থবাচক। আমরা দেখাবো যে, এই ঘটনার ১০৪ বছর আগে সম্রাট বাবরও ঐ গম্বুজযুক্ত প্রসাদের উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় ইতিহাস স্থাপত্য ও বাস্তুবিদ্যার বইতে এই ধারণা খুঁটি গেড়ে বসে আছে যে, গম্বুজ হলো মুসলিম রীতির স্থাপত্য। এই ধারণা খণ্ডন করার পক্ষে উপরের পরিচ্ছেদে গম্বুজের উল্লেখ সুদূর প্রসারী গুরুত্বপূর্ণ। বাদশানামা প্রাঞ্জলভাবে আমাদের জানাচ্ছেন যে, মমতাজের কবরের জন্য দখল করা হিন্দু প্রসাদে গম্বুজ ছিলো। প্রসঙ্গত, এই সৌধটিকে বর্ণনা করা হয়েছে গগনচুম্বী এবং খুবই বিরাট হিসাবে, যদিও এই ধরণের বিশেষণ শাজাহানের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।

আমরা স্পষ্ট স্বীকৃতি পাচ্ছি যে, তাজমহল হলো একটা গম্বুজযুক্ত-হিন্দু প্রসাদ। অনায়াসেই ধারণা করা যায় সিকান্দ্রায় আকবরের এবং দিল্লীতে হুমায়ুনের ও সফদরজঙ্গের কবর, যা প্রায়ই তুলনা করা হয় তাজমহলের সঙ্গে, সবই হলো প্রাক্তন হিন্দু প্রসাদ। আর মুসলিমরা এগুলো জয় করে জোর করে রূপান্তরিত করেন।

ওপরে উদ্ধৃত পরিচ্ছেদের শেষ লাইনে বলা আছে যে সম্রাট প্রকল্পটির জন্য জ্যামিতিক নকসাকারীদের নিযুক্ত করেন। তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না যে, সম্রাট ভিত্তি থেকে শুরু করে পুরো সৌধটাই নির্মাণ করেছিলেন। জ্যামিতিবিদ ও স্থপতির প্রয়োজন হয়েছিলো, মাটির নীচের প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে কবর খোঁড়া এবং এর ঠিক উপরের তলার আটকোণা সিংহাসন প্রকোষ্ঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনার কাজে। এঁদের আরো প্রয়োজন হয়েছিলো, কিছু মর্মর পাথর সরিয়ে তাদের ওপর কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করানোয়, কত উচ্চতায় কোনটি লাগানো হবে তার হিসেবের ব্যাপারে ও তাদের পুনরায় স্বস্থানে লাগানোর কাজে।

'ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো' এই কথাটির ব্যাখ্যা কথাটিতেই নিহিত আছে। দুটো অর্থেই এই ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, যেহেতু মৃতদেহটি একটি গর্তে রাখা হয়, ঐ গর্তটি বুজিয়ে দেওয়াকেই বলা হয় 'কবরের ভিত্তি স্থাপন' করা। দ্বিতীয়ত, এর একটা আক্ষরিক অর্থও আছে। একটি হিন্দু প্রাসাদে দেহটি সমাহিত করে শাজাহান একদিক নিয়ে একটি মুসলিম কবরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। 'ভিত্তি স্থাপন করার' এই ধরণের আক্ষরিক কিন্তু অর্থবোধক ব্যাখ্যা মোটেই অপ্রচলিত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নেপোলিয়ন তাঁর জয়ের দ্বারা ফরাসী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার মানে কি এই

বোঝায় যে, নেপোলিয়ন কিছু ইট চুণ বা সুড়কীর জোগাড় করেন ফরাসী সাম্রাজ্যের স্মারক সৌধের জন্য? অনুরূপভাবে শাজাহান তাঁর স্ত্রীর কবরের ভিত্তি স্থাপন করেন নির্মাণের কোন মালমশলা জোগাড়ের হুকুম না দিয়েই, কেননা তিনি একটি ব্যয়বহুল হিন্দু প্রাসাদ দখল করাটাই বেছে নিয়েছিলেন।

আমরা ঐতিহাসিকদের সুপারিশ করবো এই ধরনের যুক্তি এবং আইন সঙ্গত ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে। এযাবৎ তাঁরা অসুবিধাজনক শব্দ ও বাক্যাংশ এড়িয়ে গিয়েছেন, অর্থব্যঞ্জক পরিচ্ছেদগুলোকে উপেক্ষা করেছেন। আজগুবি সব ধারণা নিয়ে তাঁরা অবাস্তবতার জগতে ভেসে বেড়ানোই পছন্দ করেছেন। তাঁরা শব্দ ও বাক্যাংশের স্বাভাবিক অর্থকে বিকৃত করেছেন, যুক্তি ও আইন-সম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণের দিক থেকে তাঁদের দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছেন আর পরিণামে জালিয়াতি এবং কল্পনার মিশ্রণে বানানো কাহিনীর প্রতি অত্যন্ত করুণভাবে বিশ্বস্ত থেকেছেন। ভারতীয় ইতিহাসের বহু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করতে গেলে এই ধরণের বিশৃঙ্খল ও অসন্তোষজনক পদ্ধতি ত্যাগ করতে হবে।

বাদশানামার মতে প্রাসাদের জন্য যে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছিলো, তার ব্যাখ্যা অতীব সরল। গোড়াতেই আমরা পাঠককে বলে রাখতে চাই যে, তাঁদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য বাড়িয়ে বলার একটা দুর্বলতা মুসলিম লেখকদের ছিলো। এই বাড়ানোর সীমা সম্বন্ধে সচেতন থাকলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, অনুমিত ব্যয় হয়েছিলো ৩০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

এরপরে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে। মুঘল আমলে ছিলো দুর্নীতির ভয়ানক প্রসার। কাজেই সম্রাটকে এই ধরণের প্রকল্পের ব্যয়ের যে অনুমান দেওয়া হয়েছিলো, তার একটা বিরাট অংশই ধরা ছিলো অন্যান্য মধ্যবর্তী ব্যক্তির বে-আইনী মুনাফা হিসেবে। এই ধরণের ফাঁপানো অনুমিত ব্যয়ের কথা যথাযথ মনে রাখলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আসল ব্যয় হয়েছিলো ২০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

এই ২০ লক্ষ টাকা (৭০ লক্ষ টাকাই বা ধরা হোক না কেন) খুব সহজেই খরচ হয়েছিলো নীচের প্রকোষ্ঠে কবর খোঁড়া এবং তা ভরাট করার কাজে, জমির সমতলে কেন্দ্রীয় আটকোণা প্রকোষ্ঠে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, প্রাসাদের মেঝের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মূল্যবান পাথরের টুকরো দিয়ে তাদের ঢেকে দেওয়ার কাজে আর প্রাসাদের দেয়ালে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করানোয়। এই খোদাইয়ের কাজেই প্রয়োজন হয়েছিলো একটা প্রকাণ্ড উঁচু ভারা বাঁধার।

তা প্রসারিত ছিলো প্রাসাদের শীর্ষ পর্যন্ত আর ঘিরে রেখেছিলো উঁচু প্রবেশপথ আর খিলানকে। এই সব মোজাইকের কাজ আর কোরাণের বাণী খোদাইয়ের কাজের জন্য ঐ হিন্দু প্রাসাদের পাথর স্থানে স্থানে খুলে নিয়ে পরে আবার তা ঠিক জায়গায় লাগাতে হয়েছিলো। তাছাড়া এই সমস্ত খোদাই এবং খোলা বা লাগানোর সময় যে সব পাথর ভেঙ্গে গিয়েছিলো, তাদের বদলাবার জন্য নতুন পাথর জোগাড় করতে হয়েছিলো। উচ্চ বেতনভোগী কারিগরদের নিযুক্ত করা, অনেক দূর থেকে পাথর আনানো আর একটি ব্যয়সাপেক্ষ ভারা বাঁধার কাজেই খরচ হয়েছিলো সেই টাকা, বাদশানামায় যার উল্লেখ আছে।

পরের অধ্যায়ে আমরা ফরাসী বণিক-পর্যটক Tavernier-এ সাক্ষ্য উদ্ধৃত করবো এই মর্মে যে, ভারা বাঁধার খরচ সমস্ত কাজটার খরচের চাইতে বেশী ছিলো। তাতে প্রমাণ হবে যে, কাজটা ছিলো কিছু লিপি তাজপ্রাসাদের দেয়ালের সুদূর উচ্চতায় খোদাই করা মাত্র।

আমরা ভেবে অবাক হই কোন অধিকারে পরবর্তী লেখকেরা তাজের তথাকথিত নির্মাণ খরচ লিখেছেন ৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, কেননা, শাজাহানের নিজের সভাসদ-লেখক মোল্লা আবদুল হামিদের মতে খরচ পড়ে ছিলো মোট ৪০ লক্ষ টাকা। পদ্ধতির নিয়মকানুন অতিক্রমকারী এইসব ভিত্তিহীন কল্পনা ভারতীয় ইতিহাসকে ভুলে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। এই ব্যাপারে সবচাইতে চাঞ্চল্যকর হচ্ছে তাজমহলের উৎপত্তির কাহিনী।

তৃতীয় অধ্যায়

Tavernier

একটি গম্বুজযুক্ত হিন্দু প্রাসাদকেই যে মমতাজের কবরের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিলো, শাজাহানের নিজের সভালেখকের এই স্বীকৃতির পর আমরা এই অধ্যায়ে প্রমাণ করতে চাইছি যে, ফরাসী পর্যটক Tavernier-এর সাক্ষ্যও আমাদের সিদ্ধান্তেরই পুষ্টি জুগিয়ে প্রচলিত শাজাহান-ইতিকথার অসারতা প্রমাণ করে। শাজাহানের রাজত্বকালে Tavernier ভারতে এসেছিলেন। তাজমহল সম্পর্কে তিনি এমন কিছু মন্তব্য রেখে গেছেন, যার সাহায্যে ঐ প্রাসাদের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায়।

তাঁর মন্তব্য পরীক্ষার আগে Tavernier সম্পর্কে কিছুটা পরিচিতি নেওয়া যাক। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ বলছেন,...'Jean Baptiste Tavernier একজন ফরাসী অলঙ্কার ব্যবসায়ী, ব্যবসার খাতিরে ১৬৪১ খৃঃ থেকে ১৬৬৮ খৃঃ পর্যন্ত ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি সাধারণতঃ সুরাট ও আগ্রায় থাকতেন। বাংলা, গুজরাট, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, কর্ণাটক প্রভৃতি স্থান তাঁর পর্যটনের আওতায় পড়ে। তাঁর একটি গোযান ছিলো। ঐ যান ও এক জোড় বলদের জন্য তাঁর খরচ হয়েছিলো ছয় শ' টাকা। ক্রমাগত দু' মাস ধরে বলদ জোড়া প্রতিদিন চল্লিশ মাইল একনাগাড়ে পথ চলতো। সুরাট থেকে আগ্রা বা গোলকুণ্ডা যেতে চার দিনই যথেষ্ট ছিলো, আর খরচ পড়তো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। রোমের রাজপথের মতোই সুন্দর ছিলো পথ। হিন্দু রাজত্বে ইউরোপীয় পর্যটকেরা মাংসের অপ্রতুলতায় অসুবিধা বোধ করতেন, মুসলিম রাজত্বে তা প্রচুর পাওয়া যেতো। একটি সুসম ডাকব্যবস্থা কার্যকর ছিলো। নাগরিক ও সরকার উভয় পক্ষই রাজপথে চুরি ডাকাতির বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতেন। ...তাঁর পুস্তক Travels in India-তে এই ধরণের নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিদ্বান না হওয়ায় সম্পদ ও বাণিজ্য ছাড়া তিনি অন্য কোন ব্যাপারে কিছু লিখে রেখে যান নি।'

ওপরের পরিচ্ছেদে Tavernier-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছাড়াও আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক তিনটি সূত্রের সন্ধান মেলে। প্রথমটি হচ্ছে,

১৬৪১ থেকে ১৬৬৮ সনের মধ্যবর্তী কোন সময় Tavernier ভারতে ছিলেন। আমরা জানি যে, ১৬২৯ খৃঃ থেকে ১৬৩২ খৃঃ-এর মধ্যে মমতাজ মারা যান। মমতাজের মৃত্যুর মাত্র ১১ বছর পরেই Tavernier ভারতে আসেন। মুসলিম ইতিবৃত্তের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা দেখাবো যে, মমতাজের মৃত্যুর কয়েক মাস পরই নাকি ঐ প্রাসাদ তৈরির কাল্পনিক কাজ শুরু হয়েছিলো। অথচ, Tavernier-এর মতে মমতাজের মৃত্যুর পর অন্ততঃ ১১ বছর ধরে কোন কাজই আরম্ভ হয়নি কেননা, Tavernier ভারতে এসেছিলেন ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়। এর পর আমরা কিছু মুসলিম বিবরণীর উদ্ধৃতি দেবো এই মর্মে যে, ভিত্তি থেকে সুরু করে সমগ্র তাজপ্রাসাদ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিলো ১৬৪৩ সনে। মুসলিম বিবরণীর এই উলঙ্গ অসঙ্গতি পাঠক লক্ষ্য করবেন নিশ্চয়। যদিও কিছু মুসলিম বিবরণীতে আমরা পাই যে, তাজমহলের নির্মাণ কার্য ১৬৪৩ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, Tavernier-এর মতে অন্তত ১৬৪১ সালের আগে ঐ নির্মাণের কাজ শুরুই হয়নি। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি আমরা পরে রাখছি। ঐ উদ্ধৃতির অপর যে প্রয়োজনীয় সূত্র মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে যে, বিদ্বান না হওয়ার জন্য Tavernier-এর মনোযোগ কেবল মাত্র সম্পদ ও বাণিজ্যের দিকে নিবদ্ধ ছিলো।

অপর প্রয়োজনীয় তথ্য হচ্ছে, Tavernier ১৬৬৯ খৃঃ পর্যন্ত ভারতে আসা যাওয়া করলেও ১৬৫৮ সালেই শাজাহান পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হন। অর্থাৎ, Tavernier-এর সাক্ষ্য মেনে নিলে, ১৬৪১ সালের কিছু পর মমতাজের স্মৃতিসৌধের নির্মাণ আরম্ভ হয় এবং ১৬৫৮ সালের পর শাজাহান পুত্রের হাতে অসহায়ভাবে বন্দী থাকলেও কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু আমরা দেখাবো যে, Tavernierএর মতে কাজটি শেষ হতে ২২ বছর লেগেছিলো। অর্থাৎ, কাজটি ১৬৪১ সালে শুরু হলেও ১৬৬৩ সালে শেষ হয়েছিলো। এটি কার্যতঃ অসম্ভব কেননা, ১৬৫৮ সালের পর আর শাজাহান ক্ষমতায় ছিলেন না।

প্রথাগত তাজ-ইতিকথার এই ধরণের জাজ্বল্যমান অসঙ্গতি পূর্বে কথনো দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এতেই প্রমাণ হয় যে, তাজমহলের উৎপত্তি নিয়ে কোন প্রকৃত গবেষণা আগে হয়নি। অগণিত পণ্ডিত অজস্র অসঙ্গতি সত্ত্বেও বিভিন্ন তাজ-ইতিকথার শুধু পুনরাবৃত্তিই করে গেছেন, এগুলোর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা না করে।

Tavernier সম্পর্কে বিশদ পরিচিতির জন্য আমরা Encyclopedia Britannicaর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি রাখছি। 'Tavernier, Jean Baptiste (১৬০৫—১৬৮৯)। ভারতের সাথে বাণিজ্যের পথিকৃত এই ফরাসী পর্যটক

১৬০৫ সালে পারীতে জন্মগ্রহণ করেন। আণ্টওয়ার্প থেকে আগত তাঁর প্রোটেষ্টাণ্ট পিতা গ্যাব্রিয়েল ও কাকা মেলসিন পেশায় ছিলেন খোদাইকারক। প্রথম যাত্রায় তিনি ইস্পাহান পর্যন্ত যান। বাগদাদ, আলেপ্পো থেকে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া, মাণ্টা ও ইটালী হয়ে পুনরায় পারীতে ফিরে যান ১৬৩৭ সালে। ১৬৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর দ্বিতীয় যাত্রায় (১৬৩৮—১৬৪৬) তিনি আলেপ্পো হয়ে পারস্য এবং সেখান থেকে ভারতের আগ্রা ও গোলকুণ্ডা পর্যন্ত যান। মুঘল রাজসভা ও হীরকখনিতে তাঁর ভ্রমণের যে উদ্দেশ্য ছিলো তার সার্থক রূপায়ন হয়েছিলো পরবর্তীকালে, যখন প্রাচ্যের সম্পদশালী রাজাদের সাথে মহামূল্যবান মণিমুক্তর সওদায় তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয় যাত্রার পর তিনি আরো চারবার পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। তৃতীয় যাত্রায় (১৬৪৩—৪৯) তিনি জাভা পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে দেশে ফেরেন। তাঁর শেষ তিন যাত্রায় (১৬৫১—৫৫, ১৬৫৭—৬২, ১৬৬৪—৬৮), তিনি ভারত অতিক্রম করে আর অগ্রসর হন নি। ১৬৬৯ সালে তিনি রাজসম্মান প্রাপ্ত হন হবং জেনেভার কাছে Aubonneএ জমিদারী ক্রয় করেন।

Tavernier-এর জীবনের শেষভাগ অনেকটা অস্পষ্ট। তিনি প্যারিস ত্যাগ করে সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস শুরু করেন ১৬৮৭ সালে। ১৬৮৯ সালে তিনি মস্কো হয়ে পারস্য যাবার পথে কোপেনহেগেন হয়ে যান। সেই বছরই তিনি মস্কোয় মারা যান।'

এরপর আমরা তাজমহল সম্পর্কে Tavernierএর বিবরণী আলোচনা করে দেখাবো যে, সঠিকভাবে অনুধাবন করলে এটি আমাদেরই সিদ্ধান্তের পুষ্টি জোগায় যে, শাজাহান তাজমহল নির্মাণ করেননি বরং তাঁর স্ত্রী মমতাজের সমাধির জন্য একটি হিন্দুপ্রাসাদ জবরদখল করেছিলেন।

এ সত্ত্বেও আমরা বলতে চাই যে, ঐতিহাসিকেরা Tavernierএর মন্তব্যের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা অযৌক্তিক। এই প্রসঙ্গে আমরা Law of Evidence এর মূল নীতির প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ ঐতিহাসিকদের মূল ত্রুটি হচ্ছে, হয় তাঁরা এই নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম ও সাক্ষ্য যাচাইয়ের বিচার-বিভাগীয় পদ্ধতির প্রতি তাঁরা সম্পূর্ণ অবহেলা দেখিয়েছেন। এই Law of Evidence বা সাক্ষ্য গ্রহণের মূল নীতি কিন্তু সুদৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

Tavernier-এর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি যদি শাজাহানই তাজমহলের প্রকৃত নির্মাণকারী এই মর্মে রায়দানের জন্য কোন আদালতের

স্বারস্থ হন, আবেদনকারীকে তাঁর মামলা সহ তৎক্ষণাৎ আদালত থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে।

আদালত খুবই ন্যায়সঙ্গতভাবে জিজ্ঞেস করবেন যে, তৎকালীন ভারত সরকারের প্রতিভূ শাজাহানের সরকারী নথিতে তাঁর তাজ নির্মাণ সংক্রান্ত এক টুকরো কাগজও (নক্সা, হিসেব বা কোন শিলালিপি) যদি পাওয়া না গিয়ে থাকে তবে দূরবর্তী ফরাসী দেশের শাজাহানের সময়ের এক পর্যটক Tavernier এর কিছু খাপছাড়া মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে নির্মাণের কৃতিত্ব শাজাহানকে অর্পণের কোন দাবী করার অধিকার আবেদনকারীর নেই। আইনের আঙ্গিনায় Tavernierএর সাক্ষ্য তৃতীয় শ্রেণীর বলেই বিবেচিত হবে, যদিও ঐতিহাসিকেরা এযাবৎ একে প্রথম শ্রেণীর বলেই মেনে এসেছেন। এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে, সুদক্ষ গবেষক হতে হলে ঐতিহাসিকদের অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অবশ্য আমরা দেখাবো যে, শাজাহান-ইতিকথার ফানুষ Tavernier-এর সাক্ষ্য দিয়ে চুপসে দেওয়া যায়। বিভিন্ন আপাত-অসঙ্গতিপূর্ণ বিবরণীর সামঞ্জস্য বিধান করতে গেলে এই সিদ্ধান্তে আসাই স্বাভাবিক।

Tavernier বলেছেন, 'আগ্রার সব কবরের মধ্যে শাজাহানের পত্নীরটিই সর্বোত্তম। ইচ্ছে করেই জায়গাটি বাছা হয়েছিলো পর্যটকদের আকর্ষণস্থল তাসিমকানের কাছে, যাতে সমগ্র পৃথিবীর লোক এটি দেখে তারিফ করতে পারে। তাসিমকান হচ্ছে ছয়টি প্রশস্ত চত্বর সমন্বিত একটি বৃহৎ বাজার, যাতে আছে বণিকদের ব্যবহারের জন্য বারান্দা ঘিরে ছোট ছোট কক্ষ। এখানে প্রচুর তুলো বিক্রি করা হতো। আমি এই মহান কাজটির আরম্ভ ও শেষ হতে দেখেছি যাতে বিশ হাজার লোক বাইশ বছর ধরে অবিশ্রাম কাজ করেছে। এ থেকে বোঝা যাবে কি প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিলো। শোনা যায় যে, ভারা বাঁধার কাজেই অন্যান্য কাজের তুলনায় বেশী খরচ হয়েছিলো। কারণ, কাঠের অপ্রতুলতার জন্য ইঁট দিয়ে ভারা বাঁধতে হয়েছিলো আর ঠেকনার কাজেও ইঁটের ব্যবহার করতে হয়েছিলো। এতে প্রচুর লোকবল এবং অজস্র অর্থ প্রয়োজন হয়েছিলো। নদীর অপর পাড়ে শাজাহান তাঁর কবর নির্মাণের কাজ শুরু করেন কিন্তু পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তাঁর পরিকল্পনা বাধা-প্রাপ্ত হয়।'

ওপরের পরিচ্ছেদটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষের প্রদত্ত উদ্ধৃতিতে আমরা দেখেছি যে, বিদ্বান না হওয়ার জন্য Tavernierএর দৃষ্টি মুখ্যতঃ সম্পদ ও বাণিজ্যের দিকেই নিবদ্ধ ছিলো।

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৬২৯ থেকে ১৬৩২ খ্রীঃ কোন এক সময় মমতাজের মৃত্যুর পর তাঁকে প্রথম বুরহানপুরে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। বলা হয় যে, ছয়মাস পর তাঁর দেহ উত্তোলিত করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ, খুব বিলম্বে হলেও ১৬৩২ সাল শেষ হওয়া নাগাদ মমতাজের মৃতদেহ আগ্রায় পৌঁছেছিলো। ১৬৪১ সালে তাঁর ভারতে আগমনের পর কাজটি শুরু হয়েছে, Tavernier এর এই সাক্ষ্য মেনে নিলে মানতে হয় যে, প্রায় দশ বছর ধরে মমতাজের মৃতদেহ উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয়েছিলো। এখানেও আমরা Tavernier এর সাক্ষ্য ও মুসলিম বিবরণীর মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করি। মুসলিম বিবরণীর মতে ১৬৪৩ সালের আগে তাজমহলের নির্মাণ শেষ হয়নি।

বানানো বা তথ্যভিত্তিক যাই হোক না কেন, তাজমহল সম্পর্কে বিভিন্ন টুকরো তথ্য ও বিস্তৃত বিবরণী প্রায় সবই আমরা এই পুস্তকে আলোচনা করতে চাই। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের মতো আমরা বিভিন্ন বিবরণীর অসামঞ্জস্য এক কথায় উড়িয়ে দিতে চাই না। অন্যপক্ষে আমরা তাঁদের দেখাতে চাই, কিভাবে বিভিন্ন কল্পিত বিবরণীর অন্তর্নিহিত সত্যির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া চলে।

মমতাজের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর দেহ যে আগ্রায় নেওয়া হয়েছিলো, মুসলিম বিবরণীর এই অংশটি হয়তো সঠিক। হাতের কাছে একটি তৈরী কবর থাকলেই এটি সম্ভব। ভিত্তি খোঁড়া থেকে নতুন কবরের কাজ আরম্ভ করতে হলে শাজাহান বুরহানপুরের কবর থেকে মৃতদেহটি আগেই উত্তোলিত করে আনাতেন না। নতুন সমাধি তৈরী করতে হলে, মমতাজের দেহ, কিছু বিবরণীর মতে, তাজ নির্মাণের কাজে ব্যয়িত বারো বা তেরো বছর পর আগ্রায় নিয়ে সমাহিত করা হতো।

আমরা আগেই শাজাহানের সভালেখক মোল্লা আবদুল হামিদ লাহোরী'র উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি যে, কবরের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য একটি জবর-দখল হিন্দু প্রাসাদ হাতের কাছেই ছিলো।

মমতাজের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ বুরহানপুর থেকে আগ্রায় নিতে যে ছয়মাস বিলম্ব হয়েছিলো, তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত অধিকারী জয়সিংহকে প্রাসাদটি খালি করতে বাধ্য করিয়ে নীচের তলায় গর্ত খুঁড়ে কবরের ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো।

শাজাহানের সভা-লেখক বলছেন, আগ্রায় আনার পর মমতাজের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়েছিলো মানসিংহের প্রাসাদের সুউচ্চ গম্বুজের নীচে। প্রাসাদটি ছিলো তাঁর প্রপৌত্র জয়সিংহের অধিকারে। এই বিবরণীর মতে আগ্রায় নিয়ে

আসার পর মৃতদেহটি গম্বুজের নীচে সমাহিত করতে বিলম্ব হয়নি। তাই প্রতীয়মান হয় যে, তাজপ্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম বিবরণী সবই কষ্টকল্পনা। এগুলোর বিস্তৃত আলোচনা করে আমরা বক্তব্যটি অপ্রমাণ করবো।

মমতাজের উত্তোলিত দেহ আগ্রায় হিন্দু প্রাসাদে সমাহিত করার পর অন্যান্য পরিবর্তনের জন্য শাজাহানের তেমন তাড়া ছিলো না। মুসলিম বিবরণীতে যে সমস্ত শিল্পীর নাম দেওয়া হয়েছে, তাদের নীচের প্রকোষ্ঠে কবর খোঁড়া, ওপরের তলায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ এবং তাজপ্রাসাদে ও এর খিলানে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। এভাবে বিচার করলে মনে হয় যে বিভিন্ন বিবরণীতে পাওয়া স্থপতি ও নক্সাবিদের নাম হয়তো সঠিক হতে পারে।

এই সমগ্র কাজটির শুরু ও শেষ দেখেছিলেন এককথায় Tavernier স্পষ্টতঃ বোঝাতে চাইছেন যে, কাজটি ছিলো এই সুউচ্চ প্রাসাদের ভিতরে ও বাইরে চারপাশ ঘিরে জটিল ভারা বাঁধা, দেয়ালে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা ও পরে ভারা খুলে নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে পাই তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য যে, সমগ্র কাজটির চেয়ে ভারা বাঁধার খরচ বেশী পড়েছিলো। আজকাল যে তাজপ্রসাদ দেখি, শাজাহান অবিকল তাই নির্মাণ করিয়ে থাকলে, ভারা বাঁধার খরচ সমগ্র কাজের চেয়ে বেশী পড়েছিলো Tavernier এর মতো বিদেশীর এই মন্তব্য সম্পূর্ণ উদ্ভট ঠেকবে। কেননা, প্রাসাদটির তুলনায় এরজন্য নির্মিত ভারার খরচ বেশী তো নয়ই বরং অকিঞ্চিৎকর। এতেই প্রমাণ হয়, সমগ্র কাজটা ছিলো তুলনায় নগণ্য স্থানে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা, গর্ত খোঁড়া এবং একটি কবর ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এভাবে আমরা দেখতে পাই, প্রকৃত সত্যিকে সামনে রেখে কিভাবে বিভিন্ন অসঙ্গতিপূর্ণ ও বানানো বিবরণীরও ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

মুসলিম বিবরণীর প্রায় সবই যে বানানো ও কষ্টকল্পনা, তার সপক্ষে আমরা পরলোকগত Sir H. M. Elliot, Dr. Tessitori ও Dr S. M Sen-এর মতো বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের বক্তব্য পাই যে, এগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না।

যেহেতু তাসিমকানে বিদেশীরা সমবেত হতেন, তাই সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে যদি শাজাহান কবরটি সেই বাজারের কাছেই করিয়ে থাকেন, তবে প্রশ্ন উঠবে যে, শোকাভিভূত শাজাহানের পক্ষে কি স্ত্রীর সমাধি নির্মাণের জন্য একটি নির্জন সুরক্ষিত জায়গা নেওয়া স্বাভাবিক ছিলো না। কেন তিনি সস্তা আমোদপ্রদর্শকের মতো ব্যবহার করবেন?

তিনি কি তামাম জনতার আনন্দের জন্য তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুকেও প্রমোদ বিতরণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করবেন? এটিও কি আশ্চর্য নয় যে, ঐ জবরদখল হিন্দুপ্রাসাদে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করানোর তুলনায়, অকিঞ্চিৎকর কাজটা, শেষ করতে বিভিন্ন বিবরণীর মতানুযায়ী ১০, ১২, ১৩, ১৭ এমন কি ২২ বছর লেগেছিলো। বেহিসাবী মুঘল হিসেবে দেখানো হলেও শাজাহান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে কৃপণ, নিষ্ঠুর ও দাম্ভিক প্রকৃতির। এছাড়াও, কোন মুঘল শাসকের পক্ষেই হারেমের পাঁচ হাজার অধিবাসিনীর প্রত্যেকের জন্য ব্যয়বহুল স্মৃতিসৌধ নির্মাণ সম্ভব ছিলো না।

এছাড়াও এই কাজে বেশী সময় লাগার ব্যাপারটারও কোন গুরুত্ব নেই কেননা, সুউচ্চ মহিমময় হিন্দুপ্রাসাদের গম্বুজের নীচে মমতাজের মৃতদেহ নিরাপদে সমাহিত করার পর খোদাইয়ের কাজে ১৯ বা ২২ বছর লাগলেও অসুবিধার কিছু ছিলো না। বিভিন্ন বিবরণীতে সময়ের পরিমাণ সম্পর্কে অনৈক্যও লক্ষ্য করার। কেননা, আমরা জানি যে, কোন জবরদখল প্রাসাদের যদি নতুন মালিকের ইচ্ছানুগ পরিবর্তন করানো হয়, তবে ঐ মালিকের মেজাজ ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে কাজটা দীর্ঘসময় ধরে চলাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই অর্থে বলা যায় য. বিভিন্ন বিবরণীতে উল্লেখিত দশ থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সময় হয়তো সঠিক। এই সমস্ত বিবরণীর সামঞ্জস্য করে আমরা বলতে চাই যে, হয়তো কবর স্মৃতিস্তম্ভের কাজে সময় লেগেছিলো দশ বছর (সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উল্লেখিত সময়), আর কোরাণের বাণী খোদাইয়ের কাজ চলেছিলো দীর্ঘ ২২ বছর ধরে। হিন্দুপ্রাসাদকে কোরাণের বাণীর অলঙ্করণে মুসলিম বলে চালানোর চেষ্টার প্রথম উদ্গাতা কিন্তু শাজাহান নন; এর বেশ প্রাচীন ঐতিহ্য রয়ে গেছে। বিগ্রহরাজ বিশালদেবের প্রাসাদের একটি অংশ আজমীরের 'আড়াই দিন কি ঝোপড়া'-তেও ইসলামী লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। একটি প্রাচীন হিন্দু মানমন্দির তথাকথিত কুতুবমিনারের গায়েও এই ধরণের ইসলামী লিপির সংযোজনের জোরে একটি মুসলিম স্থাপত্য বলে দাবী করা হয়। এভাবেই, আদিতে রাজপুত প্রাসাদ হওয়া সত্বেও হুমায়ুন, সফদরজঙ্গ, ও আকবরের তথাকথিত কবরকেও অনুরূপ ভাগ্যই বরণ করতে হয়েছে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এভাবেই পূর্বপুরুষের সেই বহু ব্যবহৃত ঐতিহ্য অনুসরণ করে শাজাহান সুনিপুণ রাজকীয় চাতুরীর সাহায্যে জয়সিংহকে তাঁর পৈত্রিক বর্ণাঢ্য প্রাসাদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত করেছেন। এটি অবশ্য শাজাহানের মাতুলালয়ও ছিলো। একটি আনন্দোচ্ছল হিন্দুপ্রাসাদকে বিষন্ন কবরে রূপান্তরিত করার পশ্চাতে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথমত, একটি হিন্দু রাজপরিবারকে আরো লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে দেওয়া। অপরটি

হচ্ছে, প্রাসাদের বিলাসবহুল আসবাব যথা মুক্তোর ঝলার, সোনার চাঁদোয়া ও গরাদ, রূপোর দরজা এবং বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি আত্মসাৎ করে কোষাগারে জমা দেওয়া।

Tavernier-এর অপর উক্তি, 'শাজাহান ইচ্ছে করেই কবরটি বানিয়ে ছিলেন তাসিমকানের (ছয়টি প্রশস্ত চত্বর ছিলো এতে) কাছে, বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণস্থলে, যাতে সমস্ত পৃথিবী এটি দেখে তারিফ করতে পারে।' পাঠক উক্তিটি সতর্কভাবে লক্ষ্য করুন। তাসিমকান হচ্ছে তাজ-ই-মকান, অর্থাৎ রাজার বাসগৃহ, তাজমহল কথাটি যার সমার্থক। অর্থাৎ Tavernier-এর মতে, প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদটি মমতাজের সমাধির আগেও তাসিমকান ওরফে তাজমহল নামেই পরিচিত ছিলো। তিনি আরো জানাচ্ছেন, 'এই সুন্দর প্রাসাদ দেখতে বিদেশীরা ভীড় জমাতেন আর মমতাজের সমাধি সেখানে স্থাপনার পেছনে শাজাহানের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো এই স্বপ্নের প্রাসাদের স্থাপত্যের আড়ম্বরকে কাজে লাগানো।

ভারতীয় ইতিহাসে শাজাহানকে প্রায়ই ধনাঢ্য হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। এই কল্পিত ভাবমূর্তির পশ্চাতের ধারণা হচ্ছে যে, তিনি অনেক ব্যয়বহুল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই ধরণের প্রাসাদ একটিও নির্মাণ করেন নি। প্রচুর সম্পদের অধিকারী সম্রাট হওয়া দূরস্থান, শাজাহানের কাছে উল্লেখযোগ্য কোন ঐশ্বর্যই ছিলো না। কেননা, তিরিশ বছরের রাজত্বকালে তাঁকে আটচল্লিশটি অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিলো। শাজাহানের এই অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের স্বীকৃতি পাই Tavernier-এর পূর্বে উদ্ধৃত মন্তব্যে যে, কাঠের অভাবে সমগ্র ভারা ও খিলানের মজবুতির জন্য ইঁট ব্যবহার করতে হয়েছিলো। পাঠক ভাবলেই বুঝবেন যে, ভারতের মতো বন পরিবেষ্টিত দেশে ভারা বাঁধার পক্ষে কাঠ সংগ্রহে অসমর্থ কোন সম্রাটের পক্ষে তাজমহলের মতো ধনাঢ্য ব্যয়বহুল প্রাসাদ নির্মাণ স্বপ্নেও সম্ভব নয়।

এমনকি খিলানের মজবুতির জন্যও ইঁট ব্যবহার করতে হয়েছিলো, Tavernier-এর মন্তব্য খুবই অর্থব্যঞ্জক। এর অর্থ হচ্ছে, খিলানগুলো আগে থেকেই ছিলো। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, তাজমহলের ওপর কোরাণের লিপির অলঙ্করণ মূলতঃ খিলানগুলোর আশেপাশেই হয়েছিলো। ঐ অঞ্চলের পাথরের টুকরোগুলো সরিয়ে খোদাই করে আবার লাগানো হয়েছিলো। অথবা ভগ্ন অংশের বদলে ইসলামী লিপি খোদাই করা পাথর সেখানে সংযোজিত হয়েছিলো। ফলে, কমজোরি হয়ে যাওয়া খিলানের মজবুতির জন্যই তখন ইঁটের প্রয়োজন হয়েছিলো। কাজেই Tavernier-এর বক্তব্যের এই

অংশ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে বাঁকানো তোরণসহ তাজপ্রাসাদের অস্তিত্ব মমতাজের মৃত্যুর আগে থেকে ছিলো।

যখন Tavernier বলছেন যে, তাসিমকান (তাজ-ই-মকান ওরফে তাজ-মহল) হচ্ছে দুয়টি প্রশস্ত চত্বর সমন্বিত একটি বৃহৎ বাজার, স্পষ্টতই তিনি চার-পাশের লালপাথরের বিস্তৃত শিবিরের কথাই উল্লেখ করেছেন, মর্মর প্রাসাদটির কথা নয়। কেননা, আগেই এটি মমতাজের সমাধির জন্য হস্তগত করা হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে, Tavernier-এর বিবরণী গোলমেলে মনে হতে পারে। কারণ, সমগ্র পৃথিবী যদিও মর্মর প্রাসাদটিকেই তাজমহল বলে আখ্যাত করে, Tavernier লাল পাথরের শিবিরগুলোকেই 'তাজ-ই-মকান' বলেছেন। প্রকৃত সত্যি হচ্ছে যে, ঐ কেন্দ্রীয় মর্মরপ্রাসাদ ও লাল পাথরের প্রাসাদগুলো মিলিয়েই ছিলো 'তাজ-ই-মকান' অর্থাৎ জয়সিংহের রাজকীয় সম্পত্তি। বর্ণাঢ্য কেন্দ্রীয় মর্মরপ্রসাদসহ চারপাশের অন্যান্য প্রসাদগুলো সবই হস্তগত করেছিলেন শাজাহান। ঐ কেন্দ্রীয় মর্মরপ্রাসাদ ব্যতিরেকে লাল পাথরের সৌধগুলোর অস্তিত্বের কোন সুচারু ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, কেন না, এগুলো সবই হচ্ছে প্রসাদের অনুষঙ্গ।

অধ্যায়টি শেষ করার আগে পশ্চিমী পণ্ডিত বা পর্যটকের সাক্ষ্যের মূল্য সম্পর্কে আমরা পাঠককে সতর্ক করতে চাই। বৃটিশ রাজত্বের কালে ভারতে পশ্চিমী পর্যটকদের মন্তব্যের ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করার একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। আমরা স্বাধীন হলেও এখনও সেই ঝোঁক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নই। বৃটিশ ঐতিহাসিক Keene-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যেও এই বিভ্রান্ত মানসিকতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

তাঁর বইয়ের ১৫৩ পাতার এক পাদটীকায় Keene বলছেন, Tavernier তাঁর যাত্রা শুরু করেন ১৬৩১ সালে এবং পারস্যের ইস্পাহান পর্যন্ত গিয়ে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন ১৬৩৩ সালে। তাই তাঁর পক্ষে তাজ নির্মাণের কাজ শুরু হওয়া প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হয়তো তিনি ইস্পাহানে এ সম্বন্ধে শুনে থাকতে পারেন। ১৬৫১ থেকে ১৬৫৫ পর্যন্ত তাঁর চতুর্থ যাত্রা ছিলো ভারত পর্যন্ত এবং তখনই তিনি তাজের সমাপ্তি দেখেছেন।

প্রথমেই, Tavernier-এর বক্তব্য কতটা সঠিক Keene-কে জানানো যাক। Keene জানেন না যে, তাজমহল ছিলো একটি হিন্দুপ্রাসাদ। তাই, শাজাহানের পক্ষে নীচের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে একটি কবর খুঁড়ে মমতাজকে সেখানে সমাহিত করা ছাড়া করণীয় কিছুই ছিলো না। কাজেই, কাজটির 'শুরু' দেখার জন্য Tavernier-এর পক্ষে ১৬৩০-৩১ সালে ভারতে উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। কাজটির শুরু এবং শেষ Tavernier স্বচক্ষে দেখেছেন

বলে কি বোঝাতে চাইছেন আমরা আগেই ব্যাখ্যা করছি। তিনি তাজের বিভিন্ন উচ্চতায় কোরানের বাণী খোদাইয়ের জন্য শাজাহানের মজুরদের ভারা নির্মাণ করতে দেখেছিলেন। কাজটি যে কোন সময় আরম্ভ ও শেষ হয়ে থাকতে পারে। Tavernier-এর ভারতে অবস্থানের সময় যদি ''কাজটির' শুরু ও শেষ হয়, আশ্চর্যের কিছুই নেই। এদিক দিয়ে Tavernier-এর বক্তব্য সঠিক।

কিন্তু Keene-এর পাদটীকা থেকে যে কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে, কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেন না, Tavernier কখন ভারতে এসেছিলেন এবং কতদিন ছিলেন। আমরা মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষের উদ্ধৃতিতে দেখেছি যে, Tavernier ১৬৪১ খৃঃ থেকে ১৬৫৮ খৃঃ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। কিন্তু Keene বলছেন যে, Tavernier-এর পক্ষে ১৬৫১-৫৫ সালে তা সম্ভব ছিলো। অপরপক্ষে, Encyclopaedia Britannica বলছেন যে, Tavernier-এর মধ্যে বেশ কয়েকবার ভারতে আসা যাওয়া করেছেন। তাই, Tavernier-এর সাক্ষ্য খুব নির্ভরজনক নাও হতে পারে। তিনি যা কিছু বলছেন তা সম্পূর্ণ সত্যি নয় অথবা আদপেই সত্যি নয়। ১৬৫১ সাল থেকে ১৬৫৫ সাল পর্যন্ত, যাতায়াতের সময় ধরে মাত্র চার বছর যদি তিনি ভারতে থেকে থাকেন, তাঁর পক্ষে কি বিশ হাজার লোক বাইশ বছর ধরে অবিরত পরিশ্রম করেছিলো আর কাজটির শুরু ও শেষ তাঁর চোখের সামনেই হয়েছিলো এই ধরণের মন্তব্য করা সঠিক? বোঝা যায় যে, Tavernier ইতিহাসকে ধোঁকা দিয়েছেন তাঁর শোনা মুসলিম ধাপ্পাকে নিজের চোখে দেখা বিবরণ বলে পরবর্তীকালের ওপর চাপিয়ে দিয়ে।

Tavernier-এর মন্তব্য থেকে চারটি বিশেষ সূত্র পাওয়া যায়। প্রথমত, একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ তাসিমকান (অর্থাৎ তাজমহল) শাজাহান বেছে নিয়েছিলেন মমতাজের সমাধির জন্য। দ্বিতীয়ত, ভারা বাঁধার জন্য তিনি কাঠের যোগাড় করতে পারেন নি। তৃতীয়ত, সমগ্র কাজের তুলনায় ভারা বাঁধার খরচই ছিলো সর্বাধিক। চতুর্থত, বিশ হাজার শ্রমিক বাইশ বছর ধরে অবিরত পরিশ্রম করেছিলো।

এর মধ্যে ওপরের তিনটি সূত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মমতাজের কবরের জন্য শাজাহান একটি তৈরী প্রাসাদ জবরদখল করেছিলেন। চতুর্থ সূত্রটির ওপর অবশ্য প্রথাগত ঐতিহাসিকের বেশী নির্ভর করেছেন। কিন্তু যদি আমরা বিবেচনা করি যে, ১৬৫১—৫৫ মাত্র চার বছর Tavernier ভারতে ছিলেন, তাহলে এটিও ধোপে টিঁকে না। তাই তাঁর পক্ষে কাজটি শুরু ও শেষ হতে বাইশ বছর লেগেছিলো বলাটা অনেকটা প্রগলভ ঠেকে।

কিন্তু Tavernier-এর এই আপাত-অসঙ্গত বিবরণীরও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় যদি এটিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝা যায়। ১৬৫১ সালে তাঁর ভারতে আসার সময় মমতাজ তাজপ্রাসাদে বিশ বছর ধরে সমাহিত ছিলেন। তাজের চারপাশে একটি বিরাট ভারা বেঁধে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করার কাজ তখন শুরু হয়ে Tavernier ভারতে থাকার সময় শেষ হয়। এতে দু' বছর লেগে থাকলে মমতাজের কবরের আয়ু বাইশ বছর এবং (ভারা বাঁধা ও খোদাইয়ের) কাজটা তার সম্মুখেই শুরু ও শেষ হয়, Tavernier-এর এই মন্তব্য অত্যন্ত সঠিক ঠেকে। কাজেই, শাজাহান কর্তৃক তাজ নির্মাণের সপক্ষে বলে Tavernier-এর বক্তব্যের যে চতুর্থ সূত্রটি দেখানো হয়, তাকেও আমরা আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে লাগাতে পারি যে, শাজাহান তাজপ্রাসাদ জবরদখল করেছিলেন।

কাঠের অভাবের জন্য শাজাহানকে ইঁট দিয়ে তাজের চার পাশে ভারা বাঁধতে হয়েছিলো এবং কাজটি বাইশ বছর পরে শেষ হয়েছিলো, Tavernier-এর এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, সমগ্র মর্মর তাজপ্রাসাদকে বেষ্টনী দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হয়েছিলো দীর্ঘ বাইশটি বছর এবং এতে ইঁট ব্যবহৃত হয়েছিলো ভারার জন্য। অর্থাৎ, প্রায় একপুরুষ ধরে তাজমহল পৃথিবীর চক্ষু থেকে লুকায়িত ছিলো। খুবই স্বাভাবিক যে, দীর্ঘ বাইশ বছর পর যখন ইঁটের ভারা ও বেষ্টনী খুলে তাজপ্রাসাদটি লোকচক্ষুর সামনে আনা হয়, নতুন প্রজন্মের লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, শাজাহানই এই প্রাসাদটির নির্ম্মাতা।

ইঁটের এই রহস্যময় বেষ্টনীর জন্য সরলবিশ্বাসী Peter Mundy ও Tavernier-এর মত বিদেশী পর্যটক অজ্ঞতাপ্রসূত বিভ্রান্ত বর্ণনা রেখে গেছেন এই মর্মে যে, শাজাহানই মমতাজের সমাধির ওপর তাজমহলের নির্মাণ করিয়েছেন। দক্ষ অপরাধ তদন্তকারীর মতোই গবেষক-ঐতিহাসিকের দক্ষতা নির্ভর করবে এই ধরণের অসঙ্গতিপূর্ণ বিবরণীর সম্যক বিচার করে প্রকৃত সত্যি আহরণের কৃতিত্বের ওপর। সৌভাগ্যবশত, তাজমহলের ক্ষেত্রে নানা প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাই যে, মর্মর তাজপ্রাসাদ জবরদখল করে শাজাহান এটি কবরের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

আওরঙ্গজেবের চিঠি ও সাম্প্রতিক খননের সাক্ষ্য

বাদশাহনামা স্বীকার করেছেন যে, তাজমহল হচ্ছে দখল করা হিন্দুপ্রাসাদ। Tavernierও লিখে গেছেন যে, এই তাজপ্রাসাদকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই শাজাহান বেছে নিয়েছিলেন মমতাজের সমাধির জন্য। এ ছাড়াও, আরো তুটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য আছে এ বিষয়ে। প্রথমটি হচ্ছে, সম্রাট শাজাহানের কাজে যুবরাজ আওরঙ্গজেবের লেখা চিঠি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি।

বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিতেরা এবং সাধারণ মানুষ খুবই গোঁড়ামির সঙ্গে সোচ্চারে বলে আসছেন যে, শাজাহান তাজমহল বানিয়েছেন। তাঁরা জানেন না যে, এই গল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে তাদের অনৈক্য খুবই হতাশাব্যঞ্জক। উদাহরণ-স্বরূপ, বিভিন্ন ব্যক্তি অস্পষ্টভাবে বিশ্বাস করেন যে, গল্পের নায়িকা মমতাজ ১৬২৯ থেকে ১৬৩২ সালের মধ্যে কোন এক সময় মারা গেছেন। একইভাবে, শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণে ১০ থেকে ২২ বছর লেগেছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কালে যখন বিভিন্ন বিবরণীর মধ্যে অনৈক্য দেখা যেতো, তখন পশ্চিমী লেখকদের কথা বিশ্বাস করার দিকেই ঝোঁক ছিলো। সেই কারণে, ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, মমতাজের সমাধি নির্মাণে ২২ বছর লাগা সম্পর্কে Tavernier-এর এই উদ্ভট সাক্ষ্য অন্য সমস্ত মুসলিম বিবরণীর চাইতে অধিক আস্থার পাত্র। কিন্তু Tavernier ও অন্যান্য মুসলিম বিবরণীর বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। তাঁদের কেউই বক্তব্যের সপক্ষে তৎকালীন নথি হাজির করতে পারেন নি। কাজেই, সবগুলোই যে সম্পূর্ণ অসত্য হতে পারে, বৃটিশদের মাথায় একথা ঢোকে নি। ফলে, তাঁরা তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে ইউরোপীয় ও মুসলিম লেখকদের রচনার একটা জগাখিচুড়ি সংমিশ্রণ বিশ্বাস করে এসেছেন। এই ধরণের একটা অস্বাভাবিক বিবরণ তাজের প্রবেশপথের তোরণে মর্মরে খোদিত করে রাখা হয়েছে। এতে সমস্ত সরলবিশ্বাসী দর্শকের উদ্দেশ্যে বলা আছে যে, তাজমহল নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে ২২ বছর লেগেছিলো। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যে তথাকথিত দক্ষ ঐতিহাসিকদের পরামর্শে এই ধরণের ফলক

স্থাপন করে তাজের মতো একটা পৃথিবী বিখ্যাত সৌধের নির্মাণ সম্পর্কে পৃথিবীকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

কাজেই ১৬৩০ সালে যদি মমতাজের মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়, পরবর্তী ২২ বছরের হিসেব আমাদের পৌঁছে দেয় ১৬৫২ সালে, যখন সমস্ত সৌন্দর্য ও বিস্তৃতি নিয়ে তাজের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছিলো বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও প্রথাগত ঐতিহাসিকদের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ত একই বছরে যুবরাজ আওরঙ্গজেবের লেখা একটি চিঠি পাওয়া গেছে, যা এই বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটিত করে। জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত ফার্সী ভাষায় লেখা অন্তত দুটো পাণ্ডুলিপিতে এই চিঠিটা পাওয়া যায়। এই পাণ্ডলিপি দুটোর নাম 'আদাব-ই-আলমগিরী' ও ইয়াদগার-ই-আলমগিরী'। এই চিঠিতে আওরঙ্গজেব তাঁর পিতা সম্রাট শাজাহানকে লিখছেন যে, ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণের জন্য দিল্লী থেকে আগ্রা যাত্রা করার পথে তিনি আগ্রায় তাঁর মায়ের স্মৃতিসৌধ দেখতে যান।

পিতা সম্রাট শাজাহানের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে আওরঙ্গজেব তাঁর চিঠিতে লিখলেন, 'আমি মহরম মাসের তিন তারিখ আকবরাবাদ (অর্থাৎ আগ্রায়) পৌঁছলাম। জাহানারার উদ্যানে আমি বাদশাজাদা জাহাবনী (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা) র সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বসন্তের পুষ্পমালিকায় সজ্জিত সেই বর্ণাঢ্য নিবাসে আমি তাদের সান্নিধ্যে সবার কুশল জিজ্ঞেস করলাম। আমি মহবাত খানের উদ্যানে রয়ে গেলাম।

পরের দিন শুক্রবার আমি আপনার উপস্থিতিতে সমাহিত পবিত্র কবরে গেলাম শ্রদ্ধা জানাতে। ওগুলো (কবর, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি) ভাল এবং মজবুত অবস্থাতেই আছে কিন্তু কবরের ওপরের গম্বুজের উত্তরভাগে দুই বা তিন জায়গায় ছিদ্র বলে বর্ষাকালে জল পড়ে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় তলায় কিছু বাসকক্ষ, চারটি ক্ষুদ্র ঝুলবারান্দা এবং কিছু গুপ্তকক্ষ, সাত তলার ছাদ এবং বৃহদাকার গম্বুজের জামপোষও চুইয়ে আসা জলে ভিজে গিয়েছে, বর্তমান বর্ষায় বেশ কিছু স্থানে জল পড়েছে। এসব আমি সাময়িকভাবে মেরামত করিয়েছি।

কিন্তু আমি ভেবে পাই না, পরবর্তী বর্ষায় বিভিন্ন গম্বজ, মসজিদ, জমায়েত-কক্ষ প্রভৃতির কি দশাই না হবে। এসব আরো বিস্তৃতভাবে মেরামত করা দরকার। আমার মনে হয় যে, দ্বিতীয় তলার ছাদটি খুলে ফেলে ইঁট পাথর ও সুড়কি দিয়ে আবার ভরাট করতে হবে। ছোট ও বড় গম্বজগুলির মেরামত করলে প্রাসাদগুলি অবক্ষয়ের হাত এড়াতে পারবে। আশা করি আপনি নিজে ব্যাপারটি অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নির্দেশ দেবেন।

মহতাব উদ্যান জলে ভর্তি হয়ে পরিত্যক্ত দেখাচ্ছে। জল নেবে গেলেই এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য আবার প্রতিভাত হবে।

এই প্রাসাদ-সমুচ্চয়ের পশ্চাতের অংশ যে নিরাপদ দেখাচ্ছে, এটি রহস্য-জনক। পশ্চাতের দেয়াল থেকে নদীটি দূরে থাকায় ক্ষতি নিবারণ সম্ভব হয়েছে।

শনিবারও আমি স্থানটি পরিদর্শন করলাম এবং যুবরাজ দারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও আমার সাথে পাল্টা সাক্ষাৎ করলেন। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি যাত্রা শুরু করলাম (দাক্ষিণাত্যের শাসনভার হস্তে নিতে) রবিবার এবং আজও আট তারিখে আমি ঢোলপুরের কাছাকাছি আছি।'

আওরঙ্গজেবের চিঠি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দেই তাজমহল প্রাসাদ-সমুচ্চয় এতোটা পুরনো হয়েছিলো যে, বিশদ মেরামতের প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিলো। কাজেই ঐ বছর যে কাজে হাত দেওয়া হয়েছিলো, তা' একটা নতুন সৌধের নির্মাণের সমাপ্তি নয়, বরং একটা পুরনো প্রাসাদের মেরামত মাত্র। ১৬৫২ সালেই তাজের নির্মাণ শেষ হয়ে থাকলে, এই ত্রুটিগুলো লক্ষ্যগোচর হওয়াটা আওরঙ্গজেবের আকস্মিক পরিদর্শনের ওপর নির্ভর করতো না। এই নির্মাণ কার্যে জড়িত হাজার হাজার মজুর ও শত শত তত্ত্বাবধায়কদের চোখে এগুলো পড়তোই। আর নির্মাণ সমাপ্তির বছরেই যদি এই ধরণের গভীর ত্রুটি ধরা পড়ে থাকে, তবে নির্মাতাদের অতি দক্ষ বলে প্রচার করাটা অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তাজের নির্মাতারা অতি দক্ষ শিল্পী ছিলেন। তবে তাঁরা শাজাহানের সমসাময়িক ছিলেন না। তাঁরা বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বের হিন্দু কারিগর। কাজেই শাজাহান নয়, কোন প্রাচীন হিন্দু রাজাই তাজ নির্মাণ করিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, তাজের উৎপত্তি মুসলিম কবর হিসেবে নয়, হিন্দু প্রাসাদ হিসেবে।

এই চিঠি থেকে আরেকটা যে অর্থব্যঞ্জক সূত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে, তাজের নির্মাণ ১৬৫২ সালের সমাপ্ত হয়ে থাকলে অন্তত মুখ্য কারিগরদের তাজ উদ্যানের গাছে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। কেননা, তাঁরা শুধু মুঘল রাজকোষের লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়ই করেন নি, মৃতা মহিষীর স্মৃতিকেও অবমাননা করেছেন এমন একটি সৌধ নির্মাণ করে, যাতে সমাপ্তির বছরেই ফাটল ধরেছে। নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের অপর নাম আওরঙ্গজেব, কিন্তু তাঁর চিঠিতে এই ঘটনার জন্য অত্যাধিক ক্রোধ প্রকাশ করেন নি। পরিবর্তে আমরা তাঁকে দেখি ঘুঘুর মতো শান্তস্বরে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকতে

যে, তিনি কিছু মেরামতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই চিঠি তাজ সম্পর্কে তাঁদের ভুল ধারণার নিরসরে ঐতিহাসিকদের সাহায্য করবে।

তাঁর চিঠিতে আওরঙ্গজেব তাজের উদ্যানকে বলছেন 'মহতাব' উদ্যান অর্থাৎ চন্দ্র উদ্যান। •এ থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসি যে, তাজমহল ওরফে তেজ মহা-আলয়ের চারপাশের বাগানের পুরনো সংস্কৃত নাম হয়তো ছিল চন্দ্র উদ্যান। মুসলিম আক্রমণকারীরা কোন বস্তু বা স্থানের দখল পেলে তদানীন্তন সংস্কৃত নামকে ফার্সীতে রূপান্তরিত করে নিতেন। চন্দ্রকিরণে তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগের ধারণাটি স্পষ্টতই শাজাহানের আগের আমলের হিন্দু রীতি থেকেই এসেছে।

আওরঙ্গজেবের চিঠির আরেকটি মনে রাখার মত সূত্র হচ্ছে যে, তিনি এই রহস্যময় ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়েছেন যে, যমুনা নদীর বন্যায় সমগ্র উদ্যান প্লাবিত হলেও নদীর ধারা প্রাসাদের পশ্চাতের দেয়াল থেকে বেশ খানিকটা দূর দিয়েই প্রবাহিত ছিলো। আমাদের সময়েও দেখা যায় যে, চূড়ান্ত বর্ষণের সময়ও যখন জল ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, যমুনা নদীর ধারা কিন্তু তাজের দেয়াল থেকে ১০০ ফিট দূরে বয়ে চলেছে।

আওরঙ্গজেবের পিতা শাজাহান তাজমহলের নির্মাতা হলে যমুনার ধারা তাজ প্রাসাদ থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে থাকার ব্যাপারটা তাঁর কাছে রহস্যময় ঠেকতো না। নির্মাতাদের কেউ তার কাছে সমগ্র বিষয়টি প্রাঞ্জল করতে পারতেন। কিন্তু মুঘল রাজসভাও আওরঙ্গজেবের এই বিস্ময়ের ভাগীদার ছিলো। কোন রহস্যময় উপায়ে যমুনা নদীর ধারা একটি নির্দিষ্ট খাতে বওয়ানো সম্ভব হয়েছে, তা ভেবে তাঁরাও অবাক হয়েছেন। বিষয়টির রহস্য লুকিয়ে আছে তাজমহল ওরফে তেজমহালয়ের নির্মাতা প্রাচীন হিন্দুর দূরদৃষ্টি ও নির্মাণ দক্ষতার উৎকর্ষের মধ্যে। তাঁরা একটি প্রধান নদীর কাছে বৃহৎ সৌধ নির্মাণ— করতে হবে বলে যমুনার উভয় তীরে গভীর খাত খুঁড়ে রেখেছিলেন যাতে প্রচণ্ড স্রোতের সময়ও দ্রুতগতিতে জল নিষ্কাশিত হয়ে যায়। এছাড়া, শুধু যে তাজের কাছেই যমুনা নদীকে এভাবে সুনির্দিষ্ট খাতে বওয়ানো হয়েছিলো তাই নয়, আগ্রা শহরের পাশ দিয়ে এর সমস্ত গতিপথই এভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিলো। এই কারণে, আগ্রার লালকেল্লা, তাজমহল এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে মুসলিম কবর হিসেবে পরিচিত ইতমদউদ্দৌলা প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু রাজপ্রাসাদ সবই যমুনার তীরে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র ভারতেই একটি সুপ্রাচীন প্রথা হলো যে, হিন্দুরা তাঁদের দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি গড়ে তুলতেন সমুদ্র অথবা নদীর তীরে। কচ্ছ সমুদ্রতীরে সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির, বারানসীর গঙ্গার তীরে বিশ্বনাথের প্রকাণ্ড মন্দির ও সৌধমণ্ডিত সুন্দর স্নানের ঘাটগুলিই এর

সম্যক উদাহরণ। নদীর ধারে সৌধ নির্মাণের এই ঝোঁক থাকায় হিন্দুরা বন্যার জন্য ক্ষয়ের হাত থেকে উদ্ধারের উপায় সার্থকভাবে বের করেছিলেন। লুঠপাট ও হত্যার নেশায় বুঁদ মুসলিমরা অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত এবং তাঁদের মরুভূমির ঐতিহ্য অনুযায়ী নদীর তীর অথবা স্রোতের কাছাকাছি স্থানে নির্মাণে অনভ্যস্ত ছিলেন। বিপরীতপক্ষে, হিন্দুরা নির্মাণকার্যের আগে জলাভাব থাকলে জলাধার তৈরী করে নিয়ে কাজে হাত দিতেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা হিন্দু নির্মিত আজমীর (অর্থাৎ অন্নসাগর) ও ফতেপুর সিক্রীর বিস্তীর্ণ সরোবরের উল্লেখ করতে পারি। পরবর্তীটি আকবরের সময়ে শুকিয়ে এসেছিলো কেননা, ফতেপুর সিক্রীর মুসলিম অধিকর্তাদের এই বিস্তীর্ণ সরোবরের বাঁধ সংরক্ষণের জ্ঞান ছিলোনা। এই সরোবর শুকিয়ে যাবার জন্যই প্রায় পনেরো বছর অধিকৃত ফতেপুর সিক্রীতে থাকার পর আকবর ঐ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যাঁরা বিশ্বাস করেন যে আকবরই ফতেপুর সিক্রীর স্থাপন করেছেন, লেখকের 'ফতেপুর সিক্রী হিন্দু নগর' (ইংরেজী), পড়ে দেখতে পারেন।

অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণটি তাজের মর্মরসৌধের সন্মুখবর্তী উদ্যানে ১৯৭৩ সালে আকস্মিক খননকার্য চালাবার সময় পাওয়া গেছে। ফোয়ারাগুলোতে কিছু গোলযোগ লক্ষিত হওয়ায় মাটির নীচে অবস্থিত প্রধান পাইপটা খুঁটিয়ে দেখাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করা হলো। এই পাইপ পর্যন্ত মাটি খোঁড়ার পর নীচে আরো খানিকটা ফাঁপা জায়গা দেখা গেলো। কাজেই ঐ পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে ফেলা হলো। উপস্থিত সবাই ঐ গভীরতায় তখন পর্যন্ত অজানা এক ঝাঁক ফোয়ারার সারি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সবচাইতে যা বেশী অর্থ-ব্যঞ্জক মনে হলো তা হচ্ছে এই যে, এই ফোয়ারাগুলোও তাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংযুক্ত। এই লুকায়িত ফোয়ারাগুলো শাজাহান বা পরবর্তী বৃটিশ শাসকদের দ্বারা সংস্থাপিত হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই এগুলো শাজাহানের পূর্ববর্তী কালের। তাজপ্রাসাদের সঙ্গে এগুলো সংযুক্ত থাকায় স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে যে, এই সৌধটিও শাজাহানের কালের আগে নির্মিত। এই প্রমাণটুকু নিশ্চিতভাবে আমাদের বক্তব্যের সপক্ষেই রায় দেয় যে, শাজাহান তাঁর স্ত্রী সমাধির জন্য হিন্দু প্রাসাদ দখল করেছিলেন মাত্র।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যে কর্মচারী এই খননের তত্ত্বাবধান করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন R. S. Sarma, Conservation Assistant। এই একই ব্যক্তি আরো একটি আকস্মিক তথ্য উদ্‌ঘটনে করেছেন। তথাকথিত মসজিদ এবং মর্মর প্রাসাদের পশ্চিমদিকে বৃত্তাকার কূপের সমীপবর্তী চত্বরে লাঠি হাতে পদচারণার সময় শ্রীশর্ম লক্ষ্য করেন যে, তাঁর লাঠি যেখানে আঘাত করছে

তার ভেতর থেকে একটা ফাঁপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তিনি ঐ স্থানের ওপরকার প্রস্তর আবরণী সরাবার ব্যবস্থা করলেন। আর অবাক হয়ে দেখলেন একটা অতি প্রাচীন প্রবেশপথ, যা শাজাহানই বন্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন মনে হয়। ঐ পথটি পৌঁছে দিচ্ছে একটা সিঁড়ির মুখে, যার প্রায় পঞ্চাশটি ধাপ শেষ হয়েছে একটা অন্ধকার, ঢাকা বারান্দায়। চত্বরের নীচের দেয়ালটাও দেখা গেলো ফাঁপা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, পূর্বদিকের চত্বরের এই রকম জায়গাতেও লুকিয়ে আছে একই ধরণের সিঁড়ি ও ঢাকা বারান্দা। ঈশ্বরই জানেন, এরকম কত সিঁড়ি, ঘর, দেয়াল ও তলা পৃথিবীর অজ্ঞাতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণের অজ্ঞতা থেকেই তাজের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের দুঃখ-জনক অবস্থা বোঝা যায়। মনে হয় না, কেউই তাজের অভ্যন্তরে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছেন বা প্রচলিত বিবরণগুলি খুবই মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই দৈন্য সত্যিই দুঃখ দেয় মনে।

E. B. Havell এর মতো কিছু স্থাপত্য ও ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, তাজের নক্সা পুরোপুরি হিন্দু রীতির। আমাদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ধারণা ও নির্মাণে তাজ নিঃসন্দেহ ভাবে হিন্দু আর মুঘল সম্রাট শাজাহানের বেশ কয়েকশো বছর আগেই এটি মন্দির প্রাসাদ হিসেবে হিন্দুরা নির্মাণ করেছিলেন। কেবল হিন্দুদেরই যে তাজের পরিকল্পনার প্রতিভা এবং এটি নির্মাণ ও ভালোভাবে সংরক্ষণের দক্ষতা ছিলো, অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। বোম্বে থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত মারাঠী দৈনিক 'লোকসত্ত্ব'তে শ্রীগোলাবরাও জগদীশের ২৭ মে ১৯৩৯ সালের একটি প্রবন্ধে ঘটনাটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ঐ প্রবন্ধের লেখক শ্রীজগদীশের মতে, ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে তাজমহল সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত জনৈক বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার গম্বুজে একটি ফাটল লক্ষ্য করলেন। তিনি এটি মেরামতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তিনি ফাটলটির কথা ওপরওলাদের গোচরে আনলেন। কিন্তু তাঁরাও কোন সুরাহা করতে পারলেন না। যতদিন গেলো, ফাটলটি তত বিস্তৃত ও গভীর হতে লাগলো। ফাটলটি মেরামতের জন্য ইঞ্জিনীয়ারদের একটি সমিতি গঠিত হলো, কিন্তু তাতেও ফল হলো না। তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো পাছে ফাটলটি বড় হয়ে গম্বুজটি ধ্বসিয়ে দেয়।

কর্তৃপক্ষ যখন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।, একটি গ্রাম্য চেহারার হিন্দু তাঁদের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর নাম পূরণচাঁদ। নির্বাহী বাস্তুকারকে তিনি জানালেন যে, ফাটলটি মেরামতের বিদ্যা তাঁর জানা আছে এবং তাঁকে একবার সুযোগ দেওয়া হোক। পুঁথিপড়া আধুনিক ইঞ্জিনীয়াররা বিফল

হওয়াতে কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই গ্রাম্য লোকটিকে সুযোগ দেওয়া হলো। অবশ্য লোকটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁদের মনে যথেষ্টই দ্বিধা ছিলো।

একদল রাজমিস্ত্রী নিয়ে পূরণচাঁদ কাজে লেগে পড়লেন। তিনি একধরণের চুণমিশানো কংক্রীট তৈরী করে ঐ মশলা দিয়ে নিজে ফাটলটি ভরাট করলেন। মিশ্রণটি শক্ত হয়ে এতো নিখুঁতভাবে গম্বুজের আস্তরের সঙ্গে মিশে গেলো যে, কিছুদিনের মধ্যে ফাটলের চিহ্নমাত্রও রইলো না।

একজন অখ্যাত হিন্দু মিস্ত্রীর দক্ষতার কাছে বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারদের পাণ্ডিত্যের এই পরাজয় ভারতে বৃটিশ আমলাদের মধ্যে বহুল আলোচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়ের কানে পৌঁছুলো।

একজন প্রায় অশিক্ষিত হিন্দু মিস্ত্রীর কাছে তাঁর ইঞ্জিনীয়ারদের এই পরাজয়ে ভাইসরয় আশ্চর্যবোধ করলেন। তাজ প্রাসাদ সংরক্ষণের তদারককারী হিসেবে পূরণচাঁদকে নিয়োগের কথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ভাবছিলেন, কিন্তু ভাইসরয়ের প্রশংসায় ইঞ্জিনীয়াররা পূরণচাঁদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন। তাঁরা পূরণচাঁদকে চাকরি না দিতে সংকল্পবদ্ধ হলেন। ফলে পূরণচাঁদের কপালে ঐ চাকরি জুটলো না। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো এবং তাজমহল ও সংরক্ষণের ব্যাপারটা পশ্চাদ্‌পটে সরে গেলো।

১৯৪২ সালে হিন্দু নেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর ভাইসরয়ের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হলেন এবং শ্রম বিভাগের দায়িত্ব তাঁর হাতে রইলো। পূরণচাঁদ এই নিয়োগে আশার ইঙ্গিত দেখতে পেলেনা। ভাঙ্গা হিন্দীতে তাঁর হতাশার বিষয়ে পূরণচাঁদ এক চিঠি লিখলেন ডঃ আম্বেদকরকে। চিঠিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিলো যে পারিশ্রমিকের মোহ নয়, একটি জাতীয় ঐতিহ্যময় সৌধের ঠিকমতো পরিচর্যা ও ভবিষ্যৎপুরুষের জন্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের উচ্চাশা পূরণের জন্যই পূরণচাঁদ তাজমহল সংরক্ষণের জন্য চাকরীর সুযোগ চাইছিলেন।

পূরণচাঁদের আন্তরিকতায় ডঃ আম্বেদকর বিচলিত হলেন। তিনি তদানীন্তন ভাইসরয়ের সঙ্গে পূরণচাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিক প্রাসাদ সংরক্ষণের সহকারী বাস্তুকার হিসাবে পূরণচাঁদকে তিনি নিয়োগ করতে চান ভাইসরয়কে একথা জানিয়ে ডঃ আম্বেদকর তাঁকে আরো কিছু সম্মান দেবার অনুরোধ করলেন। ভাইসরয় রাজী হয়ে পূরণচাঁদকে 'রায় সাহেব' উপাধি দিলেন।

প্রবন্ধটির লেখক শ্রীগুলাবরাও জগদীশ আশ্বাস দিচ্ছেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

Peter Mundy-র সাক্ষ্য

ইংরেজ পর্যটক Peter Mundy ১৬৩০ খ্রীঃ থেকে ১৬৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। Travels in Europe & Asia 1608,—1637, নামে তাঁর দিনপঞ্জী R C Temple এর সম্পাদনায় Hakluyt Society কর্তৃক পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, ১৯০৭—১৯৩৬ সালের মধ্যে। দ্বিতীয় খণ্ডের ২১৩ পৃষ্ঠায় Mundy বলেছেন, 'তার (মমতাজ) কবরের চার পাশে সোনার গরাদ রয়ে গিয়েছে। নির্মাণ শুরু হয়েছে এবং প্রচুর অর্থ ও শ্রমের বিনিয়োগে অতিরিক্ত অধ্যবসায়ের সাথে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোনা রূপাকে সাধারণ ধাতুর মতো ও মর্মরকে সাধারণ প্রস্তরের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, শাজাহান চাইছেন সমস্ত শহরেই একটা ওলট পালট ঘটাতে, বিশেষত উঁচু ঢিবিগুলোকে সমতল করে দিতে যাতে এগুলো দৃষ্টিপথের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।...'

ওপরের পরিচ্ছেদটি খুবই অর্থব্যঞ্জক আবার খুব বিভ্রান্তিকরও বটে। ইংরেজ Peter Mundy ও ফরাসী Tavernier-এর মতো পশ্চিমী পর্যটকদের অসংলগ্ন লেখার ওপর অত্যধিক নির্ভরতা ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে কতোটা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে তা স্পষ্ট, যখন দেখি যে, এই সমস্ত লেখাকে আলগা-ভাবে তুলে ধরা হয় শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে।

আমরা ওপরের উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাই যে, Mundy-র লেখাও আমাদের গবেষণার এই সিদ্ধান্তেরই পুষ্টি জোগায় যে, স্মৃতিসৌধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য জবরদখল তাজমহল হলো পূর্বেকার মন্দির-প্রাসাদ।

প্রসঙ্গত, আমাদের বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যাবে কিভাবে কিছুটা ধৈর্য্য ও সতর্কতা অবলম্বন করে নানা কায়দায় প্রচারিত এই ধরণের মিথ্যার ফাঁদের সার্থক মোকাবিলা করা যায়।

প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, Mundy ভারতে ছিলেন মোটে ১৬৩৩ সাল সর্যন্ত। বলা হয় যে, ১৬২৯ থেকে ১৬৩২ এর মধ্যে মমতাজের মৃত্যু হয়েছিলো। এর অর্থ মমতাজের মৃত্যুর পর Mundy বড় জোর বছর দুয়েক

ভাবতে ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময় প্রকাণ্ড তাজ প্রাসাদ সমুচ্চয়ের ভিত্তি স্থাপনের পক্ষে অপর্যাপ্ত। নদীর এতোটা নিকট সান্নিধ্যে ভিত্তি স্থাপনের কাজ শুরু করার আগে নদীর জল প্রাসাদে চুঁইয়ে ঢোকার পথ সফলভাবে বন্ধ করতে হবে পাকা কুয়ো ও সুড়ঙ্গের গাঁথনির সাহায্যে। ঠিক এই রকমটিই দেখা যায় পশ্চাতের দেয়াল থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত, এবং তাজ প্রাসাদ সমুচ্চয়ের প্রাচীন হিন্দু নির্মাতারা এই ব্যবস্থই গ্রহণ করেছিলেন।

এরপরও, মাত্র দু' বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই Mundy উল্লেখ করছেন একটি স্বর্ণনির্মিত গরাদ, যার অলঙ্করণে ব্যবহৃত মুক্তোর মূল্য বলা হচ্ছে ছয় লক্ষ টাকা।

পাঠক ও গবেষকরা চিন্তা করে দেখতে পারেন যে, এই ধরণের অতুল ঐশ্বর্য এমন উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা যায় না; যেখানে হাজার হাজার মজুর কাজ করছে আর প্রকাণ্ড ভিত্তির জন্য ধুলো আর ময়লায় যেখানে আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে আছে। এই ধরণের মূল্যবান এবং উজ্জ্বল আসবাব কি প্রাসাদ শেষ হওয়ার পর বসানোই স্বাভাবিক নয়? মমতাজের মৃত্যুর দু' এক বছরের মধ্যেই যে Mundy তাঁর কবরের চার পাশে সোনার গরাদ দেখেছিলেন তাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি গম্বুজের নীচের প্রকোষ্ঠে গিয়েছিলেন, যেমনটি আজকের পর্যটকরাও যান। মমতাজের মৃত্যুর অনতিপরেই ঐ প্রাসাদের অস্তিত্ব থেকে প্রমাণ হয় যে, শাজাহান একটি প্রাচীন মন্দির প্রাসাদ জবরদখল করেছিলেন আর অনুরূপ স্বীকারোক্তিই আমরা পাই বাদশাহনামার প্রথম খণ্ডের ৪০৩ পাতায়।

এর পর প্রশ্ন ওঠে, Mundy যে নির্মাণের কথা বলছেন তার স্বরূপ কি? এর জবাবেও Mundy একটি নিখুঁত সূত্র দিয়েছেন। যেহেতু শাজাহান একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ জবরদখল করেছিলেন, একে মুসলিম স্মৃতিসৌধের কিছুটা সাদৃশ্য দেওয়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। প্রত্নতাত্ত্বিক এই জালিয়াতির অঙ্গ ছিলো সংস্কৃত লিপি ও হিন্দু মূর্তির অপসারণ করে পরিবর্তে কোরাণের বয়েত দিয়ে জায়গাটি ভরানো। আওরঙ্গজেবের চিঠি থেকে আমরা জেনেছি যে, ঐ সমুচ্চয়ের সমস্ত সৌধ পুরনো ও বহুব্যবহৃত হওয়ার জন্য জল চুঁইয়ে পড়তো। গম্বুজযুক্ত কেন্দ্রীয় মর্মর কক্ষের পূর্বে ও পশ্চিমে নানা জায়গায় আরবী 'আল্লা' শব্দটি খোদাই করে চাপানো হয়েছিলো। এ সবের জন্যই প্রয়োজন হয়েছিলো প্রকাণ্ড ভারা বাঁধার, যা সমগ্র প্রাসাদের চার পাশে অনেকটা উচ্চতা পর্যন্ত রাখতে হয়েছিলো। এই কারণেই Tavernier অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে লিখেছেন যে, 'ভারা বাঁধার খরচ সমগ্র কাজটার খরচের চাইতে বেশী ছিলো।'

কাজেই, বহুমুখী সংস্কারের কাজ চলতে থাকা ঐ সৌধে যখন Peter Mundyর মতো বিদেশী পর্যটক আকস্মিক এসে হাজির হন, সৌধটির নির্মাণ-পর্ব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বলে তাঁর মন্তব্য খুব অন্যায় নয়। তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে, কয়েক পুরুষ পর সাধারণ্যে এই প্রতীতিই জন্মাবে যে, শাজাহান নিজেই তাজ-প্রাসাদ সমুচ্চয় নির্মাণ করিয়েছেন। ইতিহাসের এই ধরণের সম্ভাব্য বিকৃতির আন্দাজ করা Tavernier বা Peter Mundyর পক্ষে সহজ ছিলো না। তাই তাঁরা তাঁদের বক্তব্য আরো প্রাঞ্জল করেন নি। আমরা নিজেরাও এই ধরণের কোন প্রাসাদ আকস্মিকভাবে পরিদর্শনের সুযোগ পেলে অধিক প্রাঞ্জল মন্তব্য করতাম না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি বোম্বাই বা লণ্ডনে অপরের কোন প্রাসাদ এইভাবে দখলীকৃত হয়ে সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারা বাঁধার পর্য্যায়ে থাকা অবস্থায় দেখি, আমরা কখনোই বর্তমান মালিককে তিনি কার থেকে কিভাবে, কি মূল্যে প্রাসাদটি নিয়েছেন বা কি উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করতে চান, এই ধরণের প্রশ্ন করতে পারবো না। আমরা শুধু এটিকে বর্তমান মালিকের প্রাসাদ বলেই ক্ষান্ত থাকবো। তাছাড়া, ভাষা, জাতি, সংস্কৃতি, ক্ষমতা ও আর্থিক বিষয়ে উভয়ের ফারাকও আরো খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, Peter Mundy বা Tavernier বা এই ধরণের অন্যান্য পর্যটক কেউই গবেষক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ব্যস্ত পর্যটক ও সাধারণতঃ দরিদ্র। কাজেই মুঘল রাজসভার সাথে তুল্য মর্য্যাদায় আলোচনা চালানোর সামর্থ্য তাঁদের ছিলো না। এই বিদেশী পর্যটকেরা তাঁদের ভরণ-পোষণ, রাজকীয় প্রাসাদ পরিভ্রমণের অনুমতি, বিভিন্ন সংবাদপ্রাপ্তি ও ফার্সী ভাষায় প্রদত্ত এই সব সংবাদের ব্যাখ্যার জন্য নিষ্ঠুর মুঘল রাজসভার মুখাপেক্ষী ছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে মধ্যযুগে অথবা প্রাচীন ভারতে আগন্তুক বিদেশী পর্যটকের ছুটকো মন্তব্য আধুনিক গবেষকের খুবই সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক পণ্ডিতেরা গবেষণার এই প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে পারেন নি। সরল বিশ্বাসে তাঁরা যে কোন ধরণের আলগা মন্তব্যকেই ধ্রুব সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন, সমকাল ও পরিস্থিতির নিরিখে এগুলোর সঠিক মূল্যায়ণ না করেই। যেমন, Peter Mundyর ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য হলো যে, তিনি মমতাজের মৃত্যুর পর মাত্র বছর দুয়েক ভারতে ছিলেন এবং এই স্বল্প সময়েই তিনি কবরের চার পাশে সোনার গরাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

Peter Mundyর আরেকটি খুবই অর্থব্যঞ্জক মন্তব্য হলো যে, শাজাহান

তাজের চার পাশে উঁচু ঢিবিগুলো সমতল করে দিয়েছিলেন। শাজাহান কিছু ঢিবি সমতল করা সত্ত্বেও ভ্রমণকারীরা তাজে প্রবেশের মুখে পথের উভয় দিকেই এই ধরণের কিছু ঢিবি এখনও দেখতে পাবেন। প্রাচীন হিন্দুরা তাজমহল প্রাসাদ-সমুচ্চয় নির্মাণের কালে ভিত্তি খুঁড়ে পাওয়া মাটি দিয়ে এই সব উঁচু ঢিবি কৃত্রিম ভাবে তৈরী করিয়েছিলেন। এটিই ছিলো সাধারণ প্রথা। যেমন, ভরতপুর নামক প্রাচীন দুর্গের চারপাশে ছিলো পরিখা। এই পরিখা খননের ফলে পাওয়া মাটি দিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে উঁচু স্তূপ করে রাখা হয়েছিলো আরক্ষার প্রয়োজনে প্রতিবন্ধক হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। তাজ হিন্দুমন্দির প্রাসাদের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিলো। তিনটি উদ্দেশ্যে ভিত্তি খুঁড়ে পাওয়া মাটি দিয়ে প্রাসাদের চারপাশে কৃত্রিম পাহাড় তৈরী করা হয়েছিলো। প্রথমত, এভাবেই উদ্বৃত্ত মাটি সরানোর হাঙ্গামা এড়ানো গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, চারপাশের সবুজের মাঝে এই পাহাড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবর্ধক এবং তৃতীয়ত, শত্রুপক্ষের সদলে তাজ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক তৈরী হয়েছিলো এতে।

অন্যান্য কাজের বর্ণনা না দিয়ে Mundyর শুধু এই উঁচু ঢিবিগুলো সমতল করার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সমসাময়িক পর্যবেক্ষকের চোখেও শাজাহানের এই কাজটিই মুখ্য বলে মনে হয়েছিলো। তা না হলে এই অকিঞ্চিৎকর বিবরণ Peter Mundy'র তাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে স্থান পেতো না। শাজাহান সত্যিই তাজমহলের নির্মাতা হলে Tavernier ও Bernierএর মত বিদেশী পর্যটক দেখতে পেতেন গভীর ভিত্তি খোঁড়ার চিহ্ন, প্রাসাদের পশ্চাদভাগে সুনির্মিত প্রাচীরের সাহায্যে নদীর জল যাতে স্থানটি প্লাবিত না করে সেই চেষ্টার সাক্ষ্য এবং সুবৃহৎ সব প্রস্তরখণ্ড কাটিয়ে ও খোদাই করে সুউচ্চে স্থাপনের দৃষ্টান্ত। তাজমহল হচ্ছে অসংখ্য চতুষ্কোণ মহল সমন্বিত একটি সাততলা সৌধ। এতে আছে সুউচ্চ প্রাচীর যাতে কিছু তীক্ষ্ণশলাকাবিশিষ্ট দরজা আছে। এই সবের নির্মাণের কথা না বলে Mundy কেবল উঁচু ঢিবি সমতল করার কথাই বলেছেন কেন?

সৌভাগ্যবশত, Mundy এই ঢিবি সমতল করার উদ্দেশ্যের কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঢিবিগুলো সমতল করা হয়েছিলো যাতে এগুলো স্মৃতি-সৌধের প্রাঞ্জল দর্শনের প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়। মমতাজের মৃত্যুর বছর দুয়েকের মধ্যেই স্মৃতিসৌধের সুস্পষ্ট দৃশ্যের জন্য এই ঢিবি ভরাট করার উল্লেখ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই তাজ প্রাসাদ-সমুচ্চয় আগে থেকে বিদ্যমান ছিলো। দূর থেকে যাতে এই সৌধটি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেজন্য ঢিবিগুলো সমতল করার প্রয়োজন হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে Mundy'র

মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন তাজপ্রাসাদের হিন্দু নির্মাতারা এই ঢিবিগুলো নির্মাণ করিয়েছিলেন প্রাসাদটিকে বিদেশী শত্রুপক্ষের আড়ালে রাখার জন্য। যেহেতু শাজাহান একে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি কবরে পরিবর্তিত করেছিলেন, সাধারণের চোখের আড়ালে এই প্রাসাদকে রাখার প্রয়োজন তাঁর ছিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

Encyclopaedia Britannica

যদিও আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে শাজাহান নিযুক্ত লেখক মোল্লা আবদুল হামিদ লাহোরী এবং Tavernier এর রচনা উদ্ধৃত করে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছি যে, তাজমহল হচ্ছে একটা জবরদখল করা হিন্দু প্রাসাদ, তবুও তাজমহল সম্পর্কে কত ধরণের অলীক কল্পনা এই তিনশো বছরে শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে আছে তার কিছুটা ইঙ্গিত পাঠককে দেবার জন্য আমরা অন্যান্য বিবরণীর বিচার করবো।

দুনিয়ায় তত্ত্ব ও তথ্যের বিপুল ভাণ্ডার হিসেবে Encyclopaedia Britannica-র বিপুল খ্যাতি। এই বইতে তাজমহল সম্বন্ধে বেশ কিছুটা খবর দেওয়া আছে। 'আগ্রা শহরের বাইরে যমুনার দক্ষিণতীরে নির্মিত এক সমাধি এই তাজমহল।' এটি নির্মিত হয় মুঘল সম্রাট শাজাহানের আদেশে। মুমতাজ-ই মহল অর্থাৎ 'প্রাসাদের সবচেয়ে প্রিয়'। তাজমহল এই মুমতাজ-ই মহলের অপভ্রংশ ; নামে পরিচিতা প্রিয় সম্রাজ্ঞী আর্জুমন্দ বানু বেগমের স্মৃতি এই তাজমহল। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে বিবাহের সময় থেকে সম্রাটের নিত্যসঙ্গিনী সন্তান প্রসবের সময় ১৬৩১ সালে বুরহানপুর শহরে পরলোকগমন করেন। ১৬৩২ সালে এই ভবন নির্মাণ শুরু হয়।

ভারত, পারস্য, মধ্য এশিয়া ও আরও দূরের স্থপতিদের নিয়ে গঠিত এক পরামর্শমণ্ডলী এর পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনাকে পাকা রূপ দেওয়ার কৃতিত্ব দেওয়া হয় তুর্কীদেশীয় অথবা পারস্যদেশীয় ওস্তাদ ঈশাকে। অবশ্য মূল নির্মাতা, রাজমিস্ত্রী, লিপি বিশারদ ইত্যাদি ও নির্মাণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এসেছিলো সারা ভারত ও মধ্য এশিয়া থেকে। ১৬৪৩ সালের মধ্যে এই সমাধি সৌধ গড়ে তুলতে ২০ হাজারের বেশী শ্রমিক রোজ কাজ করেছিলো। অবশ্য তাজমহলের আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজ শেষ করতে লেগেছিলো ২২ বছর। খরচ পড়েছিলো ৪ কোটি টাকা।

এই সন্নিবেশে আছে উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত ৬৩৪ গজ লম্বা আর ৩৩৪ গজ চওড়া এক চৌকো জায়গা। এই জমির মাঝখানে ৩৩৪ গজ লম্বা আর ৩০৪ গজ চওড়া একটি বাগান। এই বাগানের শেষে চৌকো চৌহদ্দীর দক্ষিণে বালি

পাথরে নির্মিত প্রবেশের তোরণদ্বার ও তার সঙ্গে সংযুক্ত দ্বারীদের কক্ষ ; বাগানের উত্তরে চৌহদ্দীর জমিতে দাঁড়িয়ে আছে তাজমহল।

তাজমহলের গায়েই যমুনা। তাজমহলের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ২টি সুন্দর একই রকমের ভবন। একটি মসজিদ, অপরটি 'জবাব'। এই সমস্ত সন্নিবেশটাই উঁচু লাল বালি পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের চারকোণে আটকোণা শিবিরের চূড়া, দক্ষিণে দেয়ালের বাইরে আস্তাবল, বহির্ভবন, প্রহরী নিবাস, এই সমস্ত সন্নিবেশটাই বেগমের স্মৃতিসৌধ। মুঘল স্থাপত্যের ধারা অনুযায়ী পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন স্বীকৃত না হওয়ায় সমগ্র সন্নিবেশ একই সঙ্গে পরিকল্পিত হয় ও তার নক্সা তৈরী হয়।

এর উত্তর অংশে তাজমহলের দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদ ও 'জবাব' স্থাপত্যের দিক থেকে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়। এই দুটি সিক্রীর লাল বালিপাথরের তৈরী, গম্বুজের নীচেতে মর্মরখচিত আর সংযত কারুকার্য শোভিত। মদিনার পরিচ্ছন্ন শ্বেতমর্মরের নির্মিত সৌধভবনের সান্নিধ্যে এদের সুন্দর মানায়

৩১২ ফুট দীর্ঘ ও ৩১২ ফুট প্রশস্ত, ২৩ ফুট উচু এক মর্মরখচিত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে মূল সমাধি সৌধ। সবার উপরে আছে যুগ্ম চূড়া, জমি থেকে যার শীর্ষবিন্দুর উচ্চতা ২৩৩ ফিট। সমাধি সৌধের অভ্যন্তরে আছে একটি আটকোণ কক্ষ, যাতে বেগম ও শাজাহানের সমাধি আছে বলে লোকের বিশ্বাস। আসলে এরও নীচে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাগানের সমতলে রয়েছে 'দুটি প্রস্তরনির্মিত শবাধার।'

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, উদ্ধৃতির প্রথমাংশে আর্জুমন্দ বানু বেগমের মমতাজ মহল নামকরণের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তাজমহল যার অপভ্রংশ, সেই মমতাজ মহল কথাটার মানে হচ্ছে 'সমস্ত মহলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' এই ব্যাখ্যাই পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, এই উপাধিটি মহিষীকে দেওয়া হয়েছিলো কেননা, একটা হিন্দু প্রাসাদ বেছে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে কবর দেওয়ার জন্য। আমরা শাজাহানের সরকারী অনুলেখকের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি যে, জীবিতকালে তার নাম ছিল মমতাজ-উল-জামানি, মমতাজ মহল নয়। কাজেই Encyclopaedia-র এই ধারণা ভ্রান্ত যে, মহিষীর মমতাজ মহল নামকরণ থেকেই প্রাসাদের তাজমহল নাম এসেছে। ঐ মহিলার নাম কখনোই মমতাজ মহল ছিলো না। মৃত্যুর পর প্রাসাদে কবরস্থ করার সময় ঐ নামকরণ তাঁর হয়েছিলো। অর্থাৎ, ঐ মহিলার নাম থেকে প্রাসাদের নামকরণ হওয়া দূরে থাক, উল্টোটাই হয়েছিলো। ঐ জবরদখল প্রাসাদের সৌন্দর্য, মহিমা এবং খ্যাতির প্রলোভন এত বেশী মাত্রায় ছিল যে, শাজাহানের মৃতা মহিষীর নামকরণ ঐ প্রাসাদের নামেই করা হয়েছিলো।

Encyclopaedia-র মতে মমতাজের মৃত্যু হয় ১৬৩১ সালে। কিন্তু আমরা দেখাবো যে, মুসলিম লেখকদের মতে ঐ সময়টা ১৬৩০ সাল। কাজেই, মমতাজের মৃত্যুর সঠিক সময়টাও অনিশ্চিত। স্বভাবতই, মমতাজের মৃতদেহ উত্তোলিত করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া, তাজমহল নির্মাণ, প্রভৃতির তারিখও সঠিকভাবে বলা নেই। পাঠকেরা এতেই বুঝবেন যে, স্মরণীয় তারিখগুলো সম্পর্কেও মুসলিম লেখকদের রচনা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। এতে আরও বোঝা যায় যে, তাজমহল সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর সবকয়টা দিক নিয়েই প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে।

Encyclopaedia-র মতে ১৬৩২ সালে তাজমহলের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছিলো। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষের মতে নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল ১৬৩১ সালে। এরূপ অসঙ্গতি আরো অনেক আছে, কেননা মমতাজের মৃত্যুর সঠিক তারিখই অজানা। Encyclopaedia আরো বলছেন যে, 'পরিকল্পনা তৈরী করা হয় ভারত, পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং আরো দূরের স্থপতিদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে'। এই বক্তব্য ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ১৬৩১ সালে মমতাজের মৃত্যু হয় ধরে নিয়ে আমরা কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই। সেই গো-যান ও উটের যুগে এক বছর বা তারও কম সময়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়ানো স্থপতিদের বাছাই করে যোগাযোগ করা, একটি অতুলনীয় সমাধির ধারণা বোঝানো, পরিকল্পনাকে পাকা রূপ দেওয়ার জন্য সমিতি গঠন করা এবং সেই সঙ্গে নির্মাণকার্য শুরু করা কি সম্ভবপর? কোন পণ্ডিতই তাজমহল সম্পর্কে নানাধরণের প্রচলিত গল্পকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখেননি বলেই এত গণ্ডগোল। আমরা এই সঙ্গে আরো বলতে চাই যে, মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ স্থপতিদের কোন সমিতির কথা বলছেন না। বরং বলছেন যে, বিভিন্ন স্থপতিদের কাছ থেকে পাওয়া অনেক নক্সার মধ্যে একটিকে বাছাই করা হয়েছিলো।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে, শাজাহানের নিজস্ব অনুলেখক কোন নক্সা বা স্থপতির কথা বলছেন না। তিনিই সঠিক এবং Encyclopaedia ভ্রান্ত, কেননা, মমতাজকে একটি প্রাসাদেই কবর দেওয়া হয়েছিল। যদি সত্যিই কোন নক্সা করা হয়ে থাকতো, তবে শাজাহানের আমলের কাগজপত্রে তা পাওয়া যেতো। কিন্তু ঐ নক্সা পাওয়া যায়নি। Encyclopaedia-তে যে ৪ কোটি টাকা খরচের কথা লেখা আছে, তা শাজাহান নিযুক্ত লেখক মোল্লা আবদুল হামিদ লাহোরীর উল্লেখিত ৪০ লক্ষ টাকার দশগুণ। তাজমহলের নির্মাণকার্যে খরচ হওয়া টাকার পরিমাণ যে কিভাবে বাড়ানো হয়েছে, পাঠক উপরের দৃষ্টান্ত থেকে তার কিছু প্রমাণ পাবেন।

Encyclopaediaতে তাজমহলের আনুষঙ্গিক 'আস্তাবল, বহির্কক্ষ, প্রহরীদের আবাস' প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষ্য করার মতো। মৃত ব্যক্তির এইসব বহিরঙ্গের প্রয়োজন হয় না। অথচ হিন্দু মন্দির বা প্রাসাদে এগুলোর উপস্থিতি অপরিহার্য।

Encyclopaediaতে যে আটকোণা শিবিরের স্তম্ভের কথা বলা আছে তা রামায়ণের কাল থেকেই হিন্দু ঐতিহ্যের অঙ্গ। হিন্দু রাজাদের আদর্শ সম্রাট রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা ছিলো অষ্টকোণ—একথা বাল্মিকীর রামায়ণে আছে। একমাত্র হিন্দু ঐতিহ্যেই আটদিকের প্রত্যেকটার সুনির্দিষ্ট নাম আছে এবং প্রত্যেক দিকের একজন করে অধিপতি আছেন। এছাড়াও, উপরে আকাশ ও নীচে পাতাল মিলিয়ে মোট দশদিক,—রাজা যার ওপর কর্তৃত্ব করেন বলা হয়। প্রাসাদের চূড়া ইঙ্গিত দেয় আকাশের আর ভিত্তিভূমি ইঙ্গিত দেয় পাতালের। কাজেই, একটা আটকোণা প্রাসাদ তার চূড়া ও ভিৎ নিয়ে মোট দশদিকের নির্দেশ করে, যার ওপর রাজা বা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। এটা পুরোপুরি হিন্দু ধারণা। এই কারণেই, প্রথাগত হিন্দু সৌধসমূহ সব আটকোণ বিশিষ্ট। তাজমহলের অষ্টকোণ আকৃতি ও এর চূড়া সবই হিন্দু রীতির নক্সার অনুসারী। মুসলমান ঐতিহ্যে এই আটকোণের কোন বৈশিষ্ট্যই নেই।

Encyclopaedia ভুল করে তাজমহলের চারপাশে চারটি মর্মরস্তম্ভকে মসজিদের চূড়া বলেছেন। এগুলো মূল প্রাসাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হিন্দু স্তম্ভ। এদেরকে মসজিদের চূড়া বলা যায় না। হিন্দু রীতিতে প্রত্যেকটি পবিত্র ভিত্তির কোন চূড়া থাকবেই, যাতে তা সমাধি বলে ভ্রম না হয়।

সপ্তম অধ্যায়

বাদশাহনামার বিবরণীর আলোচনা

প্রচলিত বিবরণ সমূহের নমুনা হিসাবে আগে যা দেখানো হয়েছে তাতেই পাঠক বুঝতে পারবেন তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথায় কত রকমের মিশ্রণ আছে। যত খুঁটিয়ে এগুলো দেখা হয়, ততই বিভ্রান্তি বেড়ে যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, ব্যাপারটা একটা গভীর রহস্যের মোড়কে আঁটা। আর এ পর্যন্ত কেউই এর সঠিক সমাধান বের করতে পারেন নি। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাতেও আমরা জানি যে, একটা তুচ্ছ মিথ্যা পরবর্তী অনেক বড় মিথ্যা দিয়েও সম্পূর্ণরূপে চাপা দেওয়া যায় না। নানা বৈচিত্র্যময় মিথ্যাই শুধু বেড়ে যেতে থাকে। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে তাজমহলকে নিয়ে।

তাজমহল সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রচলিত আছে তা মোটামুটি পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি, শাজাহানের সভাসদ ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল হামিদ লাহোরীর বৃত্তান্তই সত্যের কাছাকাছি যায়। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তাজমহল হিন্দু প্রাসাদ।

কাজেই তাঁর বর্ণনা আমরা একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চাই। তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তির মূল হেতু এই যে, ঐতিহাসিকেরা বাদশানামার প্রথম খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠার লেখাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন। এই অবহেলার অনুমিত কারণ হলো, তাঁরা সকলেই তাজমহলকে কবরের কল্পনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভালোবাসার এক মহান স্মারক হিসেবেই দেখেছেন। যখন বাদশা-নামার লেখককে এই ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অধিক সত্যবাদিতার পরিচয় রাখতে দেখি, তখন তাঁর বর্ণনা আরো খুঁটিয়ে দেখতে বাধা নেই।

প্রথমেই লক্ষণীয় যে, যদিও প্রচলিত গুজবে শাজাহান জয়সিংহের কাছ থেকে একখণ্ড উন্মুক্ত জমি নিয়ে তাতে তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন, মোল্লা আবদুল হামিদ অকপট সরলতার সাথে লিখছেন যে, জয়সিংহকেই তাঁর পিতৃপুরুষের চূড়ামণ্ডিত প্রাসাদের পরিবর্তে একখণ্ড জমি দেওয়া হয়েছিলো। তিনি আরও বলেছেন যে, এই প্রাসাদের চারপাশে একটা অতি সুন্দর সুবিস্তীর্ণ বাগান ছিলো।

শাজাহান যদি সত্যিই আনকোরা নতুন কিছু তৈরী করতে চাইতেন, তিনি কি এমন একটা জায়গা বেছে নিতেন যার ওপর একটা প্রাসাদ দাঁড়িয়ে

আছে? একে ভিত্তি সমেত নির্মূল করে আরেকটা প্রাসাদের ভিত্তি গড়া ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়াতো। এছাড়াও এই ধ্বংসাবশেষ অপসারিত করার কাজটাও বেশ কঠিন হতো। আর তিনি এই সময়, অর্থ ও সামর্থ্যের খরচ করবেনই বা কেন যখন আমরা জানি যে, তাঁর নিজের হাতেই এমন একখণ্ড জমি ছিলো যা নাকি তিনি জয়সিংহকে বদল হিসেবে দিয়েছিলেন।

এই বদল কি প্রমাণ করে? এতে কি বোঝায় না যে, শাজাহান চাইছিলেন জয়সিংহ পৈতৃক প্রাসাদটি সম্রাটের স্ত্রীর সমাধি হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্য শাজাহানকে সমর্পণ করে নিজের জন্য আরেকটা প্রাসাদ বানিয়ে নিন? সঙ্গে একটি ধনী হিন্দু পরিবারকে দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দেওয়া ও তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছাও কাজ করছিলো। মুসলমানদের কেড়ে নেওয়ার ঐতিহ্য ও শাজাহানের যথেচ্ছাচারের কথা মনে রাখলে এই বিবরণ সুসমঞ্জস মনে হয়।

আমরা পাঠককে আরও লক্ষ্য করতে বলবো যে, মোল্লা হামিদ অত্যন্ত হাল্কা ভাবে মমতাজের মৃতদেহ বুরহানপুর থেকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটার উল্লেখ করেছেন, যখন ৪০২ পাতায় তিনি রাজরোষে পতিত কোন ব্যক্তির শাস্তি পাওয়ার ঘটনা লিখেছেন। মমতাজের মৃতদেহ নিয়ে এসে সোজা কবরস্থ করা হয় একটা বিরাট হিন্দু প্রাসাদের অভ্যন্তরে। এতে কি বোঝায়? লাহোরী বলছেন যে, তাঁর অনুমানে খরচ পড়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা। অবশ্যই এই খরচ হয়েছিলো একটা কবর খোঁড়া ও তা বোজানো, একটা সমাধিস্থল নির্মাণ, বাড়তি সিঁড়ি ও নীচুতলার ঘরগুলো বোজানো, কোরাণের বয়েৎ উৎকীর্ণ করা এবং একটি প্রকাণ্ড বড় ভারা বাঁধার কাজে। আমরা এই খরচকে মোটামুটি যুক্তি সঙ্গত বলতে রাজী আছি, কিছু অতি-শয়োক্তি ও মাঝখানের লোকদের অর্থ আত্মসাতের কথা মেনে নিয়ে।

মোল্লা আবদুল হামিদ কিছু নাম এবং নির্মাণের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বাদশানামা দ্বিতীয় খণ্ডের ৩২২ থেকে ৩৩০ পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলোতে। তিনি ভিত্তি থেকে আরম্ভ করেছেন, যাকে অনেকেই প্রাসাদের ভিত্তি বলে ভুল করে এসেছেন। কবরও শুরু করতে হয় ভিত্তি থেকে, কেননা একটা মাটির গর্তে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। তিনি ভিত্তিটা জমির সমতলে আনা হয়েছিলো বলতে বোঝাতে চাইছেন যে, ঐ কবরটা মাটি, ইঁটের টুকরো প্রভৃতি দিয়ে ভরাট করা হয়।

বাদশানামার লেখক বলছেন যে, সমাধিসৌধ নিয়ে কবরের খরচ পড়েছিলো ৫ লক্ষ টাকা। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। পুরো কাজটাতে অনুমিত খরচ হয়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা। ৫ লক্ষ টাকা তার থেকে বাদ দিলে আমরা পাই

যে, কোরাণের বয়েত উৎকীর্ণ করা এবং খুবই উঁচু দেওয়াল ও চূড়ার নাগাল পাওয়ার মতো তৈরী প্রকাণ্ড বড় ভারা বাঁধার কাজে খরচ হয়েছিলো ৩৫ লক্ষ টাকা। এই উল্টোপাল্টা খরচের বিবরণের পূর্ণ সমর্থন আমরা পাই Tavernier এর বর্ণনাতে যেখানে তিনি বলছেন যে, পুরো কাজটার মধ্যে সবচাইতে বেশী খরচ পড়েছিলো ভারা বাঁধার কাজে। এখানে ভারা বাঁধা ও কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করার খরচ কবর ও সমাধিস্থল নির্মাণের সাতগুণ। আগেই আমরা বলেছি যে, ভারা বাঁধার কাজে অনুপাতারিক্ত খরচই প্রমাণ করছে যে, আসল কাজটি ছিলো অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিতকর।

কিছু পাঠক হয়তো ভাববেন যে, কবর ও সমাধিস্থল নির্মাণের অঙ্ক হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা খুবই বেশী। কাজেই, এই অর্থ দিয়ে হয়তো অন্য কিছু নির্মাণ করা হয়েছিলো। এই সিদ্ধান্ত খুব যুক্তিপূর্ণ নয়। প্রথমত, মোল্লা হামিদ আমাদের বলছেন যে, প্রাসাদটি জোর করে নেওয়া হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত, আমরা আগেই বলেছি যে অতিশয়োক্তি বাদ দিয়েই মুসলিম ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্য বিচার করতে হবে। তাহলে যা বাকী থাকছে, তা দিয়ে প্রাসাদের মাটির নীচে এবং সমতলে দুটি তলার পরিপূর্ণ বিলোপ সাধন, সেখানে একটি কবর ও সমাধিস্তম্ভ বসিয়ে তাকে নানা মূল্যবান পাথর দিয়ে সাজানো এবং ঐ হিন্দু প্রাসাদের আদিম মোজাইকের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ স্থলের মোজাইক করানো যায়। মোটকথা এতে বেশ কিছু অর্থ খরচ হতে পারে।

শাজাহানের সভাসদ-লেখক তাঁর সরকারী ইতিহাস বাদশানামায় যা লিখে গেছেন, তা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

১। তাজমহল হচ্ছে হিন্দু প্রাসাদ।

২। এই পুরো সন্নিবেশটাই পাওয়া গিয়েছিলো খুবই অকিঞ্চিৎকর জিনিষের বদল হিসেবে, এর অধিকারীকে একখণ্ড উন্মুক্ত জমি দিয়ে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হয়, কেন না, এই জমির আয়তন ও অবস্থান সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করা নেই। খুব সম্ভব জয়সিংহকে তাঁর পৈতৃক প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়ে অত্যন্ত নগ্নভাবে এই প্রাসাদ দখল করা হয়েছিলো।

৩। এর চার পাশে একটা বর্ণাঢ্য সুবিস্তৃত বাগান ছিলো।

৪। এই হিন্দু প্রাসাদের একটা চূড়ো আছে।

৫। এই চূড়োর নীচে মমতাজের মৃতদেহ বুরহানপুর থেকে আগ্রায় নিয়ে আসার পরই সমাধিস্থ করা হয়।

৬। ঐ হিন্দু প্রাসাদকে মুসলিম কবরে রূপান্তরিত করার আনুমানিক খরচ পড়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা। সঠিক খরচ জানা নেই।

৭। উপরে উল্লেখিত অর্থের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিলো কবর ও সমাধিস্তম্ভ নির্মাণে, বাকী ৩৫ লক্ষ টাকা লেগেছিলো ভারা বাঁধা ও কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করানোতে।

৮। নক্সানির্মাতা বা স্থপতিরা অনুপস্থিত, কেননা শাজাহান তাজমহল নির্মাণ করেন নি।

৯। শাজাহানের রাজত্বকালে ঐ হিন্দু প্রাসাদ মানসিংহের প্রাসাদ বলে পরিচিত ছিলো, যদিও ঐ সময়কার অধিকারী ছিলেন তাঁর নাতি জয়সিংহ।

ওপরের বর্ণনা সত্যের খুবই কাছাকাছি, কেননা, শাজাহান যে তাজমহল নামের একটি প্রাচীন প্রাসাদ জোর করে দখল করেন মুসলিম কবর নির্মাণের উদ্দেশ্যে—এই সত্যের সঙ্গে তা খাপ খেয়ে যায়।

ফলে, তাজের স্থপতি সম্পর্কে অনুমান এবং ৪০ লক্ষ টাকার অঙ্কটা যে তাজমহলের পক্ষে খুবই কম এই সন্দেহ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক।

অষ্টম অধ্যায়

তাজমহল নির্মাণের কাল

এই অধ্যায় থেকে শুরু করে আমরা দেখাচ্ছি, কিভাবে তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান—ইতিকথার সবটারই ভিত্তি নিছক কল্পনা। শাজাহান নাকি তাজমহল বানিয়েছিলেন মমতাজের কবর হিসেবে। এই অযৌক্তিক ধারণা থেকে শুরু করে বিভিন্ন লেখক তাঁদের খেয়াল খুশীমতো ঘটনাগুলিকে সাজিয়েছেন। পরিণামে ইতিহাস ভারাক্রান্ত হয়েছে ভিত্তিহীন মিথ্যা গুজবের সমষ্টিতে, যা অতিক্রম করে তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক অনুসন্ধানের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে এ যাবৎ।

এই অধ্যায়ে আমরা এই প্রাসাদটি নির্মিত হওয়ার প্রকৃত সময়কাল সম্পর্কে অনুসন্ধান করবো। যদি শাজাহান সত্যিই তাজমহলের নির্মাতা হতেন তবে এ সম্পর্কে কল্পনার কোন প্রয়োজন হতো না। সরকারী বিবরণীতেই এই বৃহৎ স্মৃতিসৌধ শুরু ও শেষ করার সঠিক বর্ণনা থাকতো। এই ধরণের কোন বিবরণীর অভাব অসঙ্গতির পরিমাণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে কিছু নাম ও দলিলের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন কোন লেখায়। কিন্তু তা জালিয়াতি ছাড়া কিছুই নয়, কেন না, কেউই তা বিশ্বাস করে না।

তাজমহলের উৎপত্তি যদি কবর হিসাবেই হয়ে থাকে তবে এর কাজ শুরু হওয়ার তারিখ মমতাজের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত হওয়া উচিত। কিন্তু সূচনাতেই বিঘ্ন, এই মহিলার মৃত্যুর সঠিক তারিখ আজও অজানা।

এই প্রসঙ্গে কানওয়াল লাল বলছেন, 'মমতাজ ১৬৩০ সালে মারা যান—তাঁর মৃত্যুর তারিখ ৭ই জুন। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা ভুল করে ঐ ঘটনার সময়টা বলেন ১৬৩১ সাল! তাছাডা মৃত্যুর তারিখ নিয়েও অনৈক্য আছে, কেউ বলেন ৭ই জুন, কেউবা বলেন ১৭ই জুন।'

তাজমহল সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসে মমতাজকে শাজাহানের যেরূপ ভালোবাসার পাত্রী বলে বর্ণনা করা হয় তা যদি সত্যি হতো, তাহলে কি তাঁর মৃত্যুর সময় নিয়ে এতটা দুঃখদায়ক অনৈক্য দেখা যেতো? আমরা প্রমাণ করতে যাচ্ছি যে, মমতাজের মৃত্যু শাজাহানের মনে সামান্যই ছাপ ফেলেছিলো। সম্রাটের কৃপাদৃষ্টিই যাদের একমাত্র কাম্য ছিলো, সম্রাটের হারেমের সেই ৫০০০

অন্তঃপুরিকার একজন মাত্র ছিলেন মমতাজ। এই কারণেই মমতাজের মৃত্যুকে স্মরণীয় করার জন্য কোন বিশেষ সৌধ নির্মাণের প্রশ্নই উঠেনা।

মমতাজের মৃত্যুর সঠিক সময় অজানা থাকায় জানা যায়না, ঠিক কোন সময় থেকে ছয়মাস পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ বুরহানপুরে কবরস্থ ছিলো। এই ছয়মাস ব্যাপারটাও আমাদের মতে হয়তো ততটা সঠিক নয়।

আরও বলা হচ্ছে যে, আগ্রায় মমতাজের মৃতদেহ নিয়ে আসার পরের বছর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এতে তাঁকে কবরস্থ করার সঠিক তারিখটা অস্পষ্ট হয়ে আসে।

এই প্রাথমিক অস্পষ্টতা সত্ত্বেও তাজমহলের নির্মাণকাল সম্পর্কে কোন অবিসংবাদী মত আমরা স্বীকার করে নিতাম, যদি ঐতিহাসিকদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য থাকতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, সেরূপ কোন সর্বজনস্বীকৃত মতের সাক্ষাৎ মেলে না। দেখা যাক এ সম্বন্ধে কি কি মত আছে।

১। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ বলছেন, নির্মাণ কায আরম্ভ হয় ১৬৩১ সালে আর শেষ হয় ১৬৪৩ সালে। তাহলে মোট সময়টা দাঁড়াচ্ছে ১২ বছরেরও কম।

২। Encyclopaedia Britannica বলছেন 'নির্মাণ শুরু হয় ১৬৩২ সালে। ······২০,০০০ মজুরকে রোজ লাগানো হয়েছিলো ১৬৪৩ সাল নাগাদ স্মৃতিসৌধটির নির্মাণ শেষ করতে, যদিও পুরো প্রাসাদ চত্বর নির্মাণে সময় লেগে ছিলো ২২ বছর।' এবার আমরা দুটো সময় পাচ্ছি। একটা ১০ থেকে ১১ বছর আরেকটা ২২ বছরের। ২২ বছরের এই দ্বিতীয় সময়কাল সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আস্তাবল এবং রক্ষী ও অতিথিদের থাকবার জায়গা সম্পন্ন প্রাসাদ-সমুচ্চয় কবরকে ঘিরে গড়ে তোলার কি প্রয়োজন ছিলো।

৩। Tavernierএর বিবরণী প্রচলিত মুসলিম বিবরণীর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এই দুটো বিপরীতকে জোড়াতালি দিয়ে Encyclopaedia র ওপরের বর্ণনা। এতে Tavernier থেকে ২০,০০০ লোক ও ২২ বছর ধার করা হয়েছে আবার মুসলিম বিবরণীর ১০ থেকে ১১ বছর লাগাটাও একটু ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে।

Tavernier বলছেন, তিনি 'এই বিরাট কাজের আরম্ভ ও শেষ নিজ চোখে দেখেছেন যাতে ২০,০০০ লোককে ২২ বছর অবিশ্রান্ত কাজ করতে হয়েছিলো·· এতে খরচও পড়েছিলো প্রচণ্ড। ভারা বাঁধার কাজেই অন্যান্য কাজের চেয়ে বেশী খরচ পড়েছিলো।'

যখন মনে রাখি Tavernier আগ্রায় এসেছিলেন ১৬৪১ সালে, তাঁর আসার সাথে সাথে কাজ শুরু হলেও এর সময়কাল দাঁড়ায় ১৬৪১ থেকে ১৬৬৩ পর্যন্ত।

শাজাহানের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে Tavernier বর্ণিত সময় বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ১৬৫৮ সালে শাজাহান গদীচ্যুত ও বন্দী হন পুত্র আওরঙ্গজেবের হাতে। তাঁর কর্তৃত্ব হারাবার পরেও কিভাবে তাহলে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ আরো পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৬৬৩ সাল পর্যন্ত চলতে পারে? তা যদি হয়ে থাকে তবে আমরা অন্যান্য মুসলিম বিবরণী নিয়ে কি করবো, যাতে বলা আছে যে, কাজটা শেষ হয়েছে ১৬৪৩ সালে। কিন্তু এতেও কাজটা আরম্ভ হবার ব্যাপারটার ফয়সালা হয় না। যদি Tavernier এর কথামতো স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ ১৬৪১ সালের আগে আরম্ভ না হয়ে থাকে, তবে কি প্রয়োজন ছিলো তাড়াহুড়ো করে মমতাজের মৃতদেহ ১৬৩০-৩১ সালে বুরহানপুর থেকে আগ্রায় নিয়ে আসার? তাছাড়া মৃতদেহটি ১৬৪১ সাল অবধি এই কয় বছর কোথায় রাখা হয়েছিলো?

৪। The Columbia Lippincott Gazetteer বলছেন, 'সৌন্দর্য-মণ্ডিত তাজমহল নির্মিত হয় ১৬৩০-১৬৪৮ সালে।'...আমাদের আগের যুক্তিগুলো আমরা এখানেও প্রয়োগ করতে পারি। যেহেতু নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না যে, মমতাজ ১৬৩০ সালেই মৃত্যু বরণ করেন, কি করে এই সৌধের নক্সা দেখা, সঠিক নক্সা নির্বাচন করা, নির্মাণের জিনিষপত্র যোগাড় করা প্রভৃতি সমুদয় কাজ মাত্র ১ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়?

উপরের উল্লেখিত বিবরণীগুলি থেকে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন, কি ধরণের অসঙ্গতি ও পরস্পরবিরোধ জড়িয়ে আছে তাজমহলের সঠিক নির্মাণকাল সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যে।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, প্রকৃত সত্যি সমস্ত আপাতঃঅসঙ্গতি সমাধান করে একটা যুক্তগ্রাহ্য বিবরণী দাঁড় করাতে পারবে। আমরা বলতে চাই যে, মমতাজকে একটা হিন্দু প্রাসাদে সমাধিস্থ করার পর তাঁর কবরে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা, একে কারুকার্য মণ্ডিত করা এবং সমগ্র প্রাসাদে কোরাণের লিপি উৎকীর্ণ করার কাজটাই ধীরগতিতে চলেছে ১০, ১২, ১৩, ১৭ বা ২২ বছর ধরে। যখনই কোন প্রাসাদে কোন পরিবর্তন, নতুন করে সাজানো বা মেরামতের (তাজ প্রাসাদের ক্ষেত্রে এর কোনটাই আলগা ধরণের ছাড়া আর কিছু ছিলো না) কাজ হাতে নেওয়া হয়, তা চলে বছরের পর বছর নতুন অধিকারীর মর্জিমাফিক। এ দিক থেকে দেখতে গেলে ওপরে উল্লেখিত বিবরণীর সবকয়টিতেই কিছু না কিছু সত্যি আছে।

নবম অধ্যায়

তাজমহল নির্মাণের খরচ

তাজমহল নির্মাণের সময় নিয়ে যে রকম, নির্মাণের খরচ নিয়েও সেরকম কতকগুলো অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত আছে। কমপক্ষে ৪০ লক্ষ ও উর্দ্ধপক্ষে ৯ কোটি টাকা নাকি খরচ হয়েছে এই কাজে।

১। সবচাইতে কম খরচের উল্লেখ পাওয়া যায় সম্রাট শাজাহানের সভাসদ—লেখক মোল্লা আবদুল হামিদের লেখায়। তিনি গোড়ার দিকে অনুমিত একটা খরচের উল্লেখ করেছেন, সত্যিকারের কত খরচ হয়েছিলো বলছেন না। তাঁর মতে খরচ পড়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা।

২। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষে উল্লেখিত অঙ্ক এর চেয়ে ১০ লক্ষ টাকা বেশী। তাঁরা বলছেন, খরচ পড়েছিলো ৫০ লক্ষ টাকা।

৩। জনাব মোহাম্মদ দীন বলছেন, 'বিশ্বাস করা হয় যে, এটা নির্মাণ করতে দেড় কোটি টাকারও অধিক অর্থ লেগেছিলো।' পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে অনুমিত অঙ্ক কি রকম লাফে লাফে বেড়ে চলেছে। সামান্য ৪০ লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আমরা উপস্থিত হই দেড় কোটি টাকায়। কিন্তু জনাব দীন নিজেও নিশ্চিত নন। তাই তিনি এটুকু বলেই সন্তুষ্ট থেকেছেন যে, দেড় কোটির অধিক খরচ পড়েছিলো।

৪। Keeneএর মতে তাজের নির্মাণ খরচ সত্যিকারের কত পড়েছিলো তা কোথাও লেখা নেই এবং মোটামুটি একটা অনুমান করার পক্ষে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এত অল্প এবং জটিল যে ৫ লক্ষ পাউণ্ড থেকে শুরু করে ১০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত যে কোন অঙ্কই খরচ হয়ে থাকতে পারে বলে ধরা হয়।

৫। Sleeman লিখে গেছেন 'সমাধিসৌধ এবং পুরো প্রাসাদ সন্নিবেশের খরচ পড়েছিলো ৩, ১৭, ৪৮, ০২৬ টাকা।

৬। আর একটি ইতিহাসের বই 'দিওয়ান-ই-আফ্রিদি' বলছেন যে, অনুমিত খরচ পড়েছিলো ৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।

৭। অন্যপক্ষে ১৮৫৩ সালে আগ্রা পরিদর্শনকারী শ্রীবেয়ার্ড টেইলর নামে একজন আমেরিকান 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে' লিখেছেন, তাজের তত্ত্বাবধায়ক একজন শেখ আমাকে বলেছেন যে, সমগ্র প্রাসাদ সন্নিবেশ ধরে তাজের

খরচ পড়েছিলো ৭ কোটি টাকা। এটা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারেনা। আমি বিশ্বাস করি যে, ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ডকে আসল খরচের অনুমিত হিসাব ধরলে তা অতিশয়োক্তি হবে না।

৮। শ্রীকানওয়ার লাল বলছেন 'তাজের নির্মাণ খরচ সম্বন্ধে নানা ধরণের অনুমান ও বর্ণনা আছে। একমতে খরচ পড়েছিলো ৫০ লক্ষ টাকা। মনে হয়, আবদুল হামিদের বাদশানামায় উল্লেখিত সংখ্যাকে অবলম্বন করেই এই মত গড়ে উঠেছে। এই ঐতিহাসিকের মতে মকরামত খান এবং মীর আবদুল করিমের তত্ত্বাবধানে তাজের নির্মাণ শেষ হয়েছিলো ২২ বছরে এবং মোট খরচ পড়েছিলো ৫০ লক্ষ টাকা'। অনেক পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন যে, এই সংখ্যাটা হাস্যকরভাবে তুচ্ছ, যদিও সেই আমলে শ্রমিকের মজুরি ও জিনিষপত্রের দাম কম ছিলো। আবার অন্যরাও আছেন যাঁরা সাড়ে চার কোটি টাকা মোট খরচ পড়েছিলো স্বীকার করেন। তাজ সম্পর্কে তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ বইতে মইনুদ্দীন আহমদ একটা পাণ্ডুলিপি উল্লেখ করেছেন, যাতে রুদ্রদাস খাজাঞ্চি নামে এক কোষাধ্যক্ষ তাজ নির্মাণের খরচের একটা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। খণ্ডে খণ্ডে শেষ কপর্দক পর্যন্ত এই হিসেব দেওয়া আছে। এতে মোট খরচের পরিমাণ দেওয়া আছে ৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮২৬ টাকা ৭ আনা ৬ পয়সা।

উপরের পরিচ্ছেদে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, মোল্লা আবদুল হামিদ তাজের খরচ উল্লেখ করেছেন ৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, মোল্লা হামিদের মতে ঐ অঙ্কটা ৪০ লক্ষ টাকা। যাই হোক, এটা তথ্য-বিভ্রান্তির সংশোধন মাত্র।

তাজমহল নির্মাণের শেষ কপর্দক পর্যন্ত হিসেব করে লেখা রুদ্রদাস খাজাঞ্চির বর্ণনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পরলোকগত Sir H. M. Elliot এর জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য। তিনি বলছেন যে, চাটুকার লেখকেরা এই সমস্ত বিশদ বিবরণ তাঁদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বের করে জুড়ে দেন, যাতে তাঁদের কল্পিত বিবরণ সত্যি বলে মনে হয়।

তাজমহলের নির্মাণ সময়, নির্মাণ ব্যয় বা অন্য যে কোন দিক নিয়ে যা আলোচনা হয়েছে তাতে বুদ্ধিমান পাঠকের বিশ্বাস করতে বেগ পেতে হবে না যে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শাজাহানের তাজমহল নির্মাণের কাহিনী সবটাই কষ্টকল্পিত। আমরা দেখেছি, কোন ভিত্তি না থাকলেও অসংখ্য লেখক চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের খরচ সম্পর্কে নানা অনুমান রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা ভ্রান্ত অনুমান নিয়ে অগ্রসর হওয়াতে তাঁদের মতামত ধোপে না টেঁকায় দুঃখভাগী হয়েছেন। শাজাহান সত্যিই

তাজমহল নির্মাণ করে থাকলে এর ব্যয় নিশ্চয়ই কোথায়ও লিপিবদ্ধ পাওয়া যেতো, অনুমানের কোন জায়গা বা প্রয়োজন থাকতো না।

পুরো ব্যাপারটার আসল খরচ ছাড়াও আরেকটা আকর্ষণীয় পার্শ্বদিক আছে। তাজমহল ভ্রমণকারী ও শাজাহান-ইতিকথার পাঠকেরা তাঁদের সরলতায় এটা ধরেই নেন যে, শাজাহান নিজে তাঁর মহিষীর স্মৃতিসৌধের খরচ বহন করেছিলেন। কিন্তু শাজাহান ছিলেন কঠিন হৃদয়, কৃপণ, কামাসক্ত এবং যথেচ্ছচারী সম্রাট। প্রাসাদের পাঁচ হাজার মহিষীর একজনের মৃত্যুতে তাঁর বেশী বিচলিত হবার কথা নয়। আমাদের এই বক্তব্যের সুস্পষ্ট সমর্থন মেলে 'আগ্রার তাজমহলের গাইড' বইতে। এতে বলা আছে 'তাজমহলের খরচ সম্পর্কে স্থানীয় হিসেব হচ্ছে, ৯৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪২৬ টাকা দিয়েছেন রাজা ও নবাবের, আর সম্রাটের ব্যক্তিগত কোষ থেকে এসেছে ৮৬ লক্ষ ৯ হাজার ৭৬০ টাকা।'

এই উক্তিতে যে একবিন্দু সত্যি আছে তা হচ্ছে, মৃতা মহিষীর জন্য একটি স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করার বদলে শাজাহান এই ঘটনাকে ব্যবহার করেছিলেন একজন হিন্দু সামন্তরাজকে তাঁর প্রাসাদ থেকে উৎখাত করার কাজে। আর এই আঘাতের সঙ্গে অপমান হিসেবে বাধ্য করেছিলেন রাজা ও নবাবদের মূল খরচটা বহন করতে, যাতে এই প্রাক্তন প্রাসাদটিকে কবরের রূপ দেওয়া যায়।

উপরের বর্ণনা দুটি খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, দুটোই বানানো। শাজাহান এবং অন্যান্য রাজাদের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ একটা থোক টাকায় উল্লেখ করার বদলে আমরা সম্মুখীন হই দুটো উদ্ভট অঙ্কের, যা মনে হয় বর্তমানের কোন বাণিজ্যিক হিসাবপঞ্জীর পাতা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, যাতে সমস্ত পক্ষেরই অবদান কড়ায় গণ্ডায় লেখা থাকে।

আরেকটা লক্ষণীয় তথ্য হচ্ছে, শাজাহানের অবদানের অঙ্কটাও বানানো হতে পারে। শাজাহান অত্যন্ত গর্বিত, দাম্ভিক উদ্ধত, কৃপণ এবং কঠোর-হৃদয় ছিলেন। তিনি অধীনস্থ রাজাদের কাছ থেকে পুরো খরচ তুলতে পারবেন জেনে একটা কবরের জন্য নিজের এক কপর্দকও ব্যয় করবেন কেন? অন্য রাজারা যা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাও মনে হয় বানানো কেননা, শাজাহানের নিজের লেখক বলছেন যে, মোট খরচ পড়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা। অথচ বলা হচ্ছে যে, অন্যরা দিয়েছেন প্রায় ১ কোটি টাকা। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, যদি জবর দখল করা প্রাসাদে মমতাজের কবর নির্মাণে ৪০ লক্ষ টাকা পড়ে থাকে, তাহলে তা জোর করে আদায় করা হয়েছে শাজাহানের অধীনস্থ সামন্তরাজা ও প্রজাদের কাছ থেকে। মুঘল শাসকেরা মনে করতেন যে, প্রজাদের অর্জিত অর্থের উপর

যখন তখন ভাগ বসানোর একটা স্বর্গীয় অনুমোদন তাঁদের আছে।

নিজের খরচে তাজমহল নির্মাণ করা দূরে থাক, শাজাহান এত কৃপণ ও নিষ্ঠুর ছিলেন যে, কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করার হাল্কা কাজটা এবং প্রাক্তন হিন্দু প্রাসাদের অতিরিক্ত ঘরগুলো চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার কাজটা তিনি বিনা পয়সায় করিয়ে নিয়েছিলেন শ্রমিকদের যথেচ্ছ উৎপীড়ন করে।

ঐ গাইড বইয়ের ১৪ পাতায় লিপিবদ্ধ আছে, শ্রমের সবটাই আদায় করা হয়েছিল ভয় দেখিয়ে। খুব কম টাকাই নগদে দেওয়া হয়েছিলো শ্রমিককে, যারা নাকি ১৭ বৎসর ধরে কাজ করেছিলো। শুধু তাই নয়, যে সামান্য শস্য দেওয়া হতো, তাও লোভী তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীদের দৌলতে অনেক কম পরিমাণে হাতে পৌঁছুতো'।

এই বর্ণনায় নিষ্ঠুরতার অংশ ছাড়ায় পাঠক লক্ষ্য করবেন সামান্য অসঙ্গতি। Tavernier যদিও ২০০০০ শ্রমিকের কথা বলেছেন, তাঁর মতে কাজ চলেছিলো ২২ বছর ধরে। আর ওপরে লেখা আছে মাত্র ১৭ বছরের কথা। তাজমহলের সম্পর্কে যে সমস্ত চিরাচরিত বিবরণ প্রচলিত আছে তাদের বিভ্রান্তি ও ধোঁকা-বাজির নমুনা হিসাবে এটা যথেষ্ট প্রমাণ। কেননা সবগুলোই ভিত্তিহীন।

Keene তাঁর বইয়ের ১৫৪ পৃষ্ঠায় লিখছেন, শ্রমিকদের জোর করে খাটানো হতো এবং খুবই সামান্য নগদ অর্থ পেতো তারা। এর ওপরেও ভাগ বসাতো লোভী কর্মচারীর দল। তাদের মৃত্যুহার ও অন্যান্য দুর্দশা এতই গভীর ছিলো যে, তারা নিশ্চয়ই মমতাজের স্মৃতিকে অভিশাপ দিতো আর একান্ত হতাশায় গাইতো :—

ঈশ্বর দয়া করুন আমাদের দুর্দশায়
কেননা, আমরাও মরছি সম্রাজ্ঞীর সাথে।'

মৃত্যুহার বেশী থাকায় কিছু দিন অন্তর সম্পূর্ণ নতুন একদল শ্রমিক খুঁজে আনতে হতো, উপবাসের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে শ্রম করার জন্য। কাজেই বিস্ময়ের নয় যে, খোদাই কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তালিকাভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২০ হাজারে দাঁড়াবে। এতেও বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এই সামান্য কাজটা নানা মতানুসারে ১০ থেকে ২২ বছর পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শেষ হয়। এগুলো স্বাভাবিক, কেননা, বছরের প্রায় প্রতি দিনই সৈন্য পাঠাতে হতো উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শ্রমিক খুঁজে বের করতে ও উন্মুক্ত তরবারি এবং চাবুকের আস্ফালন দেখিয়ে তাদেরকে জোর করে ধরে এতে সামান্য মজুরিতে কাজে লাগাতে। আশ্চর্যের নয় যে, তারা চেঁচিয়ে কাঁদতো, বিদ্রোহ করতো এবং মারা পড়তো অথবা পালিয়ে যেতো। দরিদ্র মজুরদের দেবার অর্থ বা ইচ্ছা কোনটাই যাঁর ছিলোনা, এমন শাসক কি করে আশা করতে

পারেন উল্লেখযোগ্য কিছু নির্মাণ করার? প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ তাজমহলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

হিন্দু প্রাসাদকে মুসলিম কবরে রূপান্তরিত করার জন্য যারা পরিশ্রম করে চলেছিলো, সেই শ্রমিকদের প্রাণের সামান্যই মূল্য দিতেন এই অত্যাচারী রাজা। বাড়তি বেতন চাওয়ার অপরাধে তিনি শ্রমিদের হাত কেটে দিয়ে শাস্তি দিতেন। যাতে তারা বংশানুক্রমে অর্জিত দক্ষতার অনুশীলনে অন্যত্র জীবিকা অর্জন করতে না পারে, স্পষ্টতই এই উদ্দেশ্যে হাত কেটে দেওয়া হতো। এই দক্ষতা তারা কৃপণ, কঠোর হৃদয় নৃপতির কাজের জন্য বিনা অর্থে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক ছিলো না। এই সমস্ত দক্ষ কারিগরদের অধিকাংশই ছিলো হিন্দু। কাজেই তাদের হত্যা করা অথবা অশক্ত করে দেওয়াতে তৎকালীন মুসলিম প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শাজাহান ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত কাজই করেছেন।

মৌলবী মইনুদ্দীনের বইয়ের ১৭ পাতায় এই নিষ্ঠুরতার কিছু উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন, 'ইউরোপীয় লেখকেরা তাজমলের নির্মাণ বিষয়ে কিছু নিন্দাকর মন্তব্য করেছেন। বলা হয়েছে যে, শ্রমিকেরা খুবই দুরবস্থার পড়েছিলো। তাদেরকে অনাহার ও খারাপ ব্যবহার সহ্য করতে হতো।'

পশ্চিমী পণ্ডিতেরা সহজেই শাজাহান-মমতাজের প্রেমকাহিনীতে মোহিত হয়ে যান—এর সঙ্গে তাঁদের দেশের রোমিও-জুলিয়েট উপাখ্যানের কিছু মিল আছে। তাঁরা কখনোই শাজাহানের নিষ্ঠুরতার ব্যাপারে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এই মধুর প্রেমের কল্পকথাকে খান খান করে দেবেন না। তাঁরা অবশ্য ভুল করে বিশ্বাস করে এসেছেন যে, পাশবিক কামনা ও অগভীর দুঃখ তাজমহলের মতো স্থাপত্য ও আর্থিক ক্ষমতার এক আশ্চর্য নিদর্শন সৃষ্টি করতে পারে। তা সত্ত্বেও তাঁরা বাধ্য হয়েছেন নিষ্ঠুরতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে। ফলে আমরা এটাই কি বুঝবোনা যে, ইউরোপীয়ান পণ্ডিতেরা এই নিষ্ঠুরতার অভিযোগ রেখেছেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংবাদের উপর ভিত্তি করে?

সামান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এমনকি মুসলিম সূত্রেও, হাত কেটে নেওয়ার সমর্থন মেলে। তাঁরা শ্রমিকদের পঙ্গু করে দেওয়ার শাজাহানের এই কীর্তিকে একটা শান্ত, সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝান। তাঁরা বলেন শাজাহান দক্ষ কারিগরদের হাত কেটে দিতেন এই মহান উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন অপর কারুর হয়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সৌধ তৈরী করতে না পারে। কেউই এই নির্বোধ ইতিকথা বিশ্লেষণ করে দেখেন নি এ পর্যন্ত। প্রথমত, তাজমহলের কল্পনা ও নির্মাণ করানোর মতো পরিশীলিত সূক্ষ্ম রুচির রাজার কি বিশ্বাসঘাতকের মতো ঐ কাজের রূপকারদের হাত কেটে দেওয়া সাজে? দ্বিতীয়ত,

শোকে অভিভূত কোন শাসক কি ভালোবাসার পাত্রীর সমাধিস্থল নির্মাণ—কারীদের পঙ্গু করে দেবার মতো নিষ্ঠুর হবেন? তৃতীয়ত, তাজমহল নির্মাণ করা কি এতই সস্তা ঠাট্টা যে, যে কেউই স্ত্রী মারা গেলে ঐ সমস্ত শ্রমিকদের যোগাড় করে তাদের দিয়ে তাজমহলের মতো সৌধ বানাতে পারেন? কেমন হবেন সেই ব্যক্তি, যাঁর অর্থ থাকবে, স্ত্রীর প্রতি ঐ রকম ভালোবাসা থাকবে আর সামর্থ্য থাকবে স্ত্রীর জন্য আরেকটি তাজমহল নির্মাণের? স্পষ্টতই, পঙ্গু করে দেওয়ার পৈশাচিক কাজকে কোমলভাবে দেখানোর এই চেষ্টা একটা সুপরিকল্পিত মিথ্যা, যা সরল দর্শক এবং নির্বোধ পণ্ডিতদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। একটা হিন্দু প্রাসাদকে বিনা খরচে রূপান্তরিত করার শাজাহানের কাজের নিষ্ঠুরতাকে কোমলতার আবরণে চাপা দেওয়ার এই চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আসলে প্রতিদিন বিনা মজুরীতে শ্রমদানে অস্বীকৃত হওয়া বিদ্রোহী মজুরদের বশীভূত করতে এই নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিলো।

এই সঙ্গে সামান্য দৈনিক বরাদ্দের মাধ্যমে কাজটা করিয়ে নেওয়ার শাজাহানের চেষ্টা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, পরিকল্পিত কাজটা ছিলো একটা প্রাসাদে কিছু খোদাই এবং অন্য সামান্য পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মজুরদের সামান্য কিছু দৈনিক বরাদ্দ ধরিয়ে সন্তুষ্ট রেখে কেউই একটা মহিমময় প্রাসাদ নির্মাণের কল্পনা করতে পারেন না।

আরেকটা প্রাসঙ্গিক উপকথা হচ্ছে যে, শাজাহান নদীর অপর পারে নিজের জন্য একটা কালো মর্মরের তাজ নির্মাণ করতে চাইছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে সুচতুর প্রদর্শক ও লোভী ঐতিহাসিকেরা হতভাগ্য দর্শককে দেখান নদীর অপর পারে কিছু ধ্বংসাবশেষ। এগুলো হচ্ছে নদীর পারে তাজমহলের অংশ হিন্দু শিবিরের ধ্বংসাবশেষ, যখন তাজমহল হিন্দু রাজার প্রাসাদ ছিলো। এগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাজমহল দখলের জন্য নদী পার হয়ে আসা মুসলিম আক্রমণকারীদের হাতে। এখন এই হিন্দু ধ্বংসাবশেষকেও 'মুসলিম কীর্তি' দাবী করা হয়। যেহেতু শাজাহান শ্বেত মর্মরের তাজমহল নির্মাণ করেন নি, কৃষ্ণ মর্মরের তাজমহল নির্মাণের কথা কল্পনা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এর সমর্থনে আমরা Keene এর বক্তব্য রাখছি। তিনি ১৬৩ পৃষ্ঠায় বলছেন, 'শাজাহানের শবাধার সৌষ্ঠবহীন ভাবে এখানে রাখা হয়েছে বলে মনে করা হয়, কেননা তিনি নিজের জন্য যে সৌধ করে যাবেন ভেবেছিলেন তা হয়নি। অবশ্য এই ব্যাপারে কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই।' তাই দেখা যায়, তাজমহলের ইতিকথার যে কোন অংশই আমরা ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণের জন্য বেছে নিই না কেন, সবই হতাশাব্যঞ্জক মিথ্যার ধূলিতে মিলিয়ে যায়।

দশম অধ্যায়

তাজমহলের নক্সা কার? স্থপতি কে?

যেহেতু তাজমহল একটি সুপ্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ, শাজাহানের সমসাময়িক কাউকে এর নক্সাকারক হিসেবে খুঁজে বের করতে গেলে হতাশ হতে হবে। খুবই যত্নসহকারে অনুসন্ধান করে এবং উদ্দাম অনুমান চালিয়েও আমরা পাচ্ছি কিছু নাম, যা বিভ্রান্তিকর এবং যার কোনটাই তাজমহলের দক্ষ নক্সাকারীর নাম হিসেবে সর্বজনের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয় নি।

আমরা আলোচনা করে দেখাচ্ছি, কত ধরনের চেষ্টা হয়েছে তাজমহলের সত্যিকারের নক্সাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য।

লক্ষ্য করতে হবে যে সম্রাট শাজাহানের সভাসদ-ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল হামিদ কোন স্থপতির উল্লেখ করেন নি। এটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা, একেবারে গোড়াতেই তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মমতাজকে কবর দেওয়া হয়েছিলো হিন্দু প্রাসাদে। একটা তৈরী করা প্রাসাদ কবরের জন্য ব্যবহার করতে গেলে কোন নতুন স্থপতির প্রয়োজন হয় না। কাজেই, তাঁর নীরবতাই স্বাভাবিক। নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে এই সরকারী ঐতিহাসিকের মত অগ্রাহ্য করে নিজেদের মত চাপানোর কোন অধিকারই পরবর্তী লেখকদের নেই।

Keene এই অনুল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলছেন 'যদিও মোল্লা হামিদ শাজাহানের নির্দেশে বাদশানামায় তাজের ইতিহাস লিখেছেন, খুবই অর্থবহ যে, এর স্থপতি সম্বন্ধে তিনি নীরব।'

২। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ বলছেন শুধু মকামৎখান ও আবদুল করিম এই দুইজন তত্ত্বাবধায়কের নাম এবং কিছু মজদুরের কথা। প্রাসাদকে কবরে রূপান্তরিত করার জন্য দুজন তত্ত্বাবধায়কই যথেষ্ট ছিলো।

৩। Encyclopaedia Britannica অস্পষ্টতা অবলম্বন করেছেন এই বলে, 'স্থপতিদের এক সমিতি গোটা ব্যাপারটার পরিকল্পনা করেছিলেন।' সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিতেরা যুগে যুগে নিজেদেরকে তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান-ইতিকথায় এতটা সম্মোহিত হতে দিয়ে এর নির্মাণের সমস্ত দিক নিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থেকেছেন কেন, তা আমরা বুঝতে অক্ষম।

৪। আমরা আগেই দেখেছি, Tavernierকে কিভাবে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো এই বলে যে, নক্সাকার যাতে এই রকম আশ্চর্য প্রাসাদের আরেকটা নক্সা বানিয়ে অপরকে গৌরবান্বিত করতে না পারেন এই জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো। তাছাড়া হত্যা করা হলেও যদি সত্যিই কেউ নক্সাকারক থাকতেন, তাঁর নাম জানা না থাকার কোন কারণ ছিলো না। বস্তুত, মৃত্যুই তাঁর নামকে অমরত্ব এনে দিতো।

৫। প্রফেসর বি. পি. সাকসেনা বলছেন, 'যদিও তাজমহলের সৌন্দর্য সম্বন্ধে লেখকেরা প্রায় সর্বাংশে একমত, এর উৎপত্তি ও নির্মাণশৈলী সম্পর্কে তাঁদের মতপার্থক্য খুবই বেশী। Sleeman তাঁর 'ambles and Recollections' এ এই উদ্ভট প্রস্তাব রেখেছেন যে, ফরাসী বাস্তুকার অষ্টিন দ্য বুরদো এই নক্সা বানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, হাস্যকর কল্পনার দৌড়ে তিনি এঁকে ওস্তাদ ঈশার সঙ্গে এক করে দেখেছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন নেই। Vincent Smith মানরিকের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে নক্সার প্রস্তুতির কৃতিত্ব দেন জারোনিমো ভেরিনিকো কে। কিন্তু Sir John Maashall ও E. B. Havell এই মত সমর্থন করেন না।

৬। Keeee বলছেন, 'তাজমহলের আদিম বা পুরুষানুক্রমে তত্ত্বাবধায়কদের হেফাজতে রক্ষিত ফার্সী পাণ্ডুলিপি 'তারিখ ই তাজমহল' বইতে তাজমহলের নির্মাতা মুখ্য বিশেষজ্ঞদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এঁদের নেতৃত্বে আছেন মোহম্মদ ঈশা আফান্দি। কিন্তু এই প্রমাণের সত্যতা বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পাঠকেরা লক্ষ্য করে দেখবেন যে, তাজমহলের দক্ষ নক্সাকার হিসেবে বারবার যে ঈশা আফান্দির নাম শোনানো হয়, তাঁর উৎপত্তি একটা জাল দলিলে। স্বভাবতই, কেউ এটা বিশ্বাস করতে পারেন না।

যেহেতু ঈশার অস্তিত্ব কল্পনাতেই, তাঁর জন্মভূমি হিসেবে দেখানো হয় আগ্রা শিরাজ, ইউরোপীয় তুরস্ক প্রভৃতি স্থান—একথা বলছেন কানওয়ার লাল।

৭। মোহম্মদ খানের প্রবন্ধে তাজমহল নির্মাণের কৃতিত্বের দাবীদার আরেকজনের নাম পাওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন আহমদ মহান্দিশ, সঙ্গে তাঁর তিনি পুত্রও আছেন।

গুজবের অরণ্যে তাজমহলের সঠিক স্থপতিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা ৩০০ বছর ধরে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই করা হয়েছে, যদিও এতে কেউ লক্ষ্যে পৌছুতে পারেন নি। এই অবিরত অনুসন্ধানে ক্লান্ত হয়ে ঐতিহাসিকেরা ব্যাপারটাতে কিছু নামের উল্লেখ করে তার মধ্য থেকে সঠিক লোকটিকে খুঁজে বের করার আহ্বান রেখেই শেষ করেছেন। কাজেই খরচের পরিমাণ, নির্মাণকালের ব্যাপ্তি অথবা স্থপতির নাম, কোন ব্যাপারেই সর্ববাদীসম্মত কোন মত পাওয়া যায় না।

অপর পক্ষে, নানা ধরণের বৈচিত্র্যময় ইঙ্গিত তাঁরা রেখেছেন। এটা সম্ভব হয় তখনই, যখন অনুসন্ধানের গোড়াতেই থাকে গলদ।

E B. Havell বলছেন, 'তাজমহল সম্পর্কে কিছু ভারতীয় তথ্যে মুখ্য মোজাইক কারিগর হিসেবে মনু বেগের নাম দেখা যায়। কিন্তু ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপিতে মুখ্য কারিগরের তালিকাতে কনৌজের পাঁচজন হিন্দু কারিগরের নাম দেওয়া আছে। বর্তমানেও আগ্রার শ্রেষ্ঠ মোজাইক কারিগরেরা সকলেই হিন্দু।'

ওপরের পরিচ্ছেদটি নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাজমহলের নক্সাকারক ও কারিগরদের নিয়ে কি বিভ্রান্তিই না চলে আসছে, তা স্পষ্টই এতে বোঝা যাচ্ছে। এই বিভ্রান্তির উদ্ভব এই জন্য যে, শত শত বছর ধরে একটা কল্পনাকে সত্যের রূপ দেবার জন্য নানাভাবে এর ফাঁকগুলো ভরাট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চেষ্টারই ফলশ্রুতি হিসেবে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা চেয়েছেন ফরাসী ও ইতালীয়দের তাজমহলের নির্মাণ-সৌকর্যের কৃতিত্ব অর্পণ করতে। অন্য পক্ষে, সংকীর্ণ মুসলিম লেখকেরা কৃতিত্বের দাবীদার করেছেন মুসলিমদের। এই ডামাডোলের মধ্যে ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখিত কারিগর হয়তো তাঁরাই, যাঁরা শাজাহানের কালের কয়েক শতাব্দী আগেই তাজমহল নির্মাণ করেছেন।

Havell এর উক্তিতে আমরা পাই যে, আগ্রার বর্তমানের শ্রেষ্ঠ মোজাইক কারিগরেরা সবাই হিন্দু। তাজমহল যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এমন একটি কলায় হিন্দুদের কৃতিত্বের এটা জলন্ত প্রমাণ। মনে রাখতে হবে যে, মুসলিম আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতে সমস্ত কলাবিদ্যার চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। মহম্মদ গজনীর ভারত বিজয়ের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আলবিরুণী বলছেন, 'তিনি হিন্দুদের ধূলিসাৎ করে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।' ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার কাজটা আলপ্তগীন, সবুক্তগীন ও মহম্মদ গজনীর আমলে শুরু হলেও অন্ততঃ আওরঙ্গজেবের কাল পর্যন্ত তা পুরোদমে চলেছিলো। তারপর জাতীয়তাবাদী শক্তির অভ্যুত্থানে তা কিছুটা শ্লথ হয়। এই ঘোর অন্ধকারের যুগে ভারতীয়দের সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গের মতো তাদের ঘর এবং শহর থেকে প্রায়ই খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। কাজেই, সেই সময়ে কোন কলার চর্চা করা বা বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জনের খুব কমই সুযোগ ছিলো। এ সত্ত্বেও যদি Havell এর মতানুযায়ী আগ্রার শ্রেষ্ঠ মোজাইক কারিগরেরা হিন্দু হয়ে থাকেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভারতে মুসলিম আগমনের আগে তাজমহল নির্মাতা-দেরই বংশধর হবেন। এটা আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই বাড়তি শক্তি যোগায় যে, তাজমহল একটা প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ এবং কোনক্রমেই মুঘল আমলের

অপেক্ষাকৃত নতুন কবর নয়।

শুধু তাজমহলই যে শাজাহানের কৃতিত্বে নির্মিত বলে চলে আসা একমাত্র সৌধ নয় তার প্রমাণ মেলে Havell এর অন্য মন্তব্যে। তিনি বলছেন, 'দিল্লীর 'Pietra dura' (দিল্লীর লালকেল্লার দেওয়ানী আমে রাজকীয় বারান্দার পিছনের দেয়ালে পাখির অঙ্কিত চিত্র) ভুল করে শাজাহান নির্মিত বলা হয়।

...পাখি ও জীবজন্তুর স্বাভাবিক অঙ্কন মুসলিম আইনের বিরোধী। এই আইনের স্পষ্ট অনুশাসন এই যে স্বর্গে অথবা মর্ত্যে যে সমস্ত বস্তু আছে তাদের অনুরূপ কিছুই অঙ্কন করা চলবে না।'

যেহেতু এই Pietradura লালকেল্লার একটি অখণ্ড অংশ, যা কোনক্রমেই পরে সংযোজিত নয়, Havell মূলত স্বীকার করছেন যে, শাজাহান নির্মিত বলে প্রচলিত দিল্লীর লালকেল্লা মুসলিম যুগের আগেও বিদ্যমান ছিলো। তখন এইরূপ চিত্র অঙ্কন শুধু সখের ব্যাপারই ছিলো না, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর সজ্জায় এদের অপরিহার্য মনে করা হতো।

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ এবং পুরাতন দিল্লী শহরটি নির্মাণের কৃতিত্বও ভুল করে দেওয়া হয় শাজাহানকে। শাজাহানের সময়কার কাগজপত্র থেকে কেউ এক টুকরো কাগজও দেখাতে পারবেন না যে, তাজমহল এবং এই ধরণের অন্যান্য সৌধ শাজাহান নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই রকম কোন প্রমাণ থাকলে এই ব্যাপারে নিজেদের নানা ধরণের মত পেশ করার কোন প্রয়োজন ইতিহাসের গবেষকদের থাকতো না।

পুরাতন সৌধসমূহের নির্মাণ কৃতিত্বের যে ভিত্তিহীন দাবী মধ্যযুগের মুসলিম লেখকেরা করে গেছেন, তার কোন সোচ্চার প্রতিবাদ ভারতীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই—এটা খুবই দুঃখের। এর কারণ এই যে, ভারতের প্রাক্তন ব্রিটিশ শাসকদের এই দাবীগুলো নিয়ে বিশদ অনুসন্ধান করার একটা অনীহা ছিলো। তাঁরা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন। তাই কোন ভারতীয়েরই সাহস ছিলো না সরকারী নীতির বাইরে যাবার, পাছে তাঁকে রাজরোষে পড়ে ইতিহাসের ডিগ্রী খোয়াতে হয় এবং সেই সঙ্গে জীবিকা অর্জনেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র নন, তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিলো না যে, বংশানুক্রমে ভারতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করে শেখানো হয়েছে। কাজেই, শেখানো ইতিহাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠার সাহস ভারতীয় ঐতিহাসিকদের ছিলো না।

খুবই ব্যাপকভাবে ভারতীয় ইতিহাসে যে মিথ্যা ঢোকানো হয়েছিলো, একথা মনে মনে ভারতের ব্রিটিশ শাসকরা জানতেন। কাজেই, যখনই প্রাচীন সৌধসমূহের নির্মাতার ব্যাপারে কোন সংশয় তাঁদের কাছে, কাছে পেশ করা হতো,

তাঁরা দয়সারা অনুসন্ধানের আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। তাঁরা অবশ্য এটা পুরোপুরি জানতেন যে, ফলাফল তাঁদের অনুকূলেই যাবে। এই ধরণের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। মুবারক মঞ্জিল বা পুরাতন শুল্ক প্রাসাদ সম্পর্কে তদানীন্তন জয়েণ্ট সেক্রেটারীর এক লেখায় এর উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, 'বল্লীগঞ্জের শুল্ক বিভাগ কর্তৃক অধিকৃত প্রাসাদটি মূলতঃ একটা মুসলমান মসজিদ ছিলো কিনা অনুসন্ধান করে জানতে আদিষ্ট হয়ে আমি একথা নিবেদন করতে চাই ..., মনে হয় না এই প্রাসাদটি মূলতঃ একটা মুসলমান মসজিদ ছিলো। মনে হচ্ছে যে, দাক্ষিণাত্যে তাঁর সৈন্যদলের জয়ের খবরের পর আওরঙ্গজেব প্রথম যে প্রাসাদে যাত্রাভঙ্গ করেছিলেন, এই ঘটনার স্মরণে তারই নামকরণ হয়েছিলো মুবারক মঞ্জিল। এমন চিহ্নও পাওয়া গেছে যে, প্রাসাদের একটা অংশ প্রার্থনার জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু মুসলিম সম্রাটেরা এই কাজটা সব সময়েই করেছেন ...।'

'মুসলিম সম্রাটেরা এই কাজটি সব সময়েই করেছেন' এই কথাগুলো বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো। কাজেই, ওপরে যে মুবারক মঞ্জিলের কথা বলা হয়েছে, তা প্রাচীন রাজপুত প্রাসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা প্রথমে মুঘলের ও পরে ব্রিটিশের অধিকারে এসেছিলো। মধ্যযুগের অন্যান্য সৌধ সম্পর্কেও এই ধরণের অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে যে, তাদের উৎপত্তি হয় রাজপুত প্রাসাদ, মন্দির বা দুর্গ হিসেবে। জয় এবং আত্মসাতের সূত্রে এগুলো মুসলিম নির্মিত কবর, দুর্গ মসজিদ হিসেবে চলে এসেছে। ভারতের সর্বত্র কোন নির্জন স্থানে বা রাস্তার ধারে যে সব চূড়া মণ্ডিত দেওয়াল বা কবরের মতো উঁচু ঢিবি দেখা যায় তা সবই হিন্দু সৌধের ধ্বংসাবশেষ বা রূপান্তরিত আকৃতি।

ভারতের প্রাচীন সৌধসমূহের সঠিক ইতিহাস পুনঃনির্মাণে ব্রিটিশ পণ্ডিতদের আগ্রহের অভাব এবং মুসলিম দাবীতে তাঁদের সম্মতি দেওয়ার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যাবে 'Transaction of the Archaeological Society of Agra, July to December' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে সলিমগড় বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, দেওয়ানী আমের সম্মুখের প্রশস্ত উঠান ও গোলন্দাজ শিবিরের ঠিক সামনেই দেখা যায় একক উদ্দেশ্যহীন একটা চতুষ্কোণ বাড়ী...... এটা জাহাঙ্গীরি মহলের মতো হিন্দু রীতিতে অলঙ্কৃত। ....ঐতিহ্য অনুযায়ী একটা নাম ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা নেই।......'

নিরপেক্ষ পণ্ডিতেরা ওপরের পরিচ্ছেদে অনেক সূত্র পাবেন। প্রথমে এতে স্বীকার করা হয়েছে যে সলিমগড় এবং জাহাঙ্গীর মহল নামে যা পরিচিত, তা প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, কেননা, মূর্তিদ্বেষী মুসলিম শাসকেরা তাঁদের আদেশে নির্মিত বাড়িতে হিন্দু রীতির অলঙ্করণ সহ্য করতেন

না। যা আরও স্পষ্ট তা হচ্ছে, পরবর্তী প্রয়োজনের পক্ষে এই বাড়ী দুটোর অনেক অংশই মনে হয় অবান্তর ও অর্থহীন, কারণ এই বাড়ীগুলো আত্মসাৎ করা হয়েছিলো। বিজয়ীরা স্বভাবতই দখল করা বাড়ীর প্রতিটি অঙ্গের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে ব্যাখ্যা দিতে হতবুদ্ধি হবেন, কেন না, এগুলো নির্মিত হয়েছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির অনুসারী লোকেদের দ্বারা। প্রত্যেকটি মধ্যযুগীয় প্রাসাদ সম্পর্কে এই ধরণের অসঙ্গতি ও তথ্যের অনুপস্থিতি থাকলেও ব্রিটিশ পণ্ডিতেরা এগুলো খুঁটিয়ে দেখে সত্যিকারের ইতিহাস লেখায় কোন আগ্রহ অনুভব করেন নি। তাঁদের ক্ষেত্রে এই আগ্রহের প্রেরণা অনুপস্থিত ছিলো। ভারতীয় পণ্ডিতেরা ব্রিটিশের অধীনে থাকার জন্য তাদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে সাহস পেতেন না, পাছে তাঁদের সরকারী স্বীকৃতি বা পৃষ্ঠপোষকতা হারাতে হয়।

তাজমহলের তত্ত্বাবধায়কদের হেফাজতে তারিখ-ই-তাজমহল নামে একটি নথি বংশানুক্রমে রক্ষিত আছে। এতে নাকি তাজমহলের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা আছে। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী এই গ্রন্থটি চুরি করে কোন বিদেশী দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। Keene's Handbook বলেছেন 'এই নথির প্রামাণিকতা কিছুটা সন্দেহের বিষয়'। স্পষ্টতই তিনি এই 'কিছুটা' শব্দ ব্যবহার করেছেন বিনয় ও সর্তকতার খাতিরে। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, তা হচ্ছে যে, বইটা আগাগোড়া জালিয়াতি। সাধারণ বিচার-বুদ্ধিও আমাদের শেখায় যে, কোন মিথ্যা দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই জাল করা নথির প্রয়োজন হয়। তাজমহল যদি মুসলিম কবর হিসেবেই উদ্ভূত হতো, জাল করা নথির কোন প্রয়োজন থাকতো না। এই নথির অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে,যখন তাজমহল তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কবরে রূপান্তরিত করা হলো, তখনই বা তারও আগে সত্যিকারের কাগজপত্র নষ্ট করে সেগুলোর বদলে মিথ্যে নথি রেখে দেওয়া হলো। কাজেই তাজমহল সম্বন্ধে প্রথাগত যত কাহিনী প্রচলিত আছে তার কোনটাই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের উর্দ্ধে নয়।

একাদশ অধ্যায়

তাজমহল হিন্দু স্থাপত্যের রীতি অনুসারে নির্মিত

প্রাচীনকালে হিন্দুপ্রাসাদ নির্মাণ করা হতো বাস্ত শহরের ঠিক মধ্যাস্থলে, যেমন হিন্দু রাজারা হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক মাঝে সৈন্যদের কাছে হাজির হতেন। প্রাসাদেও অধিপতির কক্ষ থাকতো ঠিক মাঝখানে। যখন মধ্যযুগীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো, তখন যুদ্ধে ও স্থাপত্যে হিন্দু রীতির এই বৈশিষ্ট্য আমাদের মনে রাখতে হবে। কবর মসজিদ হিসেবে এ-গুলোকে দেখানো হলেও এগুলো সবই প্রাচীন হিন্দুমন্দির ও প্রাসাদ।

যেহেতু হিন্দু রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন বাছাই করা জিনিসের মুখ্য ক্রেতা, মুখ্য প্রাসাদের কাছাকাছিই বাজার থাকতো। তাজমহল সম্পর্কেও একথা খাটে এবং Tavernier এর সাক্ষ্যও অনুরূপ।

তাজমহল এই নামটার অর্থ হচ্ছে 'শ্রেষ্ঠ আলয়'। এটা কোনক্রমেই কোন কবরের ইঙ্গিত দেয় না। স্বর্গ ও মর্ত্যের মতই পার্থক্য আছে কবর ও প্রাসাদে। কবরের সঙ্গে তাজমহলের নামের যদি কিছু সাদৃশ্য থাকতো, কেউই কোন হোটেলের নাম দিতে সাহস পেতেন না 'তাজমহল হোটেল।' কোন পর্যটকই চাইবেন না 'কবরের হোটেলে' আশ্রয় নিতে। কিন্তু পর্যটকেরা তাজমহলের নামে আকৃষ্ট হন, কেন না, এই নাম প্রাসাদ অথবা মন্দিরের গৌরব ও সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা দেয়, কবরের শান্তি অথবা বিষণ্ণতার নয়।

হিন্দু তাজমহল প্রাসাদ সমুচ্চয়ে লাইন দিয়ে সাজানো দোকান নিয়ে বাজার ছিলো একথা Tavenernier বলে গেছেন। তিনি বলছেন, 'তাসিমকান ছিলো একটা বৃহৎ বাজার।' তিনি তাসিমকান বলে বোঝাতে চাইছেন তাজিমকান অর্থাৎ রাজকীয় গৃহ। তিনি আরও বলছেন 'এতে ছিলো ছয়টি চাঁদনি দিয়ে ঘেরা বিরাট চত্বর, যার মধ্যে ছিলো বণিকদের ব্যবহারের ঘর এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে তুলা বিক্রী হতো'।

ভুল করে যা শাজাহান নির্মিত তাজমহলের লাল পাথরের দেয়াল বলা হয়, সেখানে এই চাঁদনি এখনও দেখা যায়। এই দোকানগুলোর কিছু কিছু এখনও ব্যবহৃত হয় ক্যান্টিন, ছবি, পোষ্টকার্ড বিক্রয় কেন্দ্র, প্রাচীন সামগ্রী ও তাজ-

মহলের অনুকৃতি বিক্রয়ের কেন্দ্র হিসেবে।

এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, Encyclopedia Britannica তাজমহল প্রাসাদ-সমুচ্চয়ের আনুষঙ্গিক হিসেবে আস্তাবল, রক্ষীদের ঘর ও অতিথিশালার উল্লেখ করেছেন। এগুলো সবই প্রাসাদের জন্য প্রয়োজন, স্মৃতি সৌধের জন্য নয়।

প্রাসাদ সমূহ সবই মুসলিমদের, ভারতীয় ইতিহাসে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রোথিত হয়ে আছে এই ধারণা, কেননা এদেরকে দেখানো হয় কবর ও মসজিদ হিসেবে, আর দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম রীতিতে নির্মিত হওয়ার ধারণা এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এ সত্ত্বেও পশ্চিমী পণ্ডিতেরা যখন বলেছেন যে, এই আপাতঃ মুসলিম সৌধসমূহ আগেকার হিন্দু প্রাসাদের স্তম্ভ, কপাটের ফলক, কড়ি বরগা এবং এই ধরণের অন্যান্য জিনিষ নিয়ে নির্মিত, তাঁরা সত্যের কাছাকাছি গিয়েছেন উদাহরণ হিসেবে আমরা এক ব্রিটিশ পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন, আদিল শাহের পূর্বে মুসলিম আক্রমণকারীরা ১৩১৬ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি করিমুদ্দীনের নেতৃত্বে বিজাপুর দুর্গে হিন্দু ধ্বংসাবশেষের অংশ নিয়ে একটা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এতে ব্যবহৃত স্তম্ভের কতটা অন্য প্রাসাদ থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে আমরা জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে যে, অংশত এটা হিন্দু মন্দিরের চাঁদনীর টুকরো। কিন্তু আমাদের ধারণার সঙ্গে এটা অসমঞ্জস নয় যে, অন্যান্য. অংশ তাদের মূল জায়গা থেকে খুলে নিয়ে বর্তমান কাজে অন্য উদ্দেশ্যে করা হয়েছিলো।'

উপরের পরিচ্ছেদটাই দেখাচ্ছে যে, সত্যি খুব কাছে থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমী পণ্ডিতেরা তা ধরতে পারেন নি। কোন মুসলিম কবর বা মসজিদে ঢুকেছেন এই ধারণা তাঁদের এমন আচ্ছন্ন করেছিলো যে, তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন নি যে, মুসলিম উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হিন্দু প্রাসাদে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। পশ্চিমী পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, প্রায় সব মধ্যযুগীয় স্থাপত্যই হিন্দু ধ্বংসাবশেষের সাহায্যে নির্মিত। এটা অর্দ্ধসত্য মাত্র। তাঁদের এটা মনে হয়নি যে, প্রাচীন হিন্দুরা তাদের মন্দির, প্রাসাদ এবং দুর্গে এমন স্তম্ভ কড়িকাঠ, দেয়ালবন্ধনী বা দরজার কপাট ব্যবহার করতেন না, যা সহজেই খুলে নিয়ে অন্য জায়গায় লাগানো যায়।

তাছাড়াও মনে রাখতে হবে, কোন নতুন প্রাসাদই পুরানো কোন প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপ থেকে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আগের প্রাসাদ ভেঙ্গে সেই মালমশলা অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবার খরচও পড়বে খুব বেশী। সেই অংশগুলো মরচে ধরে ভেঙ্গে যেতে পারে এবং তা দিয়ে আগের প্রাসাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির অন্য প্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব নয়। তাছাড়া, একটা হিন্দু সৌধ

ভেঙ্গে সেই মালমশলা দিয়ে সেই রকমেরই আরেকটা সৌধ নির্মাণ করার মতো উন্মাদই বা কে হবেন ?

যদি কোন প্রকাণ্ড হিন্দু প্রাসাদ ভেঙ্গে তার সমস্ত পাথরের টুকরো অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়, তারা এতো বিশ্রীভাবে মিশে যাবে যে, তাদের বাছাই করে সাজানো খুবই সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। সমস্যাটির গভীরতা বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে, যাঁরা তক্তার সাহায্যে দোকানের দরজা করেন, তাঁদেরকে প্রত্যেক তক্তা নম্বর দিয়ে সাজাতে হয়। তাছাড়াও বিশেষ চিহ্ন রাখতে হয় ভিতরের ও বাইরের দিক বোঝাতে। এই তক্তাগুলি ঠিকমতো সাজানো না হলে দোকানের দরজা সুষ্ঠুভাবে বন্ধ করা যাবে না। যখন প্রতিদিনের প্রয়োজনে অভ্যস্ত লোকের হাতে সুবিন্যস্ত ও তৈরী থাকা তক্তারও নম্বরের প্রয়োজন হয়, প্রাসাদ ভেঙ্গে তার মালমশলা অন্যত্র নিয়ে তার সাহায্যে আরেকটা ঐ ধরণের প্রাসাদ নির্মাণ করার ঝামেলা যে কতটা বেশী হতে পারে, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

তাছাড়াও কাজটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এইজন্য যে, অন্য সমস্ত মালমশলা অটুট থাকলেও দ্বিতীয় সৌধটির জন্য আরেকটি নতুন ভিত্তির প্রয়োজন হবে। কাজেই সরল সত্যি হচ্ছে এই যে, মুসলিমরা অন্য প্রাসাদের মালমশলা নিয়ে কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেন নি। তাঁরা হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ দখল করেছেন। তারপর কাউকে কাউকে সমাধিস্থ করেছেন, উপাস্য দেবতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, হিন্দু অলঙ্করণ ঘসে মেজে, মুছে দিয়ে তার ওপর পলেস্তারা লাগিয়েছেন এবং সর্বোপরি সর্বত্র কোরাণের লিপি উৎকীর্ণ করেছেন। এটাই মধ্যযুগীয় মুসলিম কবর ও মসজিদের হিন্দু প্রাসাদের সঙ্গে এতোটা সাদৃশ্য থাকার কারণ। তাজমহল সম্বন্ধেও একথা খাটে।

দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত সৌধকে হিন্দু রীতিতে নির্মিত অবিমিশ্র মুসলিম সৌধ ভেবে পশ্চিমী পণ্ডিতেরা ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্যকলার একটা উদ্ভট মতবাদের অবতারণা করেছেন এবং সরকারী ক্ষমতার বলে তা ইতিহাস, স্থাপত্য ও বাস্তুবিদ্যার বইতে পাঠ্য হিসেবে ঢুকিয়েছেন।

এই নড়বড়ে মতবাদই সোল্লাসে তাজমহলকে ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্যের প্রস্ফুটিত কুসুম হিসেবে বর্ণনা করেছে। এই সমস্ত অনুমান যে কতটা শোচনীয় বিভ্রান্তির ফল তা বোঝা যাবে সহজেই, কেননা আমরা প্রমাণ করেছি যে, তাজমহল সপ্তদশ শতাব্দীর কোন মুসলিম কবর নয় বরং তা দ্বাদশ শতাব্দীর এক প্রাচীন শিব মন্দির। এটাও বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, মধ্যযুগীয় মুসলিমরা হিন্দু প্রাসাদ ও মন্দির ভেঙ্গে সেই পাথর দিয়ে মসজিদ ও কবর নির্মাণ করতে পারতেন। অসঙ্গতি স্পষ্ট হয় তখনই যখন দেখি যে মধ্যযুগীয় সৌধের

অভ্যন্তরের সবটাই ইঁট এবং চুণের তৈরী, পাথরের দেখা মেলে শুধু বাইরে। যেহেতু ডিমের বা নারকেলের খোলা চুরি করে কেউ ডিম বা নারকেল বানাবার আশা করতে পারেন না, এটাও বিশ্বাস করা শক্ত যে, বিদেশী* মুসলিম শাসকেরা হিন্দু প্রাসাদের সমস্ত পাথর খুলে নিয়ে সব অন্য জায়গায় এক নঙ্গে পাঠিয়ে তাদেরকে আবার ঠিকভাবে সাজিয়ে কোন প্রকাণ্ড সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারতেন. বিশেষত, যখন ঐ পাথর-গুলি সাজানো হয়েছিল হিন্দুদের দ্বারা বহু শতাব্দী আগে, তাদের নিজেদের রীতি মতো মাপ, শৈলী ও ব্যবহারের উপযুক্ত করে।

পশ্চিমী পণ্ডিতদের অযথা দোষারোপ করার ইচ্ছা আমাদের নেই। তারা ছিলেন বুদ্ধিমত্তায় অত্যুন্নত, কষ্টসহিষ্ণু অনুসন্ধানী। কিন্তু বিদেশী হওয়ার জন্য তাঁরা ভারতে মুসলিম শাসনের ফাঁকিবাজিটা ধরতে পারেন নি। কাজেই ভারতীয় ইতিহাসের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাঁদের অভাব ছিলো। কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি, তাঁদের অধিকাংশই সত্যের কাছাকাছি গিয়েছিলেন। এমনই একজন ছিলেন E B. Havell যিনি একজন দক্ষ স্থপতি ও গভীর অন্তদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

তাজমহল অহিন্দু স্থাপত্যরীতিতে তৈরী একথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন Havell। কিছু ঐতিহাসিকের মতে ভেরোনিয়ো নামে এক ইতালীয় তাজমহলের নক্সা প্রস্তুত করেছেন। তাজমহলের স্থাপত্যের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করে শ্রীকানওয়ার লাল Havell এর উদ্ধৃতি দিচ্ছেন এই মর্মে, ভেরোনিয়ো যদি ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যায় এতই দক্ষ হতেন যে 'শিল্পশাস্ত্রের' নিয়ম জেনে পদ্ম—আকৃতির গম্বুজের নক্সা তিনিই করেছেন মনে করা যায়, তাহলেও এশীয় কারিগরদের দ্বারা নির্মিত গম্বুজটি তাঁর বলা চলে না। আগ্রার তাজমহলের গম্বুজ ও বিজাপুরে ইব্রাহিমের কবরে গম্বুজ দুটোই একই রীতিতে নির্মিত। তাদের আকৃতি প্রায় একই ধরণের এবং তাদের সীমা-সূচক রেখাও যে প্রায় একই, ফার্গুসন ও তাঁর সমর্থকেরা তা ধরতে পারেননি। তফাৎ শুধু এই যে, তাজমহলের পদ্ম শিরোপা বেশ সূচালোভাবে শেষ হয়েছে আর গম্বুজের মাঝখানেষ পদ্মের পাপড়িগুলো খোদাই করার বদলে ভেতর থেকে সাজানো রয়েছে। আমাদের কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে তাজমহল ভারতে নির্মিত এমন একটা প্রাসাদ, যা বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রাসাদের ঐতিহ্য-বাহী শ্রেষ্ঠ কারিগরদের হাতে তৈরী। চারিদিকে চারটি গম্বুজওয়ালা কক্ষের মাঝখানে একটি গম্বুজওয়ালা বড়ো প্রকোষ্ঠের যে পরিকল্পনায় তাজ নির্মিত, তা ভারতীয় পঞ্চরত্ন বা পাঁচটি রত্নের মন্দিরের অনুরূপ। এর অনুরূপ জিনিষ দেখা যায় জাভার চণ্ডীসেবায় বুদ্ধ মন্দিরে এবং অজন্তার স্তূপ

মন্দিরে। শাজাহান ও তাঁর সভার স্থপতিরা এই কাজের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না, একজন নগণ্য ইতালীয় ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে তো তা সম্ভবই নয়।

তাজমহল প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু রীতিতে নির্মিত এবং শাজাহানের সমসাময়িক কেউই এর নক্সা প্রস্তুত বা পরিকল্পনা করতে পারতেন না, এই বক্তব্যে Havell খুবই স্পষ্ট। এটা দুঃখের যে, Havell শাজাহানের আমলের সরকারী ইতিহাস বাদশানামার স্বীকৃতির কথা জানতেন না। এতে বলা আছে যে, তাজমহল একটা প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ। এই স্বীকৃতির কথা তাঁর আমলে জানা গেলে তিনি এই দেখে আনন্দিত হতেন যে, স্থাপত্যরীতির দিক থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত ইতিহাসের দিক দিয়েও সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। তাহলে Percy Brown, Fergusson এর চাইতেও তাঁকে ভারতীয় স্থাপত্যের বিশেষজ্ঞ হিসেবে অধিক স্বীকৃতি দেওয়া হতো।

এই প্রসঙ্গে আমরা Havell-এর এই মন্তব্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, গম্বুজ তো বটেই, এর ওপরে ওল্টানো পদ্মের ঢাকনাও খুবই প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য। এই রীতির উদ্ভব সেই সেই হারানো প্রাচীন কালে আর ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা আছে।

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের হতবুদ্ধিকর বৈচিত্র্য খুবই গভীরভাবে পাঠের ও অনুসন্ধানের বিষয়। তাহলে পাঠক ধারণা করতে পারবেন হাজার হাজার বছরের স্থাপত্যবিদ্যার দক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও চর্চার, যা সম্ভব করেছে ভারতের গুহামন্দির, সৌধ, ঘাট, খাল, সেতু এবং প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু শিল্প শাস্ত্রের তৈরী সবচাইতে সুন্দর প্রাসাদ তাজমহল নির্মাণ। একটু অনুধাবন করলেই পাঠক বুঝবেন যে, শাজাহান তাজমহল নির্মাণ করিয়েছেন এই ধারণা খুবই বালকোচিত ও নড়বড়ে।

দ্বাদশ অধ্যায়

শাজাহানের হৃদয়ে দুর্বলতার জায়গা ছিলো না

তাজমহল নির্মাণের কৃতিত্ব শাহাজাহানকে দেওয়ার অর্থ হলো স্বীকার করে নেওয়া যে, মমতাজের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় রোমিওর মত নিষ্ঠা ও শিল্পী-সুলভ কোমলতা ছিলো। তা দূরে থাক, শাজাহান ছিলেন একজন কঠোর-হৃদয়, কৃপণ, আত্মম্ভরি, ধর্মোন্মাদ, কামাসক্ত, অত্যাচারী শাসক। আর মমতাজ ছিলেন সর্বাংশে তাঁর উপযুক্ত মহিষী।

মৌলভী মইনুদ্দীন আহমদ বলছেন, 'ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা কখনও কখনও অভিযোগ করেছেন যে, শাজাহান ছিলেন প্রেমের ক্ষেত্রে বহুচারী এবং এর উৎস ছিলো মমতাজের সংকীর্ণতা।'

হাভেল লিখছেন, 'যেসুইটদের শাজাহান অত্যন্ত নির্মমভাবে উৎপীড়ন করেছেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে খৃষ্টানদের চিরকালের শত্রু মমতাজ শাজাহানকে প্রবুদ্ধ করেছিলেন হুগলীর পর্তুগীজ নিবাস আক্রমণ করতে।'

Transactions of the Archaeological Society of Indiaতে বলা আছে, 'অনেকবার শাজাহান সন্ন্যাসী ও অন্য ধর্মের পুরোহিতদের আহ্বান জানিয়েছিলেন মুসলমান হতে। কিন্তু তাঁরা তাতে অস্বীকৃত হলে শাজাহান অত্যন্ত উত্তেজিত হন এবং পরদিনই ঐ পুরোহিতদের হাতীর পায়ে পিষে হত্যা করার হুকুম দেন। ঐ শাস্তি তদানীন্তন সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধীদের দেওয়া হতো।'

Keene বলছেন, 'শাজাহান স্বেচ্ছাচারিতার দম্ভে সমস্ত মুঘল শাসকদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করে সিংহাসনের পথ সুগম করে ছিলেন। শাজাহানকে যিনি ব্যক্তিগত-ভাবে জানতেন সেই Roe বলছেন যে, শাজাহান কিছুতেই নত হতেন না। তাঁর স্বভাবে ছিলো অত্যধিক দর্প ও অপরের প্রতি অবজ্ঞা।'

এমন কি মোল্লা আবদুল হামিদও তাঁর শাজাহানের রাজত্বের সরকারী ভাষ্যে দৌলতবাদ জয়ের প্রসঙ্গে বলছেন 'কাসিম খাঁন ও কম্বু স্ত্রীপুরুষ যুবা বৃদ্ধ মিলিয়ে প্রায় ৪০০ বন্দীকে ধর্মরক্ষক সম্রাটের সম্মুখে হাজির করলেন। তিনি হুকুম দিলেন তাদেরকে মুসলিম ধর্মের মূল সূত্রগুলি বুঝিয়ে এই ধর্মে দীক্ষিত

করার জন্য। সামান্য কিছুলোক ধর্মান্তরিত হলো। কিন্তু বাকীরা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করলো এই প্রস্তাব। এই হতভাগ্যদের সশ্রম বন্দীত্বের হুকুম দিয়ে বণ্টন করা হলো আমাদের মধ্যে। ফলে অনেককেই বন্দীদশার মধ্যেই মৃত্যু বরণ করতে হয়। তাদের উপাস্য মূর্তির মধ্যে পয়গম্বরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্তদের যমুনায় ফেলে দেওয়া হলো। বাকীগুলো টুকরো টু করো করে ভেঙ্গে ফেলা হলো।

ইতিহাসে শাজাহানের নিষ্ঠুরতার এমন অনেক বিবরণ আছে যা সাধারণ পাঠ্য বইয়ে লেখা শাজাহানের শিল্পরুচি ও পত্নীর প্রতি আনুগত্যের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। নিষ্ঠুরতা ছিলো শাজাহানের সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং অতস্ত্য অল্পবয়স থেকেই এর দৌলতে তিনি নিজের পিতার কাছ থেকে অবিমিশ্র তুরন্থা আখ্যা অর্জন করেছিলেন।

শাজাহানের শয়তানি গোড়া থেকেই দেখা গিয়েছিলো তাঁর আত্মীয় স্বজনের প্রতি। অন্যদের প্রতিতো তো ছিলই। Keene-এর Handbook-এর ২৫ এর পাতায় একটি উদাহরণ মূলক পরিচ্ছেদের সাহায্যে একে আরো বিশদ করা যায়। তিনি বলেছেন যে, শাজাহান তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে সিক্রী দখল করে আগ্রা শহরে লুটপাট করেন। সেই সময় ভারতে আগত জনৈক সম্ভ্রান্ত ইতালীয় Della Valle-র মতে তাঁর সৈন্যরা চূড়ান্ত পৈশাচিক আচরণ করেছিলো। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নাগরিকরা বাধ্য হয়ে ছিলো তাদের লুকানো ধনরত্ন সমর্পণ করতে। আর অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলার সতীত্বহানি এমন কি অঙ্গহানিও হয়েছিলো।

ভারতীয় ইতিহাসের এটাই পরিহাস যে, একজন অত্যাচারী ঠলুনকারী ও ধ্বংসকারীকে মমতাজের অনুষত স্বামী শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক, পণ্ডিত, সুন্দর প্রাসাদের স্রষ্টা ও স্বর্ণযুগের প্রবর্তক হিসেবে দেখিয়ে উচ্চপ্রশংসা করা হয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র ও শিক্ষকদের বুদ্ধিমত্তার প্রতি এটা অপমানস্বরূপ। ৩৮ পৃষ্ঠায় এক পাদপংক্তিতে Keene আরো বলেছেন, 'শাজাহান তাঁর ছোট ভাই শাহরিয়ায় ও কাকা ডানিয়েবের দুই ছেলেকে হত্যা করিয়েছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক জ্যেষ্ঠভ্রাতা খসরু হত্যার কৃতিত্বও তাঁকেই যেন।

শাজাহানের অত্যন্ত বেশী কামুকতা ও মমতাজের স্বাস্থ্য সমন্ধে তাঁর একান্ত অবহেলার জন্যই ১৮ বছরের কমসময়ের বিবাহিত জীবনে ১৪ বার প্রসব বেদনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো মমতাজকে এবং এর ফলে তিনি অকালে মরে যান। এই আঠার বছরের কম সময়ের মধ্যে মমতাজের গর্ভজাত ১৪ জনের লম্বা তালিকা পাওয়া যাবে Keene-এর Handbook-এর ৩৭ পৃষ্ঠায় পাদ-

পংক্তিতে। মৃত্যু এসে এই তালিকা আর বাড়াতে দেয়নি। পরিবার পরিকল্পনার ঠিক উল্টোভাবে তৈরী হওয়া এই প্রকাণ্ড তালিকা দেখাচ্ছে :

(১) হুরিয়েল নিসা (স্ত্রী) জন্ম ১৬১২ মৃত্যু ১৬১৫, (২) জাহানারা (স্ত্রী) জন্ম ১৬১৩, সেই কন্যা যাঁর সঙ্গে শাজাহানের অবৈধ সম্পর্ক ছিলো বলে শোনা যায়, (৩) মোহম্মদ দারা শেকো, জন্ম ১৬১৪, (৪) মোহম্মদ শাহ শুজা, জন্ম ১৬১৫ (৫) রোশনারা (স্ত্রী), জন্ম ১৬১৬, (৬) মোহম্মদ আওরঙ্গজেব, জন্ম ১৬১৭। এই আওরঙ্গজেব ভারতীয় ইতিহাসে একটি অভিশপ্ত নাম। তিনি শাজাহানের অনুসরণ করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা অথবা বিকলাঙ্গ করিয়েছিলেন। (৭) উমাইদ বক্স, জন্ম ১৬১৯ মৃত্যু ১৬২১, (৮) সুরাইয়া বানু জন্ম ১৬২০ মৃত্যু ১৬২৭, (৯) একটি অনামা ছেলে ১৬২১, সালে জন্মায় ও কিছুকাল পরেই মারা যায়, (১০) মুরাদ বক্স, জন্ম ১৬২৩, (১১) লুৎফুল্লা, জন্ম ১৬২৬ মৃত্যু ১৬২৭ (১২) দৌলত আফজল, জন্ম ১৬২৭ মৃত্যু ১৬২৮, (১৩) একটি অনামা কন্যা ১৬২৮ সালে জন্মের অনতিপরেই মারা যায়, ১৪ গওহারা (স্ত্রী) জন্ম ১.২৯। এইশিশুটির জন্মের সময়ই মমতাজ মারা যান।

সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর ছেলে শাজাহান সম্বন্ধে কি বলছেন লক্ষ্য করে দেখুন, অমি নির্দেশ দিলাম যে এখন থেকে সে (যুবরাজ শাজাহান অধম) ব্যক্তি হিসেব পরিচিত হবে এবং যখনই এই নামটির উল্লেখ থাকবে ইকবালনামায়, বুঝতে হবে যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ শাজাহান। লিখে বোঝানো যাবে না, তার জন্য কত কিই না আমি করেছি আর কত দুঃখই না পেয়েছি। যখন ঐ বিদ্রোহী সন্তানের খোঁজে আমাকে দীর্ঘ যাত্রা করতে হচ্ছে সৈন্য নিয়ে, তখন দুর্বলতা ও বিবাদ আমাকে গ্রাস করছে। শাজাহান এখন আর আমার ছেলে নয়।,

শাজাহান কোন কিছুর নির্মাতা তো ননই বরং তিনি ছিলেন ধ্বংসকারী। দেখুন, তাঁর সভায় ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল হামিদ কি বলছেন। নাস্তিকতার শক্ত দুর্গ বেনারসে আগের সম্রাটের রাজত্বকালে অনেক পৌত্তলিক মন্দির শুরু করা হয়েছিলো কিন্তু এগুলো তখনও শেষ হয়নি। পৌত্তলিকেরা এগুলো সমাপ্ত করতে উৎসুক হলেন। সম্রাটের সম্মুখে নিবেদন পেশ করা হলো। সম্রাট হুকুম দিলেন যে বেনারসে এবং তাঁর রাজত্বের অন্যান্য জায়গাতেও যে সমস্ত মন্দির শুরু করা হয়েছিলো তা যেন ভেঙ্গে ফেলা হয়। এখন খবর পাওয়া গেছে যে এলাহাবাদ প্রদেশে বেনারস জেলায় ৭৬ টি মন্দির ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।'

উপরের পরিচ্ছেদ থেকেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি। প্রথমত

আমরা ইতিহাসের ছাত্রের কাছে আমাদের সিদ্ধান্তের সাধারণ নীতি হিসেবে রাখতে চাই যে, ধ্বংসকারী কখনোই নির্মাণকারী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 'ধুলিসাৎ করা হয়েছিলো' বা 'নষ্ট করা হয়েছিলো' কথাগুলো বুঝতে হবে একটা বিশেষ অর্থে। হিন্দুদের বের করে দেওয়া হয়েছিলো তাদের মন্দির থেকে, মূর্তিগুলো ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিলো আর সেই সৌধই ব্যবহৃত হয়েছিলো মসজিদ হিসেবে। এটাই ছিলো ভারতে আগত বিদেশী মুসলিম শাসকদের অভ্যাস এবং এটাই ব্যাখ্যা দেয় কি কারণে প্রত্যেক মধ্যযুগীয় কবর ও মসজিদ হিন্দু প্রাসাদের মতো দেখায়।

শ্রীকানওয়ার লালের বইতে লেখা আছে, 'শাজাহান উক্ত ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নী হিসেবে এবং মমতাজের প্ররোচনায় তিনি নতুনভাবে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংস সাধনে রত হন। তিনি আগ্রার খ্রীষ্টান চার্চের চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। Manucci, Bernier প্রভৃতি ইউরোপীয়ান পর্যটকেরা শাজাহানের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক কেচ্ছার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে চিত্রিত করেছেন এমন একটি ঘৃণিত জীব হিসেবে, যাঁর জীবনে একমাত্র লক্ষ্য ছিলো কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা। তাঁদের মতে প্রাসাদে ঘন ঘন সৌখীন বাজার বসানো, রাজদরবার কর্তৃক অনেক নর্তকী পোষা, অন্দরমহলে শতশত পুরুষ পরিচারক রাখা—এসবই ছিলো শাজাহানের উৎকট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার উপায়। Manucci বলছেন, 'মনে হবে যে শাজাহান কেবলমাত্র আমাদের জন্য নারী খোঁজার কাজেই মন দিতেন।' জাফর খান ও খলিতুল্লাহ খানের স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন যে, এটা এত কুখ্যাত ছিলো যে, যখন তারা রাজসভায় আসতেন ভিক্ষুকেরা চীৎকার করে জাফর খানের স্ত্রীকে বলতো, 'হে শাজাহানের প্রাতঃভোজ, আমাদের মনে রাখুন', এবং খলিতুল্লাহ খানের স্ত্রী পাশ দিয়ে গেলে তারা বলতো 'হে শাজাহানের মধ্যাহ্নভোজ আমাদের দয়া করুন।' Bernier মন্তব্য করেছেন যে, শাজাহানের নারীমাংসের প্রতি লোভ ছিলো। Manrique বলছেন যে, শাজাহান শায়েস্তা খাঁর স্ত্রীর সতীত্বহানি করেছিলেন নিজের কন্যার সাহায্যে। Peter Mundy শাজাহানের কন্যার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। Tavernier ও সেই কথাই বলছেন। ওয়ারীস বলছেন যে, আকবরবাদী মহল ও ফতেপুরীমহল এই দুই ক্রীতদাসী ছিলো শাজাহানের অত্যন্ত প্রিয়। সব চাইতে বিস্ময়ের হচ্ছে এই অনুমান যে, কন্যা জাহানারার সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্বন্ধ ছিলো! Bernier বলছেন 'শাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহেবা ছিলেন খুবই সুন্দরী এবং সুগঠিত দেহের অধিকারী এবং সম্রাট তাঁকে খুবই আবেগের সঙ্গে ভালোবাসতেন। জনশ্রুতি এই যে, তাঁর এই আসক্তি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, তা বিশ্বাস

করা কঠিন। তিনি নাকি এই আচরণের সমর্থনের ভার দিয়েছিলেন মোল্লা ও আইনজ্ঞদের হাতে। তাঁদের মতে সম্রাটকে তাঁর নিজবৃক্ষের ফলের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত করাটা নাকি সঠিক হতো না। Vincent Smith বলছেন যে, এই অগম্যাগামী প্রেমের সবচাইতে প্রাচীন সাক্ষ্য পাওয়া যাবে De Laet এর কাছে থেকে এবং Thomas Herbert তা প্রমাণিত করেছেন।

এখন দেখা যাক, মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ শাজাহানের আচরণ সম্বন্ধে কি বলেন। 'শাজাহান (১৫৯৩-১৬৫৮) পঞ্চম মুঘল সম্রাট। শাহাবুদ্দীন মোহম্মদ কিরান ওরফে শাজাহান ছিলেন জাহাঙ্গীর সেলিমের ঔরসে এক যোধপুরী কন্যার গর্ভজাত। আসফখান ও নূরজাহানের চেষ্টায় তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। পিতা জীবিত থাকাকালে শাজাহান দুই কিম্বা তিনবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহনের পর (১৬২৮) তিনি সমস্ত নিকটাত্মীয়দের হত্যা করেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে শাহজীকে পরাস্ত করে তিনি পুরো আহমদনগর এলাকা দখল করে নেন। তিনি ভারতে আগত ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং ধর্মে তাদের নাক গলানো তিনি সহ্য করতেন না। পর্তুগীজেরা ধর্মের নামে অত্যাচার করছে খবর পেয়ে শাজাহান এক সৈন্যদল পাঠান হুগলী নদীর তীরে তাদের উপনিবেশের বিরুদ্ধে, যারা সেখানে লুটপাট চালিয়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। তিনি পারসীকদের কাছ থেকে কান্দাহার ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে সফলকাম হননি। আসফখানের কন্যা মমতাজ ছিলেন শাজাহানের স্ত্রী। তার কাছ থেকে তিনি আট পুত্র ও ছয় কন্যা মিলিয়ে মোট চৌদ্দটি সন্তান লাভ করেন। এর মধ্যে আটটি শৈশবে মারা যায়। আট বছর তিনি পুত্র আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দী ছিলেন এবং বন্দীদশাতেই ১৬৬৬ সালে মারা যান।'

মমতাজের প্রতি শাজাহানের কোন বিশেষ আসক্তির কথা অপ্রমাণ করতে তার কামুকতা ও নিষ্ঠুরতার এই ওপরের সারাংশই যথেষ্ট। মমতাজ ছিলেন তাঁর হারেমের ৫০০০ অন্তঃপুরিকার একজন। তাঁর সভাসদদের এবং প্রজা ও ক্রীতদাসীদের অগণ্য স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যারাও ছিলেন এর অতিরিক্ত, যাদের তিনি ব্যবহার করতেন যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য।

মমতাজের মৃত্যু শাজাহানকে ব্যথিত করার বদলে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলো একটা রাজনৈতিক অস্ত্র। এই মৃত্যুকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন জয়সিংহের উত্তরাধিকারাগত একটা প্রাসাদ দখলের জন্য। হিন্দুদের প্রতি

শাজাহানের তীব্র ঘৃণা থাকায় একজন হিন্দুকে তাঁর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা থেকে এই ভাবে বঞ্চিত করতে শাজাহানের বাধেনি।

তাঁর কৃপণ, ভণ্ড ও কামুক স্বভাবের কথা জানাও পর, শাজাহান তাঁর হারেম ও বাইরের অগণিত নর্মসহচরীর একজনের জন্য আবেগে আপ্লুত হয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাবেন একথা ভাবা যায় না।

এই ধরনের তথাকথিত মুসলিম কবর প্রথমে আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত ও পরে কবরে রূপান্তরিত হিন্দু প্রাসাদ মাত্র। তাজমহলও একক কোন কবর নয়, বরং একটা প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ, যা পরে সমাধিস্থল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। মমতাজের কবর ছাড়াও, পার্শ্বেই শায়িত আছেন শাজাহান। এটাই সব নয় ঐ একই চত্বরে আরো দুটো কবর আছে।

শ্রী কানওয়ার লাল বলছেন, 'জিলোখানার অপরপ্রান্তে, পূর্বদিকে আরো দুটো সৌধ আছে। একটি হচ্ছে মমতাজের প্রিয় পরিচারিকা সাতিউন্নিসা বেগমের কবর। বুরহানপুরে মমতাজের অস্থায়ী কবরের দেখাশুনা করার ভার এর ওপর ন্যস্ত ছিলো। ঐ রকমই আরেকটা কবর হচ্ছে শাজাহানের আরেক পত্নী শাহারান্দি বেগমের। এই দুটি সৌধ ঠিক এক আকারেই নির্মিত হয়েছিলো।

সাতিউন্নিসা খানমের কবর সম্পর্কে Kene তাঁর Handbook এর ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠায় বলছেন, 'উক্ত আছে যে এই কবরে শায়িত দেহটি মমতাজের অনুগত পরিচারিকার। শাজাহান কর্তৃক এই কবরটি নির্মাণে নাকি খরচ পড়েছিলো ৩০০০০ টাকা। ১৬৪৭ সালে অপুত্রক বিধবা হিসেবে লাহোরে তিনি মারা যান। আগ্রার চিত্তিখানার (সতীখানার অপভ্রংশ) তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। কবরটিতে আছে একটি অষ্টকোণ ভিত্তি, একটা অষ্টকোণ কক্ষকে কেন্দ্র করে। সাতিউন্নিসা খানমকে যে তাজমহলের আশেপাশে কবর দেওয়া হয়েছে এটা মোটামুটি প্রামাণিক। কিন্তু তাঁকে যে এই বিশেষ কবরটির সম্মান দেওয়া হয়েছে লোকের বিশ্বাস ছাড়া একথার অন্য ভিত্তি নেই।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তাজমহলের ইতিকথার অন্যান্য খণ্ডের মতো এই সাতিউন্নিসা খানমের কবরের কথাটাও বানানো। কবরের মতো দেখতে উঁচু স্তূপ দখল করা হিন্দু প্রাসাদে বানানো হয়েছিলো, যাতে হিন্দুরা এই সমস্ত প্রাসাদ পুনরায় দখল করে ব্যবহার করতে না পারে। সমাধিস্থল নাড়াচাড়া করা বা তা ব্যবহার করার প্রতি হিন্দুরের অনীহায় কথা মুসলিমরা জানতেন। কাজেই কতকগুলো মিথ্যে ত্রিকোণাকৃতি কবররের মতো স্তূপ নির্মাণ করাটা কড়া সামরিক পাহারা বা কাকতাড়ুয়া বসানোর কাজ করেছিলো নামমাত্র খরচায়। এটা হিন্দু প্রাসাদ দখলের একটা সফল ও সুপরিকল্পিত ফন্দী ছিলো এবং এতে কাজও হয়েছিলো যথেষ্ট। এখনও সময়ের এতটা

দূরত্বে দাঁড়িয়েও Keene এর মনো বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা দেখেছেন, এই তথাকথিত কবরে উল্লেখিত মৃতদেহ নেই।

এ ছাড়া Keene এর লেখায় লক্ষ্য করার মতো আরো কিছু বিশদ বিবরণ আছে। প্রথমত, যখন পায়ে হাঁটা ছাড়া অন্য কোন ধরণের যানবাহনের বিশেষ প্রচলন ছিল না, তখন কেই বা চাইবেন এক পারিচারিকার বিগলিত দেহকে লাহোর থেকে আগ্রা পর্যন্ত ৫০০ মাইল দূরত্বে টেনে নিয়ে আসতে। দ্বিতীয়ত, শাজাহান কেন এই কবরের পিছনে ৫০০০০ টাকা ব্যয় করবেন, যখন তিনি কপর্দকও ব্যয় না করে হাজার হাজার শ্রমিককে পরিশ্রমে বাধ্য করে প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদটির বাড়তি অংশগুলো বোজানো ও কোরাণের লিপি খোদাই করিয়েছেন? তৃতীয়, সামান্য এক পরিচারিকা কি করে জনবহুল অঞ্চলের পত্তন করেন? পত্তন করা বলতে কি বোঝায়? সতীখানা আগ্রার একটি প্রাচীন অংশ, যা 'সতী' হবার উদ্দেশ্যে হিন্দু মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। এটাই দেখাচ্ছে যে, মুসলিম ইতিহাস, এমন কি বোরখা আবৃত নীচুস্তরের অশিক্ষিতা মহিলা, কুমোর অথবা ভিস্তির নামেও হিন্দুস্থানের সব কিছুরই কৃতিত্বের দাবী রাখতে চাইছে। চতুর্থত, এর অষ্টকোণ আকারই পরিষ্কার দিচ্ছে যে, এটা ছিলো প্রাক্তন হিন্দু প্রাসাদ। পঞ্চমত, এই মহিলার জীবিতাবস্থায় অর্জিত বেতনের পরিমাণ কি ৩০০০ টাকা ছিলো, যাতে তাঁর কবরের পিছনে ৩০০০০ টাকা খরচের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া? তাঁর কবরে ৫০০০০ টাকা খরচ হলেও তাঁর বাসস্থানের মূল্য কি এর থেকে বেশী ছিলো? শাজাহান কি তাঁর সভার সব পরিচারিকার জন্য এই ধরণের কবর বানিয়েছিলেন? আর ৫০০০ অন্তঃপুরিকার যদি একত্রে ১০০০ পরিচারিকা থেকে থাকে, শাজাহান কি প্রত্যেক প্রেমিকার জন্য একটি করে তাজমহল ও প্রত্যেক পরিচারিকার জন্য একটি সংলগ্ন সমাধিস্থল নির্মাণের আশা করতে পারতেন?

এখানে আমরা পাঠকদের চিন্তা করতে বলবো, জীবিতকালে শাজাহানের পক্ষে শুধু মহিষী এবং তাঁদের পরিচারিকাদের জন্য কবর নির্মাণ করে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ করার ছিলো কি না। তাছাড়া এটাও কিভাবে সম্ভব যে, মহিষী সাহারান্দি বেগম এবং মমতাজের মহিষীর মর্যাদার হানি করতে চেয়েছেন এক পরিচারিকার তুল্য মর্যাদা দিয়ে? অথবা শাজাহান কি পরিচারিকা সাতিউন্নিসা খানমকে মহিষীর মর্যাদায় উন্নীত করতে চেয়েছিলেন? একথায় স্বতঃপ্রতীয়মান ব্যাখ্যা এই যে, এই দখল করা প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদে অনেক কক্ষ, স্তম্ভ ও শিবির থাকলেও, কাজে লাগানোর জন্য একই ধরণের

ডুটো কক্ষ বেছে নেওয়া হয়েছিলো মহিষী ও পরিচারিকার মৃতদেহ কবরস্থ করতে।

শাহারান্দি বেগম মমতাজের আগে মারা গেলে আমাদের ইতিহাস বইতে হয়তো নির্লজ্জের মতো লেখা হতো শাজাহান ও শাহারান্দি বেগমের ভালবাসার বানানো কাহিনী, যার সাহায্যে তাজমহলকে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত বলে চালিয়ে দেওয়া যেতো। কাজেই মুসলিম সময়ের ভারতীয় ইতিহাস মিথ্যা ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত। পরবর্তীকালে এগুলো বোঝাই করা হয়েছে বানানো নানা বিবরণ দিয়ে আর ব্যাখ্যা দিয়ে যথার্থতা প্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে এই সমস্ত অযৌক্তিক, আজগুবি ও অসম্ভব ধারণার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শাজাহানের রাজত্ব স্বর্ণময় তো নয়ই, শান্তিপূর্ণও ছিলো না।

শাজাহানের রাজত্বকালের সমস্ত বিবরণেই তাঁর সময়কে স্বর্ণময় ও শান্তিময় বলা হয়েছে, আর এর ফলেই নাকি তিনি মন্দির, মসজিদ, দুর্গ এবং গৌরবপূর্ণ নানা প্রাসাদ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। এটা সত্যের পরিহাস মাত্র। তাঁর রাজত্বকাল ছিলো দুর্যোগপূর্ণ,—সংক্রামক রোগ, যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষে পরিকীর্ণ। তাঁর সময়টা জোরগলায় শান্তিপূর্ণ বলা হয়েছে, শুধু আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা প্রভৃতি সুন্দর সৌধ নির্মাণের মিথ্যা কৃতিত্ব তাঁকে অর্পণের যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর প্রজাবর্গের একটা অতিবৃহৎ অংশ, অমুসলিম নাগরিকদের প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ, তাঁর পাশবিক উৎপীড়নের শিকার হয়েছিলো। তাদের ওপর অকথ্য উৎপীড়ন চালানো হয়েছিলো, আর প্রায়ই তাদের মন্দির ভেঙ্গে দেওয়া হতো। আমরা আরও দেখেছি, শাজাহান তাঁর সিংহাসনের সম্ভাব্য দাবীদার সব আত্মীয়কেই হত্যা করেছিলেন। Keene বলেছেন, শাজাহান স্বেচ্ছাচারিতার সমস্ত মুঘল সম্রাটকেই অতিক্রম করেছিলেন। তিনিই প্রথম সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করান।'

যেখানে নাগরিকদের ধনপ্রাণ ও মেয়েদের সতীত্বের কোন নিরাপত্তা ছিলো না, সেরকম কোন শাসকের রাজত্বকাল দূর কল্পনাতেও স্বর্ণময় বা শান্তিপূর্ণ বলা চলে কি? অবিরাম যুদ্ধ ও বিদ্রোহ কণ্টকিত সময়কে কি শান্তিপূর্ণ বলা চলে?

লালকেল্লা, দিল্লীর তথাকথিত জুমা মসজিদ এবং আগ্রার তাজমহলের মতো জাঁকালো প্রাসাদ নির্মাণের মতো সময়, অর্থ, নিরাপত্তা বা কল্পনার দৌড় শাজাহানের ছিলো না। দখল করা হিন্দু প্রাসাদ অদলবদল করার জন্য ভারা বাঁধার খরচ যোগানোর অর্থেরও তাঁর অভাব ছিলো। আর, নিজের উদ্যোগে সম্পূর্ণ নতুন সৌধ তৈরী করানোর স্বপ্ন দেখার তো প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে আমরা পাই Tavernier এর সাক্ষ্য। তিনি বলছেন, 'সমস্ত কাজের মধ্যে ভারা বাঁধার কাজই খরচ পড়েছিলো বেশী, কারণ কাঠের অভাবে সেগুলো পুরোপুরি ইঁট দিয়ে তৈরী করতে হয়েছিলো, ঠেকনা হিসেবে অর্দ্ধ-গোলাকার খিলানেরও প্রয়োজন হয়েছিলো।' পাঠককে এবার বিচার করে

দেখতে হবে যে, কোন সম্রাট তারা বাঁধবার জন্য প্রচুর কাঠ জোগাড় করার অক্ষমতা নিয়ে কি করে আশা করেন, জীবিতকালে কোন জাঁকালো প্রাসাদ নির্মাণ করে যাবার ?

'সম্রাট জাহাঙ্গীর মারা যান ১৬২৭ সালের ২৭শে অক্টোবর এবং সম্রাট শাজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৬২৮ সালে। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৬৫৭ সালে শাজাহান অসুস্থ হওয়ার পর থেকে সিংহাসনের ওপর কার্যকর কৃতিত্ব হারান এবং তাঁর পুত্রেরা সিংহাসন দখলের জন্য বিদ্রোহী হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন।'

কাজেই, শাজাহানের রাজত্বকালে স্থায়ী হয়েছিলো ২৯ বৎসর সাত মাস মাত্র। এই সময়ের সবটাই অবিরত যুদ্ধ, নিষ্পেষক অভিযান, বিদ্রোহ ও দুর্ভিক্ষে পূর্ণ ছিলো। পাঠক নীচে পাবেন শাজাহানের রাজত্বের সনওয়ারি বিবরণ, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে প্রচলিত এই ধারণাকে যে, সময়টা ছিলো শান্তি ও প্রাচুর্যের যখন প্রত্যেক প্রহরের বিরক্তিকর একঘেয়েমী কাটাতে তিনি আশ্রয় নিতেন নর্মসহচরী ও সমকামী ক্রীতদাসদের এবং যেন মন্ত্রবলে তৈরী করতেন বিরাট সব প্রাসাদ।

মোল্লা আবদুল হামিদের বাদশানামা, ইনায়েত খানের শাজাহাননামা, মোহম্মদ ওয়ারিশের বাদশানামা, মোহম্মদ সালিকম্বুর আমাল-ই সালি ও মোহম্মদ সাদিখানের শাজাহাননামার উদ্ধৃতির যে অনুবাদ Eliott ও Dowson করেছেন তা নিম্নরূপ :—

১। শাজাহান সিংহাসনে আরোহণের অনতিপরেই নরসিংহ দেওয়ের পুত্র জাজহার রাজধানী আগ্রা ছেড়ে তাঁর শক্ত ঘাঁটি উওছা গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। মহব্বতখান খানখানার নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে এক সৈন্যদল পাঠানো হয়।

২। খান জাহানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা কালে ঢোলপুরে এক যুদ্ধ হয়।

৩। রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে নাসিক ও ত্রিম্বক জয় করার জন্য ৮০০০ অশ্বারোহী পাঠানো হয়েছিলো।

৪। সম্রাটের তরফ থেকে যদুরাই. তাঁর পুত্র, নাতি ও আত্মীয়েরা মন্সব পেতের। যদুরাই, তাঁর পুত্রদ্বয় উজলা ও রঘু ও প্রপৌত্র যশবন্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের হত্যা করা হয়।

৫। দেবলগাঁও, বাগলান, সাঙ্গামনার, চাকনোর দুর্গ, ভীর, সেহগাঁও, ধারনগাঁও, চালিসগাঁও ও মাঞ্জরা দুর্গের আশেপাশে নিজামশাই ও খানজাহানের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। মনসুরগর অধিকার করা হয়।

৬। রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে খানজাহান দীপালপুর উজ্জয়িনী ও নবলাই ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁর সৈন্যদলের প্রায় ৪০০ আফগান ও ২০০ বুন্দেলাকে হত্যা করা হয়। ধারুর দুর্গ অধিকার করা হয়।

৭। আহমদনগর ও শোলাপুরের মধবর্তী পারেণ্ডা আক্রমণ করা হয়।

৮। আওরঙ্গাবাদের ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে সিতুন্দা দুর্গ অধিকার করা হয়।

৯। নানদেহ এর ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে ও ধারুর এর ৭২ মাইল পূর্বে কান্দাহার দখল করা হয়।

১০। রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে বিজাপুরের সুলতান আদিলশাহের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হয়।

১১। বুরহানপুরে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর ক্লান্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সম্রাট আগ্রায় ফিরে যান। কেননা আজমখান দাক্ষিণাত্যের শাসন পরিচালনে অক্ষম প্রতিপন্ন হন।

১২। হুগলী দুর্গ দখল করা হয়।

১৩। গালনা দুর্গে আরেকটি অভিযান চালানো হয়।

১৪। রাজত্বের ষষ্ঠবর্ষে মালোয়া উপজাতির নেতা ভগীরথ ভীল বিদ্রোহী হন।

১৫। একই বছরে হিন্দু মন্দির বিনষ্ট করার জন্য অভিযান চালানো হয়।

১৬। দওলাতাবাদ জয় করা হয়।

১৭। কাশিমখান ও কম্ব ৪০০ খৃষ্টানকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। মহিলা সহ সমস্ত বন্দীদের মুসলিম হতে বলা হয়, অন্যথায় উৎপীড়ন ও মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে জানানো হয়।

১৮। রাজত্বের ৭ম বর্ষে শাহজাদা শাহ্‌সুজা পারেণ্ডা দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এর আশেপাশে অনেক সংঘর্ষ হয়।

১৯। জাজহার সিং বুন্দেলা ও তাঁর ছেলে বিক্রমজিৎ বিদ্রোহ করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো প্রধানত ভ.ণ্ডের, উণ্ডচ্ছা ও চৌরাগড় দুর্গকে কেন্দ্র করে। শাজাহানের অন্যান্য অভিযানের মতো এই অভিযানও সৈন্যদলের নিষ্ঠুর অত্যাচারের করুণ কাহিনীতে পূর্ণ।

২০। ঝাঁসি দুর্গ অধিকার করা হয়।

২১। নিজামশাহকে পরাভূত করার জন্য রাজকীয় সৈন্যদল পাঠানো হয়।

২২। রাজত্বের নবম বৎসরে শাজাহান নিজে দক্ষিণে অভিযান পরিচালনা করেন কান্দাহার, নানদেদ, উদগীব, উসা, আহমদনগর, আস্তি, কুনার নাসিক, ত্রিম্বক ও মাসিজ দখলের জন্য।

২৩। খানজাহান ও খানজামান বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। উদগীর, ইন্দাপুর, ভালকি, কল্যাণ, ধারাশিব, মাহুলি ও লোহাগাঁওতে যুদ্ধ হয়। আবদুল হামিদের বাদশানামাতে লিপিবদ্ধ আছে যে, খানজামান বিজাপুর সীমান্ত অতিক্রম করে সমস্ত গ্রাম লুট ও ধ্বংস করেন। মিরাজ ও রাইবাগেও লুটপাট চালানো হয়। আস্কি, চাস্কি, আম্বা, দৌলতাবাদ থেকে ৩৬ মাইল দূরবর্তী পাল্কা প্রভৃতি দুর্গ অধিকার করা হয়।

২৪। রাজত্বের দশমবর্ষে জুনির দুর্গ অধিকার করা হয়। মাহুলি ও মুরানজনের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত দক্ষিণে পশ্চাদ্ধাবনের দ্বারা শাহু ও তরুণ নিজাম শাহকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। তাঁরা আরও বাধ্য হন, জুনীর ত্রিম্বক ত্রিঙ্গলবাদী, হারিশ, জুধান, জুন্দ ও হারশিরা দুর্গ সমর্পণ করতে।

২৫। জ জহারের পুত্র পৃথ্বীরাজ আগেকার হত্যালীলা থেকে অব্যাহতি পান। তাঁর নেতৃত্বে বুন্দেলারা বিদ্রোহী হয়।

২৬। কাশ্মীরের শাসনকর্তা গফংখানকে নির্দেশ দেওয়া হয় তিব্বতের বিরুদ্ধে ৮০:০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী নিয়ে অভিযান চালাতে।

২৭। রাজত্বের একাদশবর্ষে কান্দাহার ও অন্যান্য দুর্গ অধিকার করা হয়।

২৮। পরীক্ষিত শাসিত কুচ হাজু ও লক্ষ্মীনারায়ণ শাসিত কুচবিহার বিদ্রোহী হয়।

২৯। বাগলানা অঞ্চলের নয়টি দুর্গ, ২৪টি পরগণা ও ১০০১ গ্রামের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়।

৩০। রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে চেংগাওয়ের রাজা মাণিক রাজকে পরাভূত করা হয়।

৩১। বৃহৎ তিব্বতের শাসক সাঙ্গি ভেমকাল ক্ষুদ্র তিব্বতের বুরাং দখল করায় তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান পাঠানো হয়।

৩২। রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষে সিস্তান থেকে কান্দাহার আক্রমণের জন্য একদল সৈন্য পাঠানো হয়। বুস্তের নিকটবর্তী ঝাঁসা দুর্গ প্রথমে অধিকৃত হলেও পরে পরিত্যক্ত হয়।

৩৩। জাজহারের পুত্র পৃথ্বীরাজকে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে রাখা হয়।

৩৪। রাজত্বের চতুর্দশবর্ষে বিদ্রোহী গুজরাটে কোলি ও কাঠি আর কাম্বিওয়ারের জামদের শায়েস্তা করার জন্য অভিযান পাঠানো হয়।

৩৫। কাংরার রাজা বাসুর ছেলে জগত সিং সম্রাটের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ পরিচালনা করেন।

৩৬। রাজত্বের পঞ্চদশবর্ষে জগত সিংহের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠানো হয়। মু, নুরপুর ও অন্যান্য দুর্গ অধিকার করা হয়।

৩৭। রাজত্বের সপ্তদশবর্ষে পালামৌ এর রাজার বিরুদ্ধে রাজকীয় সৈন্যদল পাঠানো হয়।

৩৮। রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে সমরখন্দ অভিযানের চাবিকাঠি হিসেবে বলখ ও বাদাক্ষানের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। ৫০০০০ অশ্বারোহী ও ১০০০০ পদাতিক, গোলন্দাজ প্রভৃতি সহ মুরাদ বক্সকে পাঠানো হয়। সম্রাটের নিজেকেই কাবুল যাত্রা করতে হয়। কাহমদ দুর্গ, কান্দাজ ও বলখ অধিকার করা হয়।

৩৯। সাদুল্লা খান অধিকৃত অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করেন।

৪০। আওরঙ্গজেবকে পাঠানো হয়েছিলো অশান্ত অঞ্চলে। শাজাহানের রাজত্বের বিংশবর্ষে তাঁকে নজর মোহম্মদ খানের কাছে বলখ ও বাদাক্ষান সমর্পণ করে পশ্চাৎ পসরণ করতে হয়।

৪১। রাজত্বের দ্বাবিংশবর্ষে পারসীকেরা কন্দাহার অভিযান করে। অধিকৃত অঞ্চল রক্ষার জন্য রাজকীয় সৈন্যদলকে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বুন্দ ও কান্দাহার ছেড়ে দিতে হয়।

৪২। রাজত্বের ত্রয়োবিংশ বৎসরে গজনীর অধিবাসীরা উল্লেখ করেন যে, শাজাহানের সৈন্যদল তাঁদের সমস্ত ফসল বিনষ্ট করেছে আর সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন করে নিয়েছে।

৪৩। রাজত্বের পঞ্চবিংশ বৎসরে অভিযান চালিয়ে তিব্বত জয় করা হয়। কান্দাহার পুনর্দখলের জন্যও এক বিরাট সৈন্যদল পাঠানো হয়।

৪৪। রাজত্বের ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশ বৎসরে কান্দাহার অবরোধ অব্যাহত থাকে।

৪৫। অষ্টবিংশ বৎসরে আলামিকে আদেশ দেওয়া হয় চিতোর দখল করে রাণাকে শায়েস্তা করতে।

৪৬। রাজত্বের উনত্রিংশ বৎসরে গোলকুণ্ডা ও হায়দ্রাবাদ দখলের জন্য অভিযান চালানো হয়।

৪৭। রাজত্বের ত্রিংশ বৎসর শাজাহান পুত্র আওরঙ্গজেবকে নির্দেশ দেন বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে।

৪৮। শাজাহানের দুর্যোগপূর্ণ রাজত্বকালের শেষদিকে রাজা যশোবন্ত সিংহ রাজকীয় সৈন্যদলের এক দুর্দম শত্রু হয়ে দাঁড়ান।

অবিরত যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও লুণ্ঠন উৎপাদনমূলক কাজ একেবারে অচল করে দেয়। উৎপন্ন দ্রব্যের বিনষ্টিও শাজাহানের অসহায় প্রজাদের অসীম দুর্গতির মধ্যে ফেলে দেয়। তাদের কি ধরণের ভয় ও অনাহারের মধ্যে সময় কাটাতে হয়েছিলো তার কিছু নমুনা এখানে রাখা হচ্ছে।

এই বর্ণনা হুবহু নেওয়া হয়েছে শাজাহানের সভায় ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল হামিদ লাহোরির 'বাদশানামা' থেকে।

মোল্লা আবদুল হামিদ এই বর্ণনা শুরু করেছেন প্রথম খণ্ড ৩২৮ পৃষ্ঠায় শাজাহানের রাজত্বকালের চতুর্থ বৎসর অর্থাৎ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে। বিশ্বাস করা হয় যে, ঐ বৎসরেই মমতা দেহরক্ষা করেছিলেন। ৩৬১ পৃষ্ঠায় রাজত্বের ঐ বর্ষের বর্ণনা অব্যাহত রেখে তিনি লিখছেন, 'বর্তমান বৎসরেও সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে কিছুটা এবং দক্ষিণ ও গুজরাটে সম্পূর্ণ অভাব দেখা দিয়েছে। শেষোক্ত এই দুইটি জায়গার লোকেরা অত্যন্ত দুর্দশায় পড়েছে। এক টুকরো রুটির জন্য প্রাণ দিতে চাওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউই তা কিনছে না। একটা কেকের জন্য মর্যাদা বিক্রী করতে চাওয়া হচ্ছে কিন্তু কেউই তা গ্রাহ্য করছে না। প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত জনেরা হাত পাতছে খাদ্যের জন্য, আর যে পা সব সময় সন্তুষ্টির গৌরবে চলতো, আজ তা বাড়াতে হচ্ছে টিকে থাকার রসদের সন্ধানে। দীর্ঘকাল ধরে কুকুরের মাংস বিক্রী হয়েছে ছাগলের মাংস হিসেবে আর মৃতব্যক্তির হাড় গুঁড়ো করে ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রী করা হয়েছে। এগুলো নজরে আসার পর বিক্রেতাদের শাস্তিবিধান করা হয়। হতাশা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, মানুষ পরস্পরকে খাদ্য হিসাবে দেখতে শুরু করে আর পুত্রের ভালবাসার চেয়ে তার মাংসই উপাদেয় হয়ে দাঁড়ায়। অসংখ্য মুমূর্ষু মানুষের ভীড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ থাকে। যারা এত কষ্টেও মরেনি এবং চলাফেরার মতো শক্তি যাদের অবশিষ্ট আছে, তারা অন্যান্য জায়গার শহর ও গ্রামের দিকে চলে গেছে। উর্বরতা ও প্রচুর ফলনের জন্য যে জায়গা বিখ্যাত ছিলো, উৎপাদিকা শক্তির চিহ্নমাত্রও সেখানে দেখা যায় না।......সম্রাট বুরহানপুর, আহমদাবাদ ও সুরাটের সরকারী কর্মচারীদের আদেশ দিলেন সুরুয়া রান্না ও তা বিতরণের ব্যবস্থা করতে।'

সহজেই কল্পনা করা যায়, ছাগমাংসের বদলে কুকুরের মাংস বিক্রী, পিতা-মাতার পুত্রের মাংস ভক্ষণ ও মৃতদেহের হাড় গুঁড়ো করে মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রী করা চলতে থাকাতে কি ধরণের রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিলো।

একমতে ঠিক ১৬৩০ খৃষ্টাব্দেই মমতাজের মৃত্যু হয়েছিলো। বুরহানপুর নামক যে শহরে তিনি মারা যান তা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। ঐ শহরটি যে সে সময় দুর্ভিক্ষ অঞ্চলের মধ্যেই ছিলো তা ওপরে সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে।

এখন পাঠককে ভেবে দেখতে হবে যে, এই রকম এক দুর্যোগময় বছরে সম্রাট কি করে তাঁর মৃতা পত্নীর দেহের স্মারক হিসেবে এক বর্ণাঢ্য অট্টালিকা নির্মাণের আদেশ দিতে পারেন। তাছাড়া, তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বৎসরই যে কেবল দুর্যোগপূর্ণ ছিল তা' নয়। বাদশানামার লেখক ওপরের উদ্ধৃত অংশ

আরম্ভ করছেন 'বর্তমান বৎসরেও' বলে। এতে দেখা যাচ্ছে যে দুর্ভিক্ষ ছিল একটি নিয়মিত ঘটনা। কোন শাসকের সাহস হবে না এই অবস্থায় একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণের। আর, মানুষ যখন মাছির মত মরছে তখন কোথায়ই বা তিনি এই ব্যয়বহুল সৌধ নির্মানের টাকা বা মজুর খুঁজে পাবেন?

ছোটবেলা থেকেই শাজাহানের জীবন ছিল সংঘাতসংকুল। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষে উল্লেখিত তাঁর জীবনের যে বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করেছি, তাতে আমরা দেখিয়েছি যে, রাজকুমার থাকা কালেও শাজাহান তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন দুবার কি তিনবার।

এটাও মনে রাখতে হবে যে, মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনেও বাবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত শাসকদের মধ্যে একমাত্র শাজাহানই তাঁর জীবিত কালে রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন এবং প্রায় ৮ বৎসর নিজ পুত্রের হাতে বন্দী থাকার পর ঐ অবস্থাতেই মারা যান।

শাজাহানের রাজত্বকাল শান্তি ও প্রাচুর্যের দ্বারা অভিষিক্ত হলে তার অসুস্থতার খবরে পুত্র এবং অন্যান্য প্রজারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠতো না। কিন্তু ঐ ধরণের অভূতপূর্ব রাজনৈতিক উত্থান পতন সম্ভবপর হয়ে থাকা এটাই প্রমাণ করে যে, সমস্ত প্রাসাদ ও রাজসভা শুধু অসন্তোষে ধূমায়িত ছিলো। মোহম্মদ কাজিলের আলমগীর নামায় শাজাহানের অকৃতিত্বপূর্ণ রাজত্বের শেষ সম্বন্ধে লেখা আছে '১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সম্রাট পীড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর এই অসুখ অনেককাল স্থায়ী হয়েছিলো এবং প্রতিদিনই তিনি ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছিলেন। ফলে রাজকার্য দেখাশোনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সঙ্গে হিন্দুস্থানের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে দেখা গেলো অশান্তি। অযোগ্য, নীতিবিহীন দারাশেকো নিজেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনে করতে লাগলেন। রাজত্বলাভে তাঁর অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও তিনি লোভের বশবর্তী হয়ে রাজকীয় মহিমাকে খাটো করে আনতে চাইলেন। রাজ্য পরিচালনায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। বেইমান ও বিদ্রোহীরা মাথা উঁচু করলো। স্বচ্ছল ভূস্বামীরা অস্বীকৃত হলো খাজনা দিতে। সবদিকেই বিদ্রোহের বীজ রোপিত হলো। ক্রমে এই অশুভ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছালো যে গুজরাটে মুরাদ বক্স সিংহাসনে বসলেন। বাংলাদেশে সুজাও সেই একই পথ ধরলেন।'

শাজাহানের সময়কে স্বর্ণযুগ বলে যে বলা হয় তা সঠিক হলে তার অসুস্থতার সময় এই চরম বিশৃঙ্খলা ও দেশজুড়ে বিদ্রোহ হতো না। ওপরে আমরা যে পরিচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে প্রমাণ করে যে, শাজাহানের রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্য ছিলো অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা, শান্তি-

মূলক অভিযান দুর্ভিক্ষ, নীতিভ্রষ্টতা, নির্বিচার গণহত্যা আর নৈতিক অসদাচার। সেই কারণেই যখন শোনা গেলো তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর পীড়নমূলক শাসনে ধূমায়িত অসন্তোষ সমস্ত রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ ফেটে পড়লো। তাঁর রাজত্ব যদি ন্যায়পরায়ণ ও হিতকারী হতো তবে তাঁর অসুস্থতার সংবাদ প্রজাদের কাছ থেকে সমবেদনার উদ্রেক করতো। তাতো হয়নি, বরং তাঁর নিজের ছেলেরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছেন। শাজাহানের রাজত্বের বা কুরাজত্বের বিরুদ্ধে এর চাইতে বড়ো অভিযোগ আর কি হতে পারে? ভারতে রাজপুত শাসকদের এইরকম অবস্থা হয়নি, কেননা তাঁরা ছিলেন সু-পিতা, দয়ালু শাসক আর ব্যক্তি হিসাবে মহান।

ওপরের কিছুটা দ্রুত অনুধাবন দেখাচ্ছে যে, ৩০ বৎসর রাজত্বকালে শাজাহান ৪৮ ঘণ্টা অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় খানা অভিযান। মানে দাঁড়াচ্ছে, শাজাহানের পুরো রাজত্বকালটাই চিহ্নিত হয়েছিলো অবিরত যুদ্ধের কাল হিসেবে। এরপর প্রচলিত ইতিহাস কোন যথার্থ্য ছাড়াই বলতে চায় যে। শাজাহানের রাজত্বকাল ছিল স্বর্ণময় ও শান্তিপূর্ণ।

এই ধরনের অবিরাম যুদ্ধ ছাড়াও শাজাহানের অধিকারের নানা জায়গায় প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা যেতো। আর এটাই ভিত্তি ধরে নাড়া দেয় তথ্যগত কিম্বা পারিপার্শিক কোন প্রমাণ ছাড়াই বানানো, দিল্লীর তথাকথিত জুম্মা মসজিদ এবং লালকেল্লা আর আগ্রার তাজমহলের নির্মাণ কৃতিত্ব শাজাহানকে অর্পণের কাহিনী।

তৈমুর লং তাঁর স্মৃতিকথায় পুরানো দিল্লী এবং জুম্মা মসজিদ উভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। শাজাহানের সিংহাসন আরোহণের ২৩০ বছর আগে ১৩৯৮ সালের বড়দিন তৈমুরলং পুরানো দিল্লীতে এসেছিলেন। তৈমুর লং লিখছেন রবিবার দিন আমার গোচরে আনা হলো যে বেশ কিছু সংখ্যক কাফের হিন্দু খাদ্য ও রসদ নিয়ে পুরানো দিল্লীর মসজিদ ই জামিতে সমবেত হয়েছে আত্ম-রক্ষার জন্য।' শাজাহান নাকি জুম্মা মসজিদ বানিয়েছিলেন আর স্থাপন করেছিলেন পুরানো দিল্লী--এই বক্তব্যকে সরাসরি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পক্ষে এটা যথেষ্ট প্রমাণ।

তৈমুর লং স্পষ্টভাবে পুরানো দিল্লীর কেল্লা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন 'দিল্লীর লোকদের বিনাশ করার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আমি শহরের চারপাশে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গেলাম। সিরি একটা গোলাকার শহর, এর বাড়ীগুলো বেশ উঁচু। এর চারপাশে ঘিরে আছে পাথর আর ইঁট দিয়ে তৈরী প্রাচীর এবং এগুলো খুবই মজবুত। সিরির কেল্লা থেকে পুরানো দিল্লীর কেল্লা

অনেকটা দূর। রাস্তায় আছে পাথর আর সিমেন্টের তৈয়ারী বেশ মজবুত দেয়াল। লোক অধ্যুষিত শহরের মাঝখানে জাহাপনা নামক অংশটি অবস্থিত। এই তিনটি শহর ঘিরে থাকা প্রাচীরের আছে ৩০ টি দরজা। সাতটা আছে দক্ষিণ পূবমুখো হয়ে, ছটা আছে উত্তরে পশ্চিমমুখো হয়ে,। সিরিতে আছে সাতটা দরজা, চারটা বাইরে আর তিনটা ভিতরে জাহাঁপনার দিকে। পুরানো দিল্লীর কেল্লায় আছে ১০ টা দরজা, কিছু ভিতরের দিকে মুখ করে আর কিছু শহরের বাইরের দিকে মুখ করে ......শহরের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য আমি একজন কর্মচারীকে নিয়োগ করলাম.... । কাজেই, শাজাহানের ২৩০ বছর আগে, তৈমুর লং বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন পুরনো দিল্লী, এর কেল্লা, শহরের দ্বারসমূহ এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল, অর্থাৎ এখন জুম্মা মসজিদ নামে পরিচিত প্রাসাদের কাছাকাছি জায়গার। এটা বিস্ময়ের যে, এই ধরণের প্রাঞ্জল বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় ইতিহাসের বই উলঙ্গভাবে বলতে চাইছে যে, ওপরের প্রাসাদগুলি আর পুরানো দিল্লীর কেল্লা বানিয়েছিলেন শাজাহান।

Sir H. M. Elliot যাকে মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিহাসের ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি' বলেছেন এটা প্রাঞ্জল প্রমাণ।

যখন পুরানো দিল্লীর স্থাপন এবং পুরানো দিল্লীর কেল্লা এবং জুম্মা মসজিদ নির্মাণের কৃতিত্ব বেঠিক ভাবে দেওয়া হয় শাজাহানকে, আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আগ্রার তাজমহল নির্মাণের গৌরব তাঁকেই দেওয়া হয়ে এসেছে অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাবর তাজমহলে বাস করে গেছেন।

কখনো কখনো ইতিহাসের লোকেরা সরলভাবে জিজ্ঞেস করেন যে, শাজাহানের কয়েক শতাব্দী পূর্বে যদি তাজমহলের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে আগেকার কোন লেখায় এর উল্লেখ নেই কেন? এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর হতে পারে। এক, তাজমহল বর্ত্তমানের মতো সাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য একটা স্মারক সৌধ না হয়ে তখন ছিলো একটা সুরক্ষিত প্রাসাদ, শুধুমাত্র গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই এর ভিতরে প্রবেশ করতেন, তাও নিমন্ত্রিত হয়ে অথবা প্রাসাদটি জয় করে। কাজেই, আমরা আশা করতে পারিনা যে, প্রচার ও সংবাদ প্রেরণের সুবিধা যুক্ত বর্তমান কালের মতো সেকালেও এর সম্বন্ধে বিশদ উল্লেখ থাকবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, প্রাচীন ভারতে হতবুদ্ধিকর বৈচিত্র্যসম্পন্ন প্রাসাদ ও মন্দিরের প্রাচুর্যের জন্য কেবলমাত্র বর্ণনা দিয়ে একটাকে আরেকটার থেকে পৃথক করা যেতো না। যেটুকু আমাদের হাতে এসে পৌছুতো বা দর্শক যা লিখতেন তা হচ্ছে এই যে, এই 'বাড়াগুলো সবই অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী' অথবা 'আশ্চর্যজনক', 'আকর্ষণীয়' ইত্যাদি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ব্রিটিশের শাসনকালে ভারতে ৫৬৮ জন দেশীয় শাসক ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই অধিকারে ছিলো সুন্দর, বিলাসবহুল অট্টালিকা। কোন সাধারণ বর্ণনা দিয়ে কি একটাকে অন্যদের চেয়ে বিশেষভাবে আলাদা করা যায়? এই প্রাসাদগুলিতে যাঁরা গেছেন, তাঁরা কি এই বলবেন না যে, এগুলো সবই বর্ণাঢ্য? সেই রকম মধ্যযুগীয় লেখাতে যদিও ভারতীয় অট্টালিকা ও প্রাসাদের ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়, সমস্যা হচ্ছে, এতকাল পরে কি করে একটাকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। এটাও মনে রাখতে হবে যে, এগুলোর মালিকানা এবং জায়গা ও রাস্তার নাম পরিবর্তিত হতে থাকে প্রতিটি ঐতিহাসিক উত্থানপতনের সময়। ফলে মধ্যযুগীয় ঠিকানা ও ঐতিহ্যসম্পন্ন কোন প্রাসাদকে বর্ত্তমানে চিহ্নিত করাটা কিছু অসুবিধার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একটা কার্যকর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, মুসলিম ইতিহাসে বর্ণিত মথুরার একটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণ মন্দিরের কথায়, মোহম্মদ ঘোরীর মতে যার নির্মাণকাজ ২০০ বছরেও শেষ করা সম্ভব হয়নি। আরেকটি হচ্ছে বিদিশার (বর্ত্তমানে বিলসা) মন্দির, যা নির্মাণে ৩০০ বছর লেগেছিলো। শাজাহানের আগে তাজমহলের কোন উল্লেখ নেই

কেন একথা যাঁরা আমাদের জিজ্ঞেস করেন, আমরা তাঁদেরকে পাল্টা প্রশ্ন রাখতে চাই, কি করে মুসলিম আক্রমণকারীদের আগে মথুরা ও বিদিশায় এই বিরাট মন্দির দুটোর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না? উত্তরটা খুবই সোজা। হয় আগেকার উল্লেখগুলো সব হারিয়ে গেছে অথবা যেহেতু তৎকালীন ভারতে এই ধরণের অনেক মন্দির ছিলো, কেউই বিশেষ করে এই দুটোর উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। এমনকি কোন কোন শহরে শক্তিশালী ও বিত্তশালী ভারতীয় শাসকদের হাতে ছিলো অন্তত ১২টা প্রাসাদ যা সৌন্দর্যে ও নির্মাণ খরচে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কাজেই শুধু লিখিত বর্ণনা থেকে কি করে একটাকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়? নথিপত্র কিছু থাকলে তাতে শুধু রাজার প্রাসাদ এই কথাটাই উল্লেখিত হবে, ঠিক কোনটা তা জানা যাবে না।

কাজেই, আগেকার নথিপত্রে তাজমহল সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার মতো কোন উল্লেখ আশা করার অনৌচিত্যের খুবই ভাল কারণ আছে। সৌভাগ্যবশতঃ, ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং শাজাহানের উর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ বাবর আমাদের তাজমহল সম্বন্ধে সরল ও ভুল না হওয়ার মতো বর্ণনা রেখে গিয়েছেন, যদি আমাদের তা অনুধাবন করার ক্ষমতা থেকে থাকে। তাই, তাজমহল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ আগেকার লেখায় পাওয়া যায় না কেন এই প্রশ্নের আমাদের তৃতীয় উত্তর হচ্ছে এই যে, এই ধরণের প্রাসাদ সম্পর্কে প্রাঞ্জল বিবরণ ঠিকই দেওয়া আছে। শুধু আমরা এর তাৎপর্য বুঝে নিতে অক্ষম, কেননা, প্রথাগত শিক্ষায় আমাদে অনুভূতি ভোঁতা হয়ে আছে।

তাঁর স্মৃতিকথার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯২ পৃষ্ঠায় বাবর লিখেছেন, ১৫২৬ সালের ১০ই মে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে আমি আগ্রায় প্রবেশ করে সুলতান ইব্রাহীমের প্রাসাদে আশ্রয় নিলাম।' পরে ২৫১ পাতায় আবার যোগ করেছেন, '১৫২৬ সালের ১১ই জুলাই ঈদের কিছুদিন পর আমরা এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলাম সুলতান ইব্রাহীমের প্রাসাদের কেন্দ্রস্থলে' গম্বুজের নীচে পাথরের স্তম্ভশোভিত বিরাট কক্ষে।'

এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাবর ইব্রাহীম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে হারিয়ে দিল্লী এবং আগ্রা দখল করে নেন। ফলে তাঁর অধিকারে এসে যায় সেই সব হিন্দু প্রাসাদ, ইব্রাহীম লোদী একজন বিদেশী হিসেবে যা জয় ও অধিকার করেছিলেন। কাজেই, বাবর আগ্রার যে প্রাসাদ দখল করেছিলেন, তাকে ইব্রাহীম লোদীর প্রাসাদ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

বাবর বলছেন যে, প্রাসাদটির চারপাশে ঘিরে ছিলো পাথরের স্তম্ভ। স্পষ্টতই, এটা তাজমহলের ভিত্তির চারকোণায় চারটি সাদা কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভের উল্লেখ মাত্র। তিনি তারপর উল্লেখ করছেন একটা বিরাট কক্ষের, যা স্পষ্টতই

সেই সুন্দর কক্ষটি, যাতে বর্তমান আছে মমতাজ ও শাজাহানের সমাধি। বাবর আরও বলেছেন যে, মধ্যস্থলে ছিলো একটা গম্বুজ। আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় সমাধি প্রকোষ্ঠে একটি গম্বুজ আছে। এটাকে কেন্দ্রে অবস্থিত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, এটা ঘিরে আছে আটটি কক্ষ। কাজেই স্পষ্ট যে, বর্তমানে তাজমহল নামে প্রচলিত প্রাসাদে বাবর ১৫২৬ সালের ১০ই মে থেকে ১৫৩০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর সময় অবধি মাঝে মাঝেই থেকে গেছেন। অর্থাৎ ১৬৩০ সালে তাজের তথাকথিত মহিলা মমতাজের মৃত্যুর অন্তত একশ বছর আগে তাজের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। এই প্রাঞ্জল বর্ণনা সত্ত্বেও আমাদের ইতিহাসে এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত তাজমহলের নির্মাণ কাহিনীতে অন্ধভাবে বলা হয় যে, তাজমহলের উৎপত্তি হয় কবর হিসেবে একখণ্ড খোলা জমিতে পত্নীবিয়োগ শোকাতুর শাজাহানের সান্ত্বনার প্রয়াস হিসেবে।

কাজেই, তাজমহল সম্বন্ধে বাবরের উল্লেখ এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে চতুর্থ সাক্ষাৎ প্রমাণ। প্রথম তিনটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে: (১) শাজাহানের নিযুক্ত ঐতিহাসিকের উল্লেখ যে, তাজমহল ছিলো মানসিংহ ও জয়সিংহের প্রাসাদ। (২) একই ধরণের স্বীকৃতি আছে নুরুল হাসান সিদ্দিকীর 'The city of the Taj' গ্রন্থের ৩১ পাতায়। (৩) 'Travels in India' বইয়ের ১১১ পাতায় Tavernier এর উক্তি যে, সমাধি সৌধের পুরো কাজের খরচের চেয়ে ভারা বাঁধার খরচ বেশী পড়েছিলো। এই বক্তব্যের তাৎপর্য আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শাজাহানের পিতামহের পিতামহ বাবরের অধিকারে ছিলো যে তাজপ্রাসাদ, কিভাবে তা পরিবারের হস্তচ্যুত হয় এবং শাজাহানের রাজত্বকালে জয়সিংহের অধিকারে আসে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, বাবরের পুত্র হুমায়ুন ভারতে বাবরের অধিকৃত সবকিছুই হারিয়ে পলাতক হিসেবে এই দেশ ত্যাগ করেন। ফলে বাবরের মৃত্যুর পরেই অনেক স্থান, শহর ও প্রাসাদ হিন্দুদের হাতে চলে যায়। এর মধ্যেই পড়ে ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা এবং মধ্যমণি তাজমহল। মনে রাখতে হবে যে, বাবরের পৌত্র আকবরকে গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। দিল্লী, আগ্রা এবং ফতেপুর সিক্রী অধিকার করার আগে তাঁকে পানিপথের যুদ্ধে হিন্দু সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করতে হয়। সেই সময়ই জয়পুরের হিন্দু রাজপরিবারের অধিকারে আসে আগ্রার তাজমহল। পরে তারা বাধ্য হন আকবরের হারেমে কন্যাদান করতে। জয়পুর রাজ-পরিবারের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি মানসিংহ ছিলেন আকবরের অধীন সামন্ত নরপতি, তাঁরই অধিকারে ছিলো তাজমহল। আর 'বাদশানামা' অনুসারে

মানসিংহের নাতি জয়সিংহের কাছ থেকে তাজমহল জবরদখল করা হয়েছিলো মমতাজকে কবরস্থ করার জন্য।

Vincent Smith বলছেন যে, 'বাবরের সংঘাতপূর্ণ জীবনের শান্তিময় অবসান ঘটলো আগ্রার উদ্যান প্রাসাদে।' এটাই প্রমাণ করে যে, বাবর তাজমহলেই মারা গেছেন। আগ্রায় তাজমহলই একমাত্র প্রাসাদ, যার দর্শনীয় বাগান ছিলো। বাদশানামাতেও বাগানের উল্লেখ আছে 'সব্জর্মান' অর্থাৎ প্রশস্ত সৌন্দর্যময় বাগান সমন্বিত প্রাসাদ বলে।

ভারতে নবাগত বলে বাবরের পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর দেশের প্রতি একটা আসক্তি ছিলো। কাজেই তিনি কাবুলের কাছে সমাধিস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেই মতো তাঁর দেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরিণতি এই রকম না হলে ভারতস্থিত আত্মসাৎকারী মুসলিম অভ্যাসের বলে তাঁকে হয়তো তাঁর জীবৎকালের আস্তানা তাজমহলেই কবর দেওয়া হতো। তাঁকে ঐ প্রাসাদে কবরস্থ করা হলে, আমাদের ইতিহাস সোচ্চারে প্রচার করতো পিতা বাবরের প্রতি হুমায়ুনের কিম্বদন্তীয় অনুরক্তির কথা, যা নাকি তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিলো বাবরের আশ্চর্য কবর হিসেবে তাজমহল নির্মাণ করাতে।

আবার, তাজমহলের বাইরের চত্বরে যিনি সমাহিত আছেন, শাজাহানের সেই অপর পত্নী শাহারান্দি বেগমের মৃত্যু যদি ১৬৩০ সালেই হতো, মমতাজের বদলে তাঁকেই কবরস্থ করা হতো দখল করা গম্বুজযুক্ত ঐ হিন্দু প্রাসাদের কেন্দ্রীয় কক্ষে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাসে থাকতো মমতাজের পরিবর্তে শাহারান্দি বেগমের প্রতি শাজাহানের আসক্তির মিথ্যা কাহিনী।

কাজেই, সামান্য একটুর জন্য তাজমহল ১৫৩০ সালে বাবরের কবরে পরিণত হতে পারেনি। আবার ঐ একটুর জন্যই ভবিষ্যতে শাহারান্দি বেগমের কবর হিসেবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। ঘটনার মোড় ঐ দিকে ঘুরলে আমাদের ইতিহাস এবং ভ্রমণ পুস্তিকাতে সুবিধাজনক ব্যাখ্যা দেওয়া থাকতো বাবরের প্রতি হুমায়ুনের আসক্তির বা মমতাজের বদলে শাহারান্দি বেগমের প্রতি শাজাহানের উন্মত্ত আকর্ষণের কাহিনীর। এই ধরণের মিথ্যের বেসাতি চলেছে মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত বইতে, তাদের বানানো গল্পকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য।

প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর যে তাজমহলে বাস করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, তার সমর্থন মেলে তাঁর কন্যা গুলবদন বেগমের দ্বারা লিখিত 'হুমায়ুন নামায়', যার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন Annette. S. Beveridge.

এই অনূদিত পুস্তকের ১০৯ ও ১১০ পাতায় গুলবদন বেগম লিখেছেন,

'বাবরের মৃত্যু ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর। ডাক্তাররা দেখতে আসছেন এই বলে আমাদের পিসী ও মায়েদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো......অনেক গোলাপ। তারা আমার মায়েদের ও অন্যান্য বেগমদের নিয়ে গেলো বড় বাড়ীতে।' ১০৯ পাতার এক পাদটীকায় বড় বাড়ীকে প্রাসাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

'মৃত্যু গোপন রাখা হয়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর শনিবার হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন।' ১১০ পাতার এক পাদটীকায় বলা হচ্ছে, 'বর্তমান তাজমহলের উল্টোদিকে নদীর অপর পার্শ্বে রামবাগ বা আরামবাগে বাবরের মৃতদেহ প্রথমে কবরস্থ করা হয়। পরে তা নিয়ে যাওয়া হয় কাবুলে।'

ওপরের পরিচ্ছেদ পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, বাবর তাজমহলেই মারা যান। তাঁর মৃত্যু হয়েছে জানার পর হারেমের মহিলাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বড়বাড়ী নামে পরিচিত এক প্রাসাদে, যা রামবাগ বা আরামবাগ প্রাসাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

পরে হুমায়ুন যাতে তাজমহলেই রাজমুকুট পরতে পারেন সেইজন্য বাবরের মৃতদেহ তাজমহল থেকে সরিয়ে যমুনা নদীর অপর পারে রামবাগ বা আরামবাগ প্রাসাদে কবরস্থ করা হয়। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস যে, আরামবাগ প্রাসাদের বাবরের মৃত্যুর সাথে কিছু সম্পর্ক আছে। এই বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে ওপরে।

পরলোকগত সম্রাট বাবরের পুত্র এবং পরবর্তী সম্রাট হুমায়ুনের ভ্রাতা হিণ্ডালের বিবাহের ভোজসভার প্রস্তুতির বর্ণনা দিতে গিয়ে গুলবদন বেগম লিখছেন, 'এই ভোজের জন্য মণিমুক্তা সমন্বিত যে সিংহাসনটি সম্রাজ্ঞী দিয়েছিলেন, তাকে রাখা হলো রহস্যময় বাড়ীটার সামনের প্রাঙ্গণে। আর সোনা খচিত একটা আচ্ছাদন রাখা হলো এর ওপর, যাতে বসলেন সম্রাট ও তাঁর প্রিয় পত্নী।......

সেই বাড়ীটার আটকোণা কক্ষে রত্নখচিত সিংহাসনটি রাখা হয়েছিলো আর এর ওপরে আর নীচে ঝুলছিলো মুক্তোর ছড়া আর স্বর্ণখচিত নানা আস্তরণ।'

এই রহস্যময় বাড়ীটির আটকোণা কক্ষই তাজমহলের সেই আটকোণা কক্ষ যাতে ১০০ বছর পর শাজাহান মমতাজের কবর নির্মাণ করান, আর ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁর পিতা শাজাহানকে কবরস্থ করেন। তাজমহলকে রহস্যময় বলা হচ্ছে এই কারণে যে সম্ভবত এর উৎপত্তি হয়েছিলো শিব মন্দির হিসেবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিবৃত্তের মিথ্যাচার

মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিবৃত্তের সমীক্ষামূলক তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক Sir H. M. Elliot মন্তব্য করেছেন যে, এগুলো সব উদ্ধত এবং স্বার্থপ্রণোদিত জালিয়াতি'। এই ইতিবৃত্তসমূহের পর্যালোচনা কালে নানা মন্তব্য দ্বারা তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। নীচে আমরা চতুর্থ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কালের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। সাধারণ পাঠক এমন কি ইতিহাসের ছাত্রদেরও অন্ধকারে রাখা হয়েছে এই ইতিবৃত্তসমূহের চূড়ান্ত মিথ্যাচার সম্পর্কে।

মনে রাখতে হবে যে, জাহাঙ্গীর ছিলেন সেই শাজাহানের পিতা, আগ্রার তাজমহল ও ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ সম্পর্কে যাঁর কৃতিত্বকে আমরা এই বইতে চ্যালেঞ্জ করছি।

জাহাঙ্গীরনামা সম্পর্কে Sir Elliot এর মন্তব্য মধ্যযুগীয় অন্যান্য মুসলিম ইতিবৃত্ত সম্পর্কে একই জোরের সঙ্গে খাটে। এগুলো সবই চূড়ান্ত বাড়িয়ে বলা মিথ্যা দাবী, সত্য চাপা দেওয়া আর নগ্ন বেঠিক বিবরণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ, যখন তাঁরা বলছেন যে, মুসলিম শাসকেরা মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ বানিয়েছেন, তাঁরা যা বলতে চাইছেন তা হচ্ছে, মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ মূর্তিকে উৎখাত এবং ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁরা ঐ মন্দিরকেই মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

যখনই মুসলিম ইতিবৃত্তকারেরা দাবী করছেন যে, মুসলিম শাসক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নগর বসিয়েছেন, দুর্গ বানিয়েছেন, রাস্তা ও সেতু তৈরী করেছেন অথবা পুকুর ও কুয়ো খনন করিয়েছেন, তখনই বুঝতে হবে যে, তাঁদের দাবীটা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত। তাঁরা ভারতে এসেছিলেন তৈরী করা প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য ভোগ করতে, পরিশ্রম করে কিছু নির্মাণ করতে নয়। তাছাড়াও, নতুন কোন প্রাসাদ বা উল্লেখযোগ্য কিছু নির্মাণের মতো সময়, অর্থ, ধৈর্য, নিরাপত্তা, সূক্ষ্মরুচি, দক্ষতা বা উপযুক্ত লোক তাঁদের ছিল না। তাঁদের প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ইতিহাসে নিজস্ব স্থাপত্যের ওপর একটাও বই নেই।

ওপরের এই সমস্ত মন্তব্য বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে Sir H. M. Elliot এর জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল সম্পর্কিত ইতিবৃত্তসমূহের পর্যালোচনায়। তিনি

মন্তব্য করছেন,

'কিছু বই আছে যা সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বরচিত স্মৃতিকথা নামে প্রচলিত এবং এদের নামও অনেক বিভ্রান্তির উদ্রেক করে।...এই স্মৃতিকথার দুটো পৃথক সংস্করণ আছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। Major Price একটার অনুবাদ করেন। Anderson অপটির ওপর লেখেন। দেখা যাচ্ছে যে, এই দুটো বইয়েরই আবার নানা বৈচিত্র্যময় সংস্করণ আছে।'

'তারিখ-ই-সলিম-শাহ্' তে কি. ধরণের অতিশয়োক্তি আছে তা বোঝাতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।'

'Major Price এর অনুবাদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে 'সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশের উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসবের জন্য আমি প্রচুর অর্থব্যয়ে পিতা নির্মিত সিংহাসনটিকে অলঙ্কৃত করালাম। এই সিংহাসনটির অলঙ্করণে ব্যয় হয়েছিলো ১০ কোটি আসরফি, যার মধ্যে অর্দ্ধেক খরচ হয়েছিলো মণিমুক্তোর জন্য। এছাড়াও প্রয়োজন হয়েছিলো ভারতীয় ওজনে তিনশো মণ সোনার, যার প্রতি মণ ইরাকী দশমণের সমতুল্য।'

অনুবাদক মণিমুক্তোর মূল্য হিসেবে ধরেছেন ১৫ কোটি পাউণ্ড, খুবই অবিশ্বাস্য অঙ্ক, যা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'তুজাক-ই জাহাঙ্গিরী' তে অনেকটা নম্রভাবে বলা আছে মাত্র ষাট লক্ষ আসরফি আর ভারতীয় ওজনে পঞ্চাশ মণ সোনার কথা। প্রামাণিক স্মৃতিকথাতে সিংহাসনের কোন উল্লেখই নেই।

কিছুটা নীচেই আমরা পড়ি 'আমার আশা আকাঙ্ক্ষার এই সিংহাসনে বসে আমি রাজকীয় মুকুট কাছে আনালাম। এই মুকুট পারস্যের মহান সম্রাটদের মুকুটের অনুসরণে আমার পিতা তৈরী করিয়েছিলেন। সমাগত আত্মীয়দের সম্মুখে আমার রাজত্বকালে সুখ ও স্থায়িত্বের শুভ প্রতীক হিসাবে এই মুকুটটি আমি পুরো একঘণ্টা মাথায় দিয়ে রাখলাম। এই মুকুটের বারটি শীর্ষবিন্দুর প্রত্যেকটিতে ছিলো একটি করে হীরা যার মূল্য পাঁচ মিঠকল (mithkal) পরিমাণের এক লক্ষ আসরফি। সবই আমার বাবা কিনেছিলেন তাঁর রাজ-কোষের অর্থ দিয়ে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থে নয়। মুকুটের ওপরের অংশের কেন্দ্র বিন্দুতে চার mithkal এর একটি মাত্র মুক্তো ছিল, যার দাম এক লক্ষ আসরফি। অন্যান্য অংশে ছিলো এক mithkal এর রুবী পাথর যার মোট সংখ্যা ছিলো দুশো এবং প্রতিটার মূল্য ছিলো ৬০০০ টাকা।...সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার এই মহান প্রতীকের মূল্য হবে ২০ লক্ষ পাউণ্ড।' কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বইতে এবং প্রামাণিক স্মৃতিকথায় এই মূল্যবান মুকুটের কোন উল্লেখ নেই।

পঞ্চম পৃষ্ঠায় জাহাঙ্গীর বলেছেন যে, তিনি খাজনার কিছু উৎস মাপ করে

দিয়েছিলেন, যা থেকে তাঁর পিতা ভারতীয় ওজনে ১৬০০ মণ ও ইরাকীয় ওজনে ১৬০০০ মণ সোনা পেতেন। 'তুজাক' বলছে ৬০ মণ হিন্দুস্থানী ওজনে আর প্রামাণিক স্মৃতিকথায় কোন অঙ্কই উল্লেখিত নেই।'

১৪ পাতায় তিনি বলছেন, 'আগ্রার দুর্গ নির্মাণে মজুরীর খরচ পড়েছিলো ১৮ কোটি আসরফি প্রতিটি পাঁচ mithkal এর।' একে অনুবাদক সপ্রশংসভাবে পরিবর্তিত করেছেন ২৬,৫৫০,০০০ শিলিংএ। তুজাকে উল্লেখিত আছে মাত্র ৩৬ লক্ষ টাকা।...

১৫ পাতায় তিনি বলছেন 'রাজা মানসিংহ নির্মিত যে মন্দির সম্রাট ধূলিসাৎ করেন, ঐ ধ্বংসাবশেষের উপর মসজিদ নির্মিত হয়েছিলো পাঁচ মিঠকালি ৩৬ লক্ষ আসরফির খরচে। অনুবাদক একে বলছেন ৫৪০,০০,০০০ টাকা। 'তুজাক' বলছেন মাত্র ৮,০০,০০০ টাকা।

৩২ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন যে, শাহজাদা পারভেজকে ৫,০০,০০০ টাকা মূল্যের মুক্তোর একছড়া হার তিনি পাঠান। তুজাক বলছেন ১,০০,০০০ টাকা।

২৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন, দৌলতখান তার যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন তার মূল্য ১,২০,০০০,০০০ টাকা।' তুজাক বলছেন মাত্র ৩,০০,০০০ টুমান মুক্তো আর কিছু সোনা।

৩৭ পাতায় তিনি বলছেন, 'তাঁর ভ্রাতা ডানিয়েলের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত মণিমুক্তোর মূল্য ছিলো পাঁচ কোটি আসরফি, অন্যান্য ধনরত্নের পরিমাণ ছিলো ২ কোটি আসরফি, মোট মূল্য ৬৩,০০০,০০০ পাউণ্ড।' তুজাক এই পরিমাণ সম্পর্কে নীরব।

৫১ পাতায় বলছেন, 'হিমুর তাগা খচিত ছিলো হীরে, মুক্তো, রুবী, বৈদূর্যমণি ও পরাগমণির দ্বারা, যার মোট মূল্য ছিলো আটলক্ষ আসরফি বা ৫,৪০০,০০০ পাউণ্ড।' তুজাক বলছেন মাত্র ৮০,০০০ টুমান।

৬৭ পাতায় পুত্র খসরুর অনুসরণের প্রস্তুতির কথায় বলছেন, 'তাঁর আস্তাবলের ৪০,০০০ ঘোড়া আর ১,০০,০০০ উট নিয়ে এসে বিতরণ করা হলো।' তুজাক এই সম্পর্কে কিছুই বলছেন না।

৭৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন 'বাদাকবাসীদের মধ্যে বিতরণের জন্য তিনি জামালবেগকে ১,০০,০০০ আসরফি দিয়েছেন আর হুকুম দিয়েছেন আজমীরের দরবেশদের মধ্যে ৫০,০০০ টাকা বিতরণের। তুজাক শেষের অঙ্কটি বলছেন ৩০,০০০ টাকা আর বাদাকবাসীদের প্রতি দান সম্বন্ধে কিছুই বলছেন না।

৮৮ পাতায় তিনি বলছেন 'খসরুর ধনরত্নের পেটিকায় ছিলো ১৮,০০০,০০০ পাউণ্ড।' শুধু ১৮,০০০ পাউণ্ড রাখতে গেলেই একে যথেষ্ট ভারী আর বড়ো আকারের করতে হতো। তুজাক কিন্তু এই পেটিকার অভ্যন্তরস্থ ধনরত্ন সম্পর্কে

কিছুই বলছেন না।

'অতিশয়োক্তির এই সব দৃষ্টান্তের পর কে বিশ্বাস করবে প্রত্যেকটি জিনিসে সংখ্যা সম্পর্কে বহুগুনিত এই হিসেবকে ?...এ ছাড়াও আরও অনেক সংযোজন ও বিয়োজন আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'খসরুর বিদ্রোহ ও বন্দী হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নানা বিষয়ে অনৈক্য আছে। আর সমস্ত ঘটনার পর জাহাঙ্গীর আগ্রায় না গিয়ে গেলেন কাবুলে। সমস্ত প্রচলিত ইতিহাসে আগ্রার কথাই বলা আছে।

'বাদ দেওয়া অন্যান্য ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, তাঁর পানাসক্তির কোন উল্লেখ তো নেইই বরং তিনি পরম ধার্মিকের ভীতির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন ভ্রাতা ডানিয়েলের অসম্মানজনক পানাসক্তির কথা। কিন্তু বাবরের স্মৃতিকথার মতো যথার্থ স্মৃতিকথায় উল্লেখিত আছে মদ্যপানের নানা কাহিনী ; যে ধরণের অসাধারণ বিচ্যুতির তিনি উল্লেখ করেছেন তা যে কোন উদ্ধত শাসককেও লজ্জা দেবে।'

মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিবৃত্ত যে বর্বর সুলভ বানানো ইতিকথা মাত্র, H M. Elliot এর এই মন্তব্যের সমর্থনে ওপরের অংশগুলো নমুনা হিসাবে দেওয়া হলো। এই প্রসঙ্গে আমরা নিজস্ব কিছু মন্তব্য রাখতে চাই, কেননা এমন অনেক বিষয় আছে, যা Sir Elliot এবং তাঁর মতো আরো অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

মধ্যযুগীয় মুসলীম ইতিবৃত্তের পাঠক এবং মধ্যযুগীয় সৌধের ভ্রমণকারীরা ভালো করবেন, যদি তাঁরা তাঁদের সম্মুখে উত্থাপিত সমস্ত বিবৃতির মূল সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন আর যাচাই করে নেন যে, এগুলো অন্যান্য নিরপেক্ষ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত কিনা বা যুক্তির "ধোপে" টেঁকে কিনা। উদাহরণ স্বরূপ, ওপরের উদ্ধৃতিতেই আছে যে, আগ্রার দুর্গ খুবই প্রাচীন হিন্দু কেল্লা। মুসলিম ইতিবৃত্তে এর পিছনে যে, খরচ দেখানো হয়েছে তা কেবল মেরামতির জন্য। এই খরচ আরও অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে তা কেবল মেরামতির কাজকে তুলে ধরা হয়েছে নির্মাণ হিসেবে। এ ছাড়াও, এই অর্থ সংগৃহীত হয়েছে প্রজাদের উপর বিশেষ কর বসিয়ে, তাদেরকে নিগৃহীত করে বা ক্রীতদাস বানিয়ে।

যেখানে বলা হচ্ছে যে, জাহাঙ্গীর মানসিংহের মন্দির ধূলিসাৎ করে ধ্বংসাবশেষের উপর একটা মসজিদ নির্মাণ করান, পাঠকের যা বোঝা উচিত তা হচ্ছে, মন্দিরের সমস্ত কর্মচারীকে বিতাড়িত বা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে একদল মুসলমান বসানো হয়, যাঁরা মূর্তিকে ফেলে দিয়ে মুসলিমদের প্রার্থনার জন্য মন্দিরটি ব্যবহার শুরু করেন। মূর্তিটি উৎখাত করা, ক্ষতিগ্রস্ত মেঝের

মেরামত আর কয়েকটি মিনার নির্মাণে যা নগণ্য অর্থ খরচ হয়েছিলো, তাকে খুবই ফাঁপানো হয় আর পুরো কাজটাকে দেখানো হয় মসজিদ নির্মাণ হিসাবে। মুসলিম শাসনের সমস্ত পর্যায়ে ভারতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারবার।

এখানে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মানসিংহ ছিলেন জাহাঙ্গীরের নিজের শ্যালক এবং একজন হিন্দু সভাসদ। নিজের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য সামরিক অভিযান তাঁকে পরিচালনা করতে হয়েছিলো ভারতে মুঘল রাজত্ব সুসংহত করার জন্য। এ সত্ত্বেও জাহাঙ্গীরের ধর্মোন্মত্ততা এত বেশী ছিলো যে, তিনি তাঁর একান্ত সমর্থক শ্যালকের নির্মিত মন্দির ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। সম্রাটের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কিত একজন খুবই উচ্চ সভাসদের যদি এই হাল হয়ে থাকে, সহজেই কল্পনা করা যায় অন্যদের দুর্দশার কথা, যাদের ক্ষমতা অর্থ বা রাজকীয় আত্মীয়তার সৌভাগ্য ছিল না।

মুসলিম শাসক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মুকুট, সিংহাসন, দুর্গ প্রাসাদ, কবর এবং অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন বলে যে দাবী করা হয়, তা সবই খোসামুদে মিথ্যে কথা। এগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে চাটুকার লিপিকরদের দ্বারা, যারা সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হয়ে অর্থ উপার্জনের আশা রাখতো।

এসবই হচ্ছে, প্রাক-মুসলিম হিন্দু শাসকদের কাছ থেকে লুঠ করা বা জবর দখল করা। মুসলিম ইতিবৃত্তকারেরা এই সমস্ত লুঠ করা জিনিসের এবং অধিকৃত প্রাসাদ বা শহরের একটা মূল্য ধার্য করেছেন। কিছুটা হয়তো বা বাড়িয়েছেনও। তারপর সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয়ে তা লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে যে, এই সমস্ত মুকুট, সিংহাসন, প্রাসাদ, নগর, সেতু, খাল প্রভৃতির নির্মাতা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক মুসলিম শাসকেরা। এই ধরণের বানানো অত্যুক্তির দৌলতেই আমরা জানি যে, তথাকথিত কুতুবমিনার সম্ভবত বানিয়েছিলেন কুতুবউদ্দীন একা অথবা আলতুৎমিস একা অথবা দুজনে মিলেই তা বানিয়েছিলেন। আর আলাউদ্দীন খিলজী এবং ফিরোজশাহ তুঘলকও আংশিক নির্মাণ করেছিলেন। আবার তাজমহলের খরচ চার লক্ষ থেকে নয় কোটি টাকার যে কোন অঙ্কই হতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মুসলিম বিবৃতির পুরো ভিত্তিটাই বিভ্রান্তিকর। তাজমহলের কাহিনী পুনর্নির্মাণ কালে পাঠকের এই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত।

মনে রাখতে হবে যে, জাহাঙ্গীর হচ্ছেন শাজাহানের পিতা। আমরা আগেই দেখেছি যে, জাহাঙ্গীরকে আখ্যাত করা হয়েছে মিথ্যার জাহাজ হিসেবে। তাঁর ছেলে শাজাহান এ বিষয়ে আরো এককাঠি ওপরে। শাজাহান জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর তিন বছর পর কামগর খানকে নিযুক্ত করেন তাঁর রাজত্বের

একটি জাল ইতিবৃত্ত লেখার জন্য, যাতে যুবরাজ অবস্থায় বিদ্রোহী শাজাহানের সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের নিজের মন্তব্য বাদ পড়ে যায়। এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে Sir H. M. Elliot বলছেন, কামগড়খানকে শেষ পর্যন্ত প্রলুব্ধ করা হয় এই কাজ (জাহাঙ্গীরের রাজত্বের এক ইতিহাস রচনা) হাতে নিতে শাজাহানের প্ররোচনায় তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে।'

জাহাঙ্গীরের লেখায় তাঁর পিতা আকবর সম্পর্কে অনেক প্রশংসার বাণী আছে। জাহাঙ্গীর নিজেকে দেখাতে চাইছেন পিতার প্রতি ভালোবাসায় আপ্লুত অনুগত পুত্র হিসেবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তিনি যে দাবী করছেন যে, পিতার কবর নির্মাণ করেছিলেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি বলছেন যে, পিতার কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি খালিপায়ে হাঁটতেন বা হাঁটতে চাইতেন। এই ধরণের মিথ্যা ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে, নিজের রাজত্বকাল সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের বর্ণনায়। এগুলোকে অবিশ্বস্ত পুত্র ও নিষ্ঠুর শাসক জাহাঙ্গীরের নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবেই ধরে নিতে হবে। আকবর নিজেই বর্ণনা করেছেন কিভাবে জাহাঙ্গীর তাঁর ওপর বিষ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে জাহাঙ্গীর প্রকাশ্যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। আকবরকে বন্দী করতে সমর্থ হলে তিনি তাঁকে অত্যাচারের মাধ্যমে মেরেই ফেলতেন। আর এর পরেও কিনা পুরো জাহাঙ্গীরনামায় লেখকের পরিচয় হচ্ছে একজন বিশ্বস্ত পুত্র হিসেবে।

এই বংশগতি শাজাহান পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন, আর তাকে সম্পূর্ণতাও দিয়েছিলেন। তাঁরও ছিলো বেশ কয়েকজন ভাড়া করা লেখক, যাঁরা তাঁর ইঙ্গিতে মিথ্যা বিবরণ লিখে তাঁকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। সেই কারণেই আমরা দেখি ইতিহাসে অনেক আষাঢ়ে গল্প, যাতে বলা আছে শাজাহান বানিয়েছিলেন আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা ও জুম্মা মসজিদ এবং পুরোনো দিল্লীর শহরটি। ইতিহাসের ছাত্র, পণ্ডিত, যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা পড়ান এবং স্মৃতিসৌধ ভ্রমণকারীদের প্রথাগত মুসলিম ইতিবৃত্তের একবিন্দুও বিশ্বাস করা উচিত নয়, যতক্ষণ না তাঁরা প্রতিটি বক্তব্যকে যুক্তি দ্বারা বিচার করে এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হন বা এর সমর্থনে অন্যান্য নিরপেক্ষ প্রমাণ পান। কাজেই আমাদের খুবই সতর্কভাবে বিচরণ করতে হবে স্বার্থ প্রণোদিত বানানো রূপকথার অরণ্য থেকে তাজমহলের সত্যিকারের ইতিবৃত্ত খুঁজে বের করার কাজে।

ষোড়শ অধ্যায়

তাজের 'মহিলা'

আমাদের বলা হচ্ছে যে, তাজমহলের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে সমাহিত আছেন শাজাহানের প্রিয়তমা মহিষী, অথচ তাঁর সঠিক নাম নিয়েও অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে।

সম্ভবত 'মমতাজমহল' নামটা তার গায়ে এঁটে গিয়েছিলো যখন তাঁকে একটা শ্রেষ্ঠ প্রাসাদে সমাধিস্থ করা হয়, কেনন', তাজমহল কথাটার তাৎপর্য হচ্ছে আলয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কাজেই, মহিলার কাছ থেকে প্রাসাদের নামকরণ হয়েছিলো সাধারণের জানা এই তথ্যটি সত্যি নয়, বরং উল্টোটাই ঠিক; অর্থাৎ যে মহিমময় প্রাসাদে মহিলাটি দ্বিতীয় এবং শেষবারের মতো কবরস্থ হয়েছিলেন, তার নাম থেকেই মহিলার ঐ রকম নামকরণ হয়েছিলো।

আমাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি শাজাহানের নিজের সভালিপি 'বাদশানামা' এতে বলা আছে, '১৭ই জিল্কদ, ১০৪০, হিজরী, ৪০ বৎসর বয়সে নবাব আলিয়া বেগম মারা গেলেন।...তাঁর গর্ভে শাজাহানের আট পুত্র ও ছয় কন্যা হয়েছিলো।'

মওলবী মইনুদ্দীন আহমদ বলছেন যে, তাঁর আসল নাম ছিলো আর্জুমন্দ বানু বেগম।

এখন খোঁজ করে দেখা সঙ্গত, এই তথাকথিত তাজের মহিলা কে ছিলেন, শাজাহানের হারেমে তাঁর কি রকম প্রতিষ্ঠা ছিলো, তাঁর পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন আর শাজাহানের চোখে তাঁর মূল্য কি রকম ছিলো।

আর্জুমন্দ বানু ছিলেন জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যতম শ্বশুর মির্জা গিয়াস বেগের দৌহিত্রী। এখানে এটাও নির্দেশ করা দরকার যে, এই গিয়াস বেগ পারস্য রাজসভায় একজন নগণ্য কর্মচারী ছিলেন। তাঁর সুন্দরী ও প্রভাবশালী কন্যা জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্রী হওয়াতে তাঁকে মুঘল রাজসভায় প্রধানমন্ত্রীত্বে উন্নীত করা হয়। কাজেই জন্মসূত্রে তাঁর দৌহিত্রী আর্জুমন্দ বানু ছিলেন একজন সাধারণ নাগরিক।

আর্জুমন্দ বানুর মায়ের নাম ছিলো দিওয়ানজি বেগম আর বাবা ছিলেন জমিনুদ্দৌলা আসফখান নামেও পরিচিত খাজা আবুল হাসান। মমতাজ

১৫৯৪ সালে জন্মান। ১৬১২ সালে তাঁর বিবাহ হয় শাজাহানের সাথে। তাঁদের বিবাহকালে শাজাহানের বয়স ছিলো ২১ বৎসর। কিন্তু তিনি শাজাহানের প্রথমা পত্নী ছিলেন না। তাঁর প্রথমা পত্নী ছিলেন পারস্যের শাসক শাহ ইসমাইল সফির বংশজাত। শাজাহানের এ ছাড়াও ছিলো অসংখ্য পত্নী ও হাজার হাজার উপপত্নী। মমতাজের সঙ্গে বিবাহের আগেই যে তিনি বিবাহিত ছিলেন কেবল তা নয়, মমতাজের মৃত্যুর পরেও তিনি আবার বিবাহ করেছেন। আর এই সমস্ত বিয়ের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর হারেমে অসংখ্য উপপত্নী যোগাড় করেছিলেন। কাজেই মমতাজকে এতো ভালোবাসতেন শাজাহান যে, তাঁর মৃত্যুর পর বীতস্পৃহ হয়ে স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য এক বিরাট প্রাসাদ বানান—এই প্রচলিত কাহিনী ধোপে টেঁকে না।

প্রচলিত ইতিহাসের বইতে মমতাজের প্রতি শাজাহানের গভীর আসক্তির যে বিষয় ঢক্কানিনাদে প্রচার করা হয়, তৎকালীন ঐতিহাসিক নথিপত্রে কিন্তু তার সমর্থন মেলে না। ৫০০০ মহিলা অধ্যুষিত হারেমের মমতাজ এক নগণ্য অধিবাসিনী ছিলেন। কাজেই তাঁর জন্মসময়, বুরহানপুরে মৃত্যু অথবা সমাধিস্থ করার তারিখ, তাজের বাগানে অথবা গম্বুজের নীচে সমাধিস্থ করার সঠিক সময় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য কোন ঐতিহাসিকই প্রচেষ্টা করেন নি। একথার সমর্থন মেলে নীচের উদ্ধৃতিতে, 'তাজের নির্মাণ শুরু হয় ১৬৩০ সালে বা মমতাজের মৃত্যুর এক বছর পর। সম্মুখদ্বারে খোদিত লিপি অনুসারে নির্মাণ শেষ হয় ১৮ বছর পর ১৬৪৮ সালে, খরচ পড়েছিলো ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।'

ওপরের পরিচ্ছেদটি আগে উদ্ধৃত নানা বিবরণের সঙ্গে মমতাজ ও তাজমহলের সম্পর্কীয় অনেক কিছুতেই মেলে না। এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে, মমতাজ মারা যান ১৬২৯ সালে, অথচ অন্যরা বলছেন যে, তিনি মারা যান ১৬৩০ বা ১৬৩১ সালে। খরচ সম্বন্ধে বর্ণিত অঙ্কটাও সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেননা, এতে কোন সূত্রের উল্লেখ নেই। সম্মুখদ্বারে খোদাই ১০৫৭ হিজরী বা ১৬৪৮ সাল ঐ তাজমহল নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা বোঝাচ্ছে, এটা বিশ্বাস করে লেখক ভুল করেছেন। এতে শুধু এই বোঝা যেতে পারে যে, হিন্দু প্রাসাদে কোরাণের লিপি উৎকীর্ণ করার কাজটা ঐ সময় শেষ হয়েছিলো। এই তারিখ দেখেই অনুমান করা হয়েছে যে, তাজমহল নির্মাণে আঠার বছর লেগেছিলো এবং অবশ্যই এই অনুমান ভ্রান্ত। ১৬৩০ সালে তাজের নির্মাণ শুরু হয় বলে যে ধারণা তা ভুল, কেননা, যতটুকু জানা যায়, ১৬৩১ সাল পর্যন্ত মমতাজ বেঁচে থাকতে পারেন। তার পরেও অন্তত একবছর লাগবে, আলোচনা, নক্সা তৈরী করা, জমিদখল, জিনিসপত্র জোগাড়

করা এবং মজুর জোগাড় করে নির্মাণ শুরু করতে। কাজেই ওপরের বর্ণনাও প্রমাণ করছে যে তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান—ইতিকথার সবটাই মিথ্যা। আঠার বছরের এই দাবীরও বিরোধ ঘটে Tavernier এর উক্তির সঙ্গে যে, তাজের নির্মাণে ২২ বছর লেগেছিলো।

মমতাজের বিয়োগে শাজাহানের প্রচণ্ড শোকাবেগের যে কাহিনী প্রচলিত, তা উল্টোদিকে তর্ক করার এক প্রকৃষ্ট নমুনা এবং অবশ্যই ভ্রান্ত। শাজাহান তাজমহল নামে এক বিখ্যাত কবর বানিয়েছিলেন এই প্রচলিত বিশ্বাস থেকেই উদ্ভট কাহিনীর উদ্ভব। এই মিথ্যাকে সমর্থন ও জোরদার করার জন্য নানা কাহিনীর অবতারণা করা হয়। কিন্তু এই কাহিনীগুলো পরস্পর বিরোধী এবং সংগতিহীন, যা প্রত্যেক মিথ্যারই বৈশিষ্ট্য। এখানে যে কাহিনীটিকে বারবার খোঁচানো হচ্ছে তা হলো, মমতাজের ঐকান্তিক ভালোবাসাই প্রচণ্ড অর্থব্যয়ে তাঁর স্মৃতিতে একটা সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলো। সত্যিই যদি এই আসক্তি থাকতো, তবে ইতিহাসেও তার কিছু উল্লেখ থাকতো। কিন্তু এই ব্যাপারে কোথাও একছত্রও লেখা নেই। মুঘল সভার বিশেষ যে প্রেম-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তা হলো জাহাঙ্গীর ও তাঁর প্রেমিকা নূরজাহানের। শাজাহানের ব্যাপারে প্রথমেই একটা মিথ্যে ধারণা করা হচ্ছে যে, তিনি তাজমহল বানিয়েছেন। তারপর এই ধারণার ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হচ্ছে যে, নিশ্চয়ই তিনি মমতাজের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে থাকবেন। এই জিনিষটাকেই আমরা উল্টো দিকে তর্ক করা বোঝাচ্ছি।

১৬৩০ সালে মমতাজের মৃত্যু হয়। তাঁর ১৮ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি ৮ জন পুত্র ও ৬ জন কন্যা মিলিয়ে মোট ১৪ জন সন্তানের জন্ম দেন। এর মধ্যে ৭ জন তাঁর মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। তার মানে তিনি কোন বছরই গর্ভ ধারণের হাত থেকে রেহাই পান নি। দেখা যাচ্ছে, মমতাজের স্বাস্থ্যের প্রতি শাজাহান কতোটা উদাসীন ছিলেন। ফলে, শেষ সন্তান জন্মের অনতিপরেই মমতাজের মৃত্যু হয়। তাঁর তখন মাত্র ৩৭ বৎসর বয়স হয়েছিলো। বুরহানপুরে তাঁর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর দেহ সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর সম্পর্কে শাজাহানের সত্যিকারের আগ্রহ থাকলে স্ত্রীর প্রথম সমাধির জায়গাতেই তিনি সৌধ নির্মাণ করাতেন। ছয় মাস পর কবর খুঁড়ে মৃতদেহ উত্তোলন করা হয়, যা ইসলাম ধর্ম বিরোধী। পরে ঐ মৃতদেহ আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। বস্তুত, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তাজমহল নির্মাণ করতে যদি ১০ থেকে ২২ বছর লেগে থাকে, তাহলে প্রথম সমাধির জায়গা থেকে সরিয়ে মৃতদেহটি কেন ছয়মাসের মধ্যে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়? এত দ্রুততার কারণ কি ছিলো?

আরেকটি আকর্ষণীয় তথ্য হচ্ছে এই যে, তাজের পরিমণ্ডলে একটি অস্থায়ী কবরে মৃতদেহটি রাখা হয়েছিলো ছয় মাস। তারপর বর্তমান স্থানে তা সমাহিত করা হয়। এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি খুবই বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ২০,০০০ লোক লাগিয়ে শাজাহান যদি ১০ থেকে ২২ বছরে তাজমহল নির্মাণ করিয়ে থাকেন, সহজেই কল্পনা করা যায়, কি পরিমাণ জঞ্জাল জমেছিলো নির্মাণস্থলে। আর সেই সঙ্গে ছিলো অসংখ্য মজুরের আনাগোনা। একটা বিরাট নির্মাণ প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত অসংখ্য লোকের পদতলে পিষ্ট হবার আশঙ্কা আছে, এমন পরিস্থিতিতে কি কোন প্রিয়তমা রানীর মৃতদেহ রাখা যায়?

আমাদের মতে এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, বুরহানপুরে মমতাজের মৃত্যুর পর তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। ছয়মাস পর যখন শাজাহান জয়সিংহের কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক প্রাসাদটি ছিনিয়ে নেবার ফন্দী আঁটলেন, তিনি মমতাজের মৃত্যুকে সুবিধাজনক ভাবে কাজে লাগালেন। তিনি মিষ্টিকথায় অথবা ভয় দেখিয়ে জয়সিংহের ওপর চাপ দিতে লাগলেন, যাতে তিনি এই বিলাসবহুল পৈতৃক বাড়ীটা ছেড়ে দেন। জয়সিংহকে খুব সহজে সম্মত করাতে না পেরে শাজাহান বুরহানপুর থেকে মমতাজের দেহ আনালেন অনেকটা চরম-পত্র হিসেবে। জয়সিংহের পক্ষে আর প্রতিরোধ চালানো সম্ভবপর হলোনা, যখন সম্রাটের কাজে লাগানোর জন্য মৃতদেহটি পাওয়া গেলো, আর সমস্ত মুসলিম অমাত্যেরা সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হয়ে জয়সিংহকে ভয় দেখাতে লাগলেন। তিনি বাধ্য হলেন পৈতৃক প্রাসাদটি শাজাহানকে সমর্পণ করতে।

কয়েক মাসের মধ্যেই এর আটকোণা কক্ষটি খুঁড়ে ফেলা হলো। নীচের তলায় দুটি গর্ত খুঁড়ে মমতাজের দেহ একটিতে রাখা হলো। এর ওপর তলার সিংহাসন কক্ষে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হলো, যার অবস্থান হলো নীচের কবরের ঠিক ওপরেই। নীচের তলায় আরেকটি গর্ত রাখা হয়েছিলো শাজাহানের জন্য। মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে তাঁরটাও নির্মাণ করা হয়েছিলো; ফলে শাজাহানের মৃত্যুর পর ওপরের স্মৃতিস্তম্ভে হাত না লাগিয়ে তাঁকে নীচের তলায় কবরস্থ করা সম্ভব হয়েছিলো। সিংহাসন কক্ষেই স্মৃতিস্তম্ভ দুটি নির্মিত হয়েছিলো যাতে নীচে রাজকীয় মৃতদেহ সমাধিস্থ থাকা অবস্থায় তাদের অসম্মান করে কেউ ওপরের কক্ষ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারেন।

Nicolas Manucci নামে Venice এর এক অধিবাসী শাজাহানের সভা সম্বন্ধে তাঁর বিবরণে বলছেন, 'কোন সন্দেহ নেই যে, মমতাজমহলের জীবিতাবস্থায় পর্তুগীজেরা রাজসভায় এলে তিনি তাদের নিদারুণ অত্যাচারের পর টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার হুকুম দিতেন।—অবশ্য তাদের বেশ উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিলো। অত্যাচার ও মৃত্যুর ভয়ে অথবা শাজাহান দ্বারা কর্ম-

চারীদের মধ্যে বিতরিত স্ত্রীদের উদ্ধারের আশায় অনেকে ধর্মত্যাগ করেছিলো। অবশ্য সবচেয়ে সুন্দরীদের রাখা হয়েছিলো রাজকীয় হারেমের জন্য।'

কাজেই জন্মসূত্রে বা কোন মহৎগুণ, শারীরিক সৌন্দর্য, বিশেষ অনুরাগ বা পদমর্যাদায় (তিনি প্রথমা পত্নী ছিলেন না, নিজের অধিকারে রানীও ছিলেন না) আর্জুমন্দ বানু এমন কোন যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন না, যাতে তাঁর উদ্দেশ্যে কোন অনন্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হতে পারে।

শাজাহান এবং মমতাজ দুজনেই ছিলেন একান্ত কঠোর ও দুষ্টস্বভাবের, বিপথ-চালিত সাধারণকে যা বোঝানো হয়, সেইরকম নমনীয় রোমিও-জুলিয়েটের মতো তাঁদের জোড় ছিলো না।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রাচীন হিন্দু তাজ প্রাসাদ অটুট আছে

যাঁরা শাজাহান দ্বারা তাজমহল নির্মাণের প্রচলিত ধারণার হাত থেকে মুক্ত নন, তাঁরা ওপরে দেওয়া প্রমাণের পরও প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, শাজাহান হয়তো একটা তৈরী করা প্রাসাদ নিয়ে তা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে একটা কবর নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটা কিন্তু মিথ্যে ধারণা। যে তাজমহল আমরা আজকাল দেখি, তা সেই আগেকার প্রাসাদই। শুধু এর বহিরঙ্গে চারটি পরিবর্তন শাজাহান ঘটিয়েছিলেন। প্রথম পরিবর্তনটি হচ্ছে, কেন্দ্রীয় কক্ষের নীচের তলা খুঁড়ে মমতাজকে সেখানে সমাহিত করা হয়, আর তার ওপরে কবরের মতো একটা উচু স্তূপ নির্মাণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিবর্তন ঘটেছিলো ওপরতলার কেন্দ্রীয় কক্ষে. যাতে হিন্দুরা এই প্রাসাদ পুনরায় ব্যবহার করতে না পারেন তাই শাজাহান এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। কেননা, এর ঠিক নীচেই আছে মমতাজের কবর। পরে শাজাহানের মৃত্যু হলে সেই খুঁড়ে রাখা কক্ষে আরেকটা কবর তৈরী করা আর এক ঠিক ওপরের সিংহাসন কক্ষে আরেকটা স্মৃতিস্তম্ভ নিমিত হয়। তৃতীয় পরিবর্তন যা শাজাহান করেছিলেন তা হচ্ছে, ঐ হিন্দু প্রাসাদের দেয়ালে কোরাণের লিপি উৎকীর্ণ করানো। চতুর্থ যা পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছিলেন তা হচ্ছে, নীচের এবং ওপরের তলার অনেক সিঁড়ি ও ঘর তিনি বালি, পাথর আর চুন দিয়ে বন্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত অংশ থেকে পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, শাজাহান তাজমহলের কোন আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাননি। কাজেই, পাঠক ও ভ্রমণকারীদের উচিত তাজমহলকে একটা প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ হিসেবেই দেখা। একে মুসলিম কবর বলে ভ্রম করে দর্শক ও পাঠকেরা তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন কবরের স্তূপ

ও স্মৃতিস্তম্ভের ওপর, প্রাসাদটির বিরাটত্ব, সৌন্দর্য্য ও বর্ণাঢ্যতা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

তাজমহলকে প্রাসাদ হিসেবে ধরলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। ১, এর কেন্দ্রস্থিত আটকোণা মর্মর প্রাসাদ। এতে অন্ততপক্ষে চারটি তলা আছে। এর কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে বর্তমানে দুটি কবর আছে। এর ওপর-তলার কেন্দ্রীয় কক্ষে ছিলো শাজাহান কর্তৃক লুন্ঠিত ময়ূর সিংহাসন, বর্তমানে আছে দুটি স্মৃতিস্তম্ভ। দর্শকেরা তাড়াহুড়োতে ভুলে যান, এই কেন্দ্রীয় আটকোণা কক্ষকে ঘিরে থাকা বারোটি ঘর দেখতে। এই মর্মর প্রাসাদের মধ্যেই একেবারে নীচুতলায় ১১টি ঘর, একতলায় ১১টি ঘর এবং সম্ভবত দোতলায় ১০টি ঘর আছে, কেননা গম্বুজটা এই কেন্দ্রীয় কক্ষেরই ওপরে অবস্থিত। কাজেই, এই মর্মর প্রাসাদের তিনতলা মিলিয়ে মোট ৩২টি ঘর থাকার কথা। এটা বড় প্রাসাদের অঙ্গ, দর্শকদের অনুমিত এক কক্ষবিশিষ্ট কবর নয়। চতুর্থত, ফাঁপা মর্মর গম্বুজের অভ্যন্তরে একটি হলঘর আছে।

২. তাজমহলের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর ডান ও বামপাশে দুটি অট্টালিকা। এদের একটাকে আজকাল ভুল করে মসজিদ বলা হয়। অপরটি নাকি এরই অপ্রয়োজনীয় দোসর বা 'জবাব'। প্রকৃতপক্ষে এই দুটো হচ্ছে রক্ষীদের শিবির ও অতিথিশালা।

৩. এই মর্মর প্রাসাদের চারপাশে আছে এক বিরাট লালপাথর বিছানো চত্বর। এর নীচেই আছে এক প্রকাণ্ড ভবন, অনেক কক্ষ নিয়ে। জনসাধারণের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে অনুরোধ করা উচিত, যাতে এই নীচের তলার কক্ষগুলি উন্মুক্ত করে দেখানো হয়। এটা খুবই সম্ভব যে, মাটি আর বালিতে ভর্তি এই ঘরগুলোতে ধনরত্ন বা মূর্তি বা হিন্দু উৎসের অন্য কোন প্রমাণ থাকতে পারে। দর্শকদের ওপর নামমাত্র কর বসিয়ে যে অর্থ আদায় করা যাবে, তাতেই এই নীচের তলা পরিষ্কৃত করে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ উঠে যাবে।

৪. মর্মর প্রাসাদের ভিত্তির চারকোণে আছে চারটি স্তম্ভ, যা রাত্রিকালে আলোকিত হয়ে প্রাসাদটিকে উজ্জ্বল কাঠামোয় বেঁধে রাখতো। প্রত্যেকটি স্তম্ভের ভিতরে আছে একটি ঘোরানো সিঁড়ি যা একেবারে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাজমহল ভ্রমণকরারীরা প্রায়ই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ভিত্তির

চারকোণে এই চারটি মর্মর স্তম্ভের উৎপত্তি মুসলিম ধারণা অনুযায়ী। আমরা তাঁদের বলতে চাই যে, ঐশ্লামিক হওয়া তো দূরস্থান, এই স্তম্ভগুলো উল্লেখযোগ্য হিন্দু রীতির। এর সমর্থনে আমরা উদ্ধৃত করছি Keene-এর Handbook-এর ১৫২ পাতার এক পাদটীকা। এতে বলা আছে, 'Cunningham হুমায়ুনের কবর সম্বন্ধে লিখছেন, যে, এই কবরে আমরা প্রথম দেখি মূল প্রাসাদের চারকোণ সংলগ্ন চারটি স্তম্ভকে। এগুলো উত্তর ভারতের মুসলিম স্থাপত্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন, যার উন্নত ও পরিমার্জিত রূপ দেখা যায় তাজমহলের মহিমময় স্তম্ভে'।

ওপরের পরিচ্ছেদে পরিষ্কার বলা আছে যে, হুমায়ুনের কবরের চারকোণ সংলগ্ন স্তম্ভ ও তাজমহলের ভিত্তিকোণে স্থাপিত স্তম্ভ অনৈশ্লামিক সংযোজন। অন্য কথায় তাদের উৎপত্তির উৎস হিন্দুরা। এর সমর্থন সহজেই পাওয়া যায়, কেননা, সত্যনারায়ণ পূজার বেদীর চারপাশে হিন্দুরা চারটি কলাগাছের স্তম্ভ রাখেন, আবার বিবাহের বেদীর চারপাশেও ঐ ধরণের স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

পাদটীকাটি Keene, Cunningham, Percy Brown, Fergusson প্রভৃতি পশ্চিমী পণ্ডিতদের চিন্তাধারার ত্রুটিটুকুও তুলে ধরে। তথাকথিত মসজিদ ও কবরের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, এগুলো সবই হিন্দু রীতি অনুযায়ী নির্মিত। এ সত্ত্বেও তাঁরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন যে, এগুলো তৈরী করিয়েছেন মুসলিমরা। আগ্রার তাজমহল, আওরঙ্গাবাদের 'বিবি-কি মকবরা' আর বিজাপুরের গোলগম্বুজ দর্শনেচ্ছুরা যেন মনে রাখেন যে, এগুলো সবই আত্মসাৎ করা হিন্দু প্রাসাদ। কাজেই, চতুষ্কোণের চারটি স্তম্ভ মুসলিম রীতির বৈশিষ্ট্য, এই ধারণা যেন তাঁরা মন থেকে মুছে ফেলেন। রাজস্থানের পিলানী শহরে সাধারণের জন্য নির্মিত প্রত্যেকটি ভিত্তির চারকোণে আছে চারটি স্তম্ভ। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী, ইতিহাসের শিক্ষক, ভ্রমণকারী ও সরকারী পরিদর্শকেরা মনে হয় Cunningham-এর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যদিও তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা হয়।

৫. মর্মরচত্বর এবং তার সম্মুখের বাগানকে ঘিরে আছে একটা লালপাথরের দেয়াল। তাজমহলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে এই লালপাথরের

দেয়ালের বাঁদিকে পড়ে একটা বহুতল বিশিষ্ট কূপ, যার প্রত্যেক তলাতেই কয়েকটি করে কক্ষ আছে। পশ্চাৎভাগে অবস্থিত যমুনা পর্যন্ত কাটা খালের জলে এই কূপটি ভর্তি হতো। কূপটির কক্ষগুলো ব্যবহৃত হতো প্রাসাদের ধনরত্ন রাখার কাজে। শত্রু অতর্কিতে প্রাসাদ দখল করলে এই ব্যবস্থায় সহজেই ধনরত্ন কূপে ফেলে দেওয়া যেতো। স্বাভাবিক সময়ে ধনরত্ন ঐভাবে রাখার জন্য চোর ডাকাতের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতো, কেননা কূপের কাছেই আছে তাজমহল থেকে আগ্রা দুর্গে যাবার মাটির নীচের সুড়ঙ্গ পথ। কবরের জন্য এই ধরণের সুড়ঙ্গপথের দরকার হয় না, অথচ প্রাসাদের পক্ষে এটা আবশ্যক।

৬. ঐ মর্মরচত্বরের উল্টোদিকে লালপাথরের দেয়ালে সংলগ্ন আছে লম্বা বাঁকানো সরুপথ।

৭. বাগানের মুখ্য প্রবেশ পথের উল্টোদিক থেকে তাজমহলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে দেখা যায়, ঐ লালপাথরের দেওয়ালে ডানদিকে বেশ কিছু চতুষ্কোণ কক্ষ।

৮. বাগানের বাইরে আছে এক চতুষ্কোণ বাড়ী, যাতে আছে অনেক বাঁকানো সরুপথ আর কক্ষ। ওই বাড়ীটি ছিলো, অনেক সাঙ্গপাঙ্গ আর সেনাদল নিয়ে সমাগত রাজকীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা কক্ষ। এই চতুষ্কোণ বাড়ীতেই সভাসদ, রাজপুত্র এবং শাসকদের অনুগামী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতো, যাতে মহামান্য ব্যক্তিটি তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করে প্রকাণ্ড বাগানের প্রবেশ পথ দিয়ে মর্মরের তাজ প্রাসাদে সসম্মানে উপনীত হতে পারেন।

৯. ঐ লালপাথরের দেয়ালের বাইরে আছে অনেক আনুষঙ্গিক কক্ষ, সহকারী এবং সমাগত রাজপুত্র ও শাসকদের নিকটাত্মীয়দের থাকার জন্য।

১০. মর্মরের তাজের পিছনে আছে এক প্রকাণ্ড লালপাথরের বহুতল বিশিষ্ট স্তম্ভ, যার প্রত্যেক তলাতে অনেকগুলি করে ঘর আছে। নর্দমার জল আজকাল এই স্তম্ভের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, যার ফলে কিছুকাল পরেই এর ভিত্তির ক্ষয়সাধনের আশঙ্কা আছে।

১১. বাগানের বাইরের লালপাথরের চতুষ্কোণ চত্বরে আছে, শতশত ঘর ও আস্তাবল, পদাতিক এবং অশ্বারোহীদের জন্য।

১২. এই প্রাসাদ সমুচ্চয়ের বাইরে আছে সুনির্মিত সারি বাঁধা দোকান ঘর যাকে Tavernier উল্লেখ করেছেন তাসিমকান হিসেবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রাসাদের সব বৈশিষ্ট্যই তাজমহলের আছে

প্রাসাদের আয়তন ও অন্যান্য সব বৈশিষ্ট্যই তাজমহলের আছে। এর অসংখ্য দরজায় আছে ফলা লাগানো কপাট, পুরো প্রাসাদ পরিমণ্ডলে আছে তিনশো থেকে চারশো ঘর, একটা বহুতল বিশিষ্ট কূপ এবং প্রমোদ শিবির।

তাজমহলের মহান প্রবেশপথের দুপাশে আছে বাঁকানো লালপাথরের পথ, যা রাজপুত হিন্দু রাজকীয় প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের বাঁকানো সরু পথ আছে বাইরের বাগানেরও চত্বরের চার দিকে। সব মিলিয়ে এগুলোতে শত শত কক্ষ আছে, যাতে প্রাসাদের কর্মচারী ও পোষা জানোয়ারদের থাকার ব্যবস্থা ছিলো। মুসলিম কাহিনীতে এগুলিকে জিলোখানা বা প্রমোদভবন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার অসঙ্গতি নামের মধ্যেই স্পষ্ট। শাজাহানের মতো নিষ্ঠুর ও অহঙ্কারী শাসক কি রাজী হবেন সাধারণের প্রমোদের জন্যে বিশেষ ভবন বানাতে সেই কবরের ওপর, যেখানে জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি ১৬৩০—১৬৬৬ সালের প্রতিদিন অশ্রুমোচন করেছেন? রাজস্থানের সকল প্রাচীন নগর ও প্রাসাদে এই ধরণের মহান প্রবেশপথ এখনো দেখা যায়।

প্রাসাদের পিছনেই ছিলো একটা সুনির্মিত নুড়ি বিছানো নদীর ঘাট। এর কিছুটা অংশ এখনো টিঁকে আছে। বর্তমানে বন্ধ তাজমহলের পশ্চাতের দরজা দিয়ে সেকালে রাজপরিবার নদীতে স্নান এবং নৌবিহার করতে যেতেন।

তাজমহল প্রাসাদ পরিমণ্ডলের অন্যতম হচ্ছে নক্করখানা বা বাদন-প্রাসাদ। চিতোর গোয়ালিয়র বা আমেরের বাদন-প্রাসাদের মতো এটিও সম্পূর্ণ রাজপুত রীতিতে নির্মিত। মুসলিম উপাসনার জায়গায় কোন ধরণের বাজনা বাজানো

কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাছাড়াও, পরলোকগত আত্মার আশ্রয় কবরস্থানে কোন বাদনের জায়গা নির্মাণের পরিকল্পনাই হাতে নেওয়া হয় না। কিন্তু হিন্দু প্রাসাদে নহবৎখানা অপরিহার্য। বাদ্য ও সানাইয়ের তান ব্যবহার করা হতো প্রভাতের আহ্বানে, রাজকীয় আগমন ও প্রস্থানের সংবাদ ঘোষণায়, অতিথির অভ্যর্থনায়, উৎসবের নির্দেশনায় আর রাজকীয় ঘোষণা শ্রবণের নিমিত্ত জনতাকে আহ্বানের কাজে।

আমরা আগেই Encyclopaedia Britannica থেকে এই মর্মে উদ্ধৃতি দিয়েছি, 'দক্ষিণ পরিবেষ্টনীর বাইরে আছে কিছু আনুষঙ্গিক বাড়ী যথা, আস্তাবল, রক্ষীগৃহ এবং বাহির মহল।'

Tavernier'ও বলেছেন 'তাসিমকান (তাজি-ই-মকান অর্থাৎ আলয়ের মুকুট) হচ্ছে এক বৃহৎ বাজার, যাতে আছে ছটি বিরাট চত্বর; প্রত্যেকটি ঘেরা রয়েছে ঢাকা বারান্দা দিয়ে, যাতে আছে বণিকদের ব্যবহারের জন্য কক্ষ।'

এই সমস্ত বাড়ীর ওপরে আছে বিরাট সমতল ছাদ আর দরদালান। তাজমহলকে প্রাসাদ হিসেবে বুঝতে পারলে দর্শকেরা কবর ও স্মৃতিস্তম্ভের দিকে দ্রুত নজর বুলিয়েই ক্ষান্ত রইবেন না। তাঁরা সঠিকভাবেই চাইবেন করিডরের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে, খোলাছাদ আর একেবারে নীচুতলায় যেতে। তাই সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মচারী, ইতিহাসের শিক্ষক ও ছাত্র এবং সাধারণ দর্শকদের সঠিকভাবে নির্দেশ দিতে হবে, যাতে তাঁরা তাজমহলকে হিন্দু প্রাসাদ হিসেবেই দেখেন। তাজের রাজকীয় সৌন্দর্য ও মহিমার পূর্ণ উপলব্ধি করতে ঠিক তখনই তাঁরা সমর্থ হবেন।

তাজমহলের সন্নিহিত অঞ্চল জয়সিংহপুরা ও খাসপুরায় অসংখ্য বাড়ী ছিলো। তাজমহলের সন্নিহিত অঞ্চলে ছিলো অসংখ্য বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী, যাতে থাকতো রক্ষী, সৈন্যদল, পাচক, ভৃত্য, পরিবেশনকারী ও রাজকীয় সেবায় নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরা। কাজেই সেখানে ছিলো একটি বাজার, সরাইখানা, অতিথিশালা, আর এরা পরস্পর যুক্ত ছিলো নানা রাস্তার মাধ্যমে।

তাজমহলের পরিসর এবং এর সাজসজ্জা ছিলো একটি বৈভবশালী প্রাসাদের অনুরূপ, বিষণ্ণ কবরের নয়। এই বক্তব্যের সমর্থনে আমরা মওলবী মইনুদ্দীনের বই থেকে উদ্ধৃত করছি।

জাঁকালো দরজার সম্মুখেই আছে একটি প্রশস্ত উন্নত মঞ্চ, লম্বায় ২১১½ ফিট আর প্রস্থে ৮৬½ ফিট। ...চারদেয়াল দিয়ে ঘেরা চতুষ্কোণ জায়গাটির উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১৮৬০ ফিট আর পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ ১০০০ ফিট। মোট আয়তন হচ্ছে ২,০৭,০০০ বর্গগজ বা ৪২ একরেরও কিছু বেশী। দরজার উচ্চতা ১০০ ফিট।

দরজার প্রস্থ ১০½ ফিট। দরজাটা নির্মিত হয়েছে আটরকমের ধাতুর মিশ্রণে আর পিতলের পেরেকে এর সর্বাঙ্গ খচিত। ভিতরের আয়তন হচ্ছে একটি অসম অষ্টকোণের, যার কর্ণের দৈর্ঘ্য ৪১½ ফিট।'

এখানে আমরা লক্ষ্য করতে বলতে চাই যে, বিশেষভাবে এই অষ্টকোণ হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু রীতির আকৃতি। হিন্দু গৃহের প্রবেশপথে প্রায়ই পাথরের গুঁড়োতে অষ্টকোণের নকসা আঁকা থাকে। আগেকার আমলের হাতপাখাও ছিলো অষ্ট কোণ বিশিষ্ট। দেয়ালী উৎসবের সময় যে কাগজের লণ্ঠন ঝোলানো হয় তাও আটকোণা।

বিশেষ ধাতু মিশ্রণ ও তা দিয়ে দ্রব্য নির্মাণ জানতেন হিন্দু কামাররা। এর প্রমাণ আছে দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ, 'ধারের' স্তম্ভদণ্ড এবং অন্যান্য নানা জিনিষে।

ফকির ও দরিদ্রদের কাছে কবর ২৪ ঘণ্টাই উন্মুক্ত করে রাখা হয়। কাজেই, পেরেক আঁটা কোনো দরজার প্রয়োজন হয় না। প্রাসাদ অথবা দুর্গের দরজা-তেই লাগানো থাকে পালিশ করা পিতলের পেরেক, যা সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে দরজাটিকে মজবুত করে।

মওলবী আরো বলছেন :

'১৭টি সিঁড়ি পেরিয়ে দ্বিতীয় তালায় যাওয়া যায়। আরো ১৭টি সিঁড়ি উঠলে আমরা পাই তৃতীয় তলা, যেখানে চারটি কক্ষ আছে। একটা ঢাকা পথের মাধ্যমে এই পথগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই তালার একপাশে আছে অষ্টকোণবিশিষ্ট কিছু ঘর, যার প্রত্যেকটিতেই আছে চারটি করে দরজা। একটা দরজা গিয়েছে ওপরে ওঠার সিঁড়ি পর্যন্ত।

চারটি সিঁড়ির মধ্যে দুটো চলে গেছে একতলা পর্যন্ত। বাকীদুটো মাঝ-পথেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণপশ্চিম কোণের ঘরগুলিতে আছে একটা করে পথ, কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরগুলিতে সিঁড়িগুলো মাঝপথেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঘরগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে একটা ঢাকা পথ। প্রত্যেকটি পথেরই একটা করে শাখা গেছে সিঁড়ি পর্যন্ত।

৩৪টি সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা সর্বোচ্চ তলায় গিয়ে পৌছুতে পারি। এখানে চারকোণে আছে প্রত্যেকটি আট দরজা বিশিষ্ট চারটি স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় আছে গম্বুজ যার ওপরে আছে পিতলের কলস।

শেষের এই 'কলস' কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। তাজ সম্পর্কে মওলবী মইনুদ্দীনের বর্ণনায় এ কথাটা অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। কথাটা নেওয়া হয়েছে সংস্কৃত থেকে। তাজমহলে, বিশেষ করে তাজমহল সম্পর্কে মুসলিম বর্ণনায় এই কথাটা পাওয়া যেতো না, যদি না মুসলিম-পূর্ব রাজপুত ঐতিহ্যে কথাটার ব্যবহার থাকতো। 'কলস' বোঝাচ্ছে সাধারণত পিতল কিংবা সোনার একটা উজ্জ্বল চূড়া। এই 'কলস' কথাটার পৌনঃপুনিক ব্যবহার এটাই প্রমাণ করছে যে, এই বাড়ীটি একটি প্রাক্-মুসলিম যুগের প্রাসাদ। 'কলস' ব্যবহৃত হয় অত্যুচ্চ মহিমময় মন্দির, প্রাসাদ অথবা এই ধরণের অন্যান্য সৌধের জন্য।

এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, এই গম্বুজের চারপাশে যে চারটি ভিতরকার ছাদ আছে, তার আকৃতি পুরোপুরি রাজপুতীয়। তাজমহলের উন্মুক্ত বারান্দার চারকোণে চারটি স্তম্ভের উপরে যে গম্বুজ আছে তার আকৃতিও পুরোপুরি রাজ-পুত নক্সা অনুযায়ী।

জিজ্ঞেস করা হতে পারে যে, গম্বুজের ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? গম্বুজ মুসলিমদের আবিষ্কার বলে যে অনুমান করা হয় তার কোন ভিত্তি নেই। গম্বুজকে মুসলিম সৃষ্টি বলার অর্থ একে পয়গম্বর মোহম্মদের জন্মের সঙ্গে কোনমতে জড়িয়ে রাখা। কি সম্পর্ক থাকতে পারে স্থাপত্যের একটি রীতি হিসাবে গম্বুজের উদ্ভবের আর ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির?

তাজমলের ক্ষেত্রে আমরা সম্রাট বাবর, শাজাহানের রাজত্বকালের সরকারী ভাষ্য বাদশানামা, আর বিখ্যাত ইংরেজ স্থপতি Havell এর উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছি যে, গম্বুজ হচ্ছে হিন্দু নির্মাণ রীতিরই অঙ্গ। ইসলামের বর্তমান কেন্দ্রপীঠ কাবায় কোন গম্বুজ নেই।

কেবলমাত্র হিন্দুদের আটটি দিকের জন্য দেওয়া বিভিন্ন নাম আছে। যেমন পূর্ব পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং অপর চারটি, দুটো দিকের মধ্যে একটি করে কোণের, যেমন অগ্নি, বায়ু, ঈশান ও নৈঋত। এইগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাজমহলের মতো হিন্দু প্রাসাদ এবং মন্দির সব অষ্টকোণ করে নির্মিত হয়েছে।

নীচে তলায় রাজকীয় সমাধিদ্বয়ের পিছনে .৪টি কক্ষের কথা বলতে গিয়ে মওলবী মইনুদ্দীন বলছেন, 'শেষ দুটো ঘরের বায়ুরন্ধ্র দিয়ে শান্ত নদীটি দেখা যায়।......এই ছিদ্রগুলোর জন্যই দীর্ঘকাল লুক্কায়িত কক্ষের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সিঁড়ির মুখগুলো পাথরের খণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। মাটির নীচের ঘরগুলো কেন নির্মিত হয়েছিলো তার কারণ খুঁজে বের করা শক্ত।'

স্মৃতিসৌধে এই মাটির নীচের ঘরগুলির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা মওলবীর মতো একজন মুসলিমের পক্ষেও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর এটি দেখাচ্ছে যে, তাজমহল সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী অসংলগ্ন প্রলাপ মাত্র। প্রাসাদে মাটির নীচের ঘর নানা প্রয়োজনে লাগানোর পক্ষে অপরিহার্যও বটে। প্রাসাদের এই সমস্ত ঘর ব্যবহৃত হয় ধনরত্ন রাখা, বন্ধুদের লুকিয়ে রাখা, বন্দী করে রাখা এবং গোপনে আলোচনার স্থল হিসেবে। স্মৃতিসৌধের নীচের তলার কবরের পাশে কোন ঘরের প্রয়োজন থাকতে পারে না।

এই কক্ষগুলিকে বালি দিয়ে ভর্তি করে ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলা হয়। এতেই প্রমাণ হয় যে, প্রাসাদটিকে কবরে পরিবর্ত্তিত করার পর রক্ষী বা দর্শকেরা এই ঘরগুলিকে বসবাসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, শাজাহান তা চাননি। কাজেই প্রাক্তন প্রাসাদের সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ঘরগুলি বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয়।

ঐ একই পৃষ্ঠায় লেখক মওলবী মইনুদ্দীন আরো লিখেছেন, 'মাটিতে জমে থাকা সম্ভবত যমুনার বালি থেকে এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে, ঐখানে একটা ঘাট বা নৌকা ভেড়াবার জায়গা ছিলো, যা পরে কোন কারণে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে। এগুলি নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনো রহস্য হয়েই রয়েছে।.....'

তাজমহলকে কবর হিসেবে উদ্ভূত হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে যাঁরা বিচার করতে যান, এই ধরণের আরো অনেক বিষয়ই তাঁদের কাছে রহস্য মনে হবে। সমস্ত রহস্যই পরিষ্কার হয়ে সুসংহত বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, যখন বুঝতে

পারি যে, তাজমহল উদ্ভূত হয়েছিলো রাজপুত প্রাসাদ হিসেবে, কবর হিসেবে একে রূপান্তরিত করার চিন্তা শাজাহানের মাথায় আসার কয়েক শতাব্দী পূর্বে।

৩৮ পৃষ্ঠায় মওলবী বলছেন, 'এই কক্ষগুলির পশ্চিমে আছে একটি মসজিদ, যাতে ৫৩৯ জন লোকের প্রার্থনা করার জায়গা আছে।' আমরা অবাক হয়ে ভাবি যে, এই ৫৩৯টি সংখ্যাটির আদৌ কোন তাৎপর্য আছে কিনা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, প্রাসাদের সিংহাসন কক্ষের পার্শ্ববর্তী রক্ষীগৃহকেই বর্তমানে মসজিদ বলে দেখানো হচ্ছে। এটা মসজিদ হলে এতে একটা সুসমঞ্জস অঙ্কের যথা ১০০০ বা ১০০০০ লোকের প্রার্থনার জায়গা থাকতো, বেখাপ্পা ৫৩৯ জনের নয়।

তাজমহলের উন্মুক্ত বারান্দায় চারকোণে মর্মরস্তম্ভের ব্যবহার হতো প্রহরার নিমিত্ত, আলোকস্তম্ভ হিসেবেও এগুলো ব্যবহৃত হতো। রাত্রিবেলা উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত প্রাসাদটিকে বেষ্টন করে থাকতো এই সমস্ত স্তম্ভ, তাদের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ঊর্দ্ধ আকাশে প্রসারিত করে।

ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্য মতবাদের অনুসরণকারীরা মনে হয় জানেন না যে, মাটি অথবা ভিত্তি থেকে যে সমস্ত স্তম্ভ শুরু হয় ইটের ভাঁটার চিমনীর মতো, তা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের এক বৈশিষ্ট্য। সারাসেনীয় মিনার শুরু হয় প্রাসাদের কাঁধ থেকে, যেমন মসজিদে দেখা যায়। সাধারণত এই সমস্ত চূড়া ফাঁপা হয় না বা এর ভিতরে সিঁড়ি থাকে না। অন্যান্য বৃহদায়তন প্রমাণের মধ্যে এটাও অন্যতম, যা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রচলিত মুসলিম দাবীকে যে, তথা-কথিত কুতুবমিনার এবং তাজমহলের চারটি স্তম্ভ মুসলিম রীতিতে নির্মিত।

ঈশ্বর, রাজা অথবা সাধারণের সেবায় নিবেদিত সৌধের ভিত্তির চারপাশে চারটি স্তম্ভ রাখা সর্বত্র প্রাচীন ভারতীয় রীতি। সত্যনারায়ণের পূজায় যে চতুষ্কোণ বেদীতে মূর্তিটি বসানো হয়, তার চারকোণে থাকে চারটি কলার স্তম্ভ। বিবাহের বেদীর চারপাশেও থাকে চার কোণে পরপর সাজিয়ে রাখা মাটির কলসীর তৈরী চারটি স্তম্ভ। দিল্লী থেকে মোটরের রাস্তায় মাত্র ১২৫ মাইল দূরে রাজস্থানের পিলানী শহর। এখানে প্রত্যেকটি সাধারণের কূপের চারপাশে আছে চতুষ্কোণ অথবা আয়তক্ষেত্রাকার ভিত্তি। এই ভিত্তির চারকোণে অবশ্যই দেখা যাবে চারটি স্তম্ভ। কাজেই একথা বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীনকালে

সাধারণের কূপ, প্রাসাদ অথবা বেদী তৈরী করার সময় তার চারকোণে চারটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হতো। তাজমহলেও সেই একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করছে প্রাক্-মুসলিম কালে রাজপুত হাতে এর উদ্ভবের কথা।

প্রাসাদের চারকোণে স্তম্ভ নির্মাণ করা যে মুসলিম রীতি নয় তা প্রাঞ্জল হবে Keene এর Hand book এর ১৬২ পৃষ্ঠায় এক পাদটীকায়। তিনি বলছেন, 'হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ সম্পর্কে Cunningham লিখছেন যে, এই কবরেই আমরা প্রথম দেখি যে, মূল প্রাসাদের চারকোণে চারটি স্তম্ভ নির্মিত রয়েছে। এটা ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের এক নতুন সংযোজন, যা পরে উন্নত হয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে তাজমহলের চারটি স্তম্ভে।'

বৃটিশ পণ্ডিতদের সরলতার উদাহরণ হচ্ছে ওপরের এই পরিচ্ছেদটি। একটি প্রাক্তন হিন্দু প্রাসাদে যে হুমায়ুনকে কবরস্থ করা হয়েছিলো তা বুঝতে না পেরে তাঁরা শুরু করছেন এই ধারণার ওপর যে, এই বিরাট বাড়ীটি নির্মিত হয়েছিলো হুমায়ুনের কবরের ওপর। তারপর তাঁরা এই চারটি স্তম্ভ দেখেন এবং এগুলো-কে আখ্যাত করেন মুসলিম স্থাপত্যের সংযোজন হিসেবে। এরপর তাঁরা কল্পনা করেছেন যে, ক্রমে এই স্তম্ভ নির্মাণ প্রণালী উন্নত হয় (এবং সম্ভবত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক মুঘল শাসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল প্রাসাদ থেকে ক্রমান্বয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে থাকে) এবং স্থান পরিবর্তন করে তা শাজাহানের হারেমের পাঁচ হাজার মহিলার অন্যতমা মমতাজের মৃত্যুর সময় ভিত্তির চারকোণে নির্মিত হয়। তাই যদি হয়ে থাকে, বিলুপ্ত স্তম্ভগুলি কোথায় ?

মুসলিম ইতিবৃত্তকারদের দ্বারা ভুলপথে পরিচালিত বৃটিশ পণ্ডিতদের ধারণার অবাস্তবতা প্রতিপন্ন করার পর আমরা Cunningham এর বক্তব্যের মধ্যে ছড়ানো সত্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

Cunningham পরিপূর্ণ সঠিকভাবে লিখে গেছেন যে, প্রাসাদের চার কোণের স্তম্ভ নির্মাণ অ-মুসলিম রীতি। দিল্লীর তথাকথিত হুমায়ুনের কবরের চারকোণে আর আগ্রায় তাজমহলের ভিত্তির চারকোণে যদি স্তম্ভ দেখা গিয়ে থাকে, তার কারণ হচ্ছে দুটোই জবরদখল করা হিন্দু প্রাসাদ, যা মুসলিমরা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলো।

তাজের পার্শ্বস্থ একটি প্রাসাদকে মসজিদ বলা হলেও উল্টোদিকের প্রাসাদটিকে ব্যবহারের অযোগ্য, ব্যাখ্যার অতীত একই ধরনে নির্মিত 'জবাব' বলে বোঝানো হয়। কাজেই, তাজের বিভিন্ন অংশের সুচারু ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হয়ে 'উদ্ভট' আবোলতাবোল সব ব্যাখ্যা জড়ো করা হয়েছে। তাদের পরস্পরের কোন মিল বা সাম্য আছে কিনা তা ভেবে দেখা হয়নি। ফলে, সামান্য খুঁটিয়ে দেখতে গেলেই জোড়াতালিগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তাজের পরিমণ্ডলে পর্যবেক্ষণ অক্ষুণ্ণ রেখে মওলবী মইনুদ্দীন আরো বলছেন, 'মসজিদের পিছন দিকের দেওয়ালের কাছেই আছে 'বসাই' স্তম্ভ।' তিনি এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। ভারতে 'বসাই' নামে অনেক প্রাচীন শহর আছে। বাস করা বোঝাতে 'বসাই' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। যখন জানা গেলো যে, তাজমহলের উদ্ভব হয়েছে রাজপুত প্রাসাদ হিসেবে শাজাহানের কয়েক শতাব্দী পূর্বে, বসাই স্তম্ভকে প্রাসাদের অনুষঙ্গ হিসেবে সহজেই ব্যাখ্যা করা চলে।

তাঁর বইয়ের ৫০ পাতায় মইনুদ্দীন বলছেন, 'বাদশানামার মতে স্মৃতিস্তম্ভ দুটি যে জায়গায় নির্মিত হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ করতে লেগেছিলো ১০০ বছর। খরচ পড়েছে ৫০০০ টাকা। এর মূল্যবান পাথরের দরজা নির্মাণে লেগেছিলো ১০০০০ টাকা।'

স্পষ্টতই, ফকির ও ভিখিরীর প্রায়ই আনাগোনা হয় যে কবরে, তার মূল্যবান দরজার কোন দরকার নেই। এই ধরণের ব্যয়বহুল দরজার প্রয়োজন হয় শাসকদের জন্য, মৃতদেহের জন্য নয়।

এই চত্বরের অন্যান্য প্রাসাদ সম্পর্কে মইনুদ্দীনের বইয়ের ৬৪ পাতায় লেখা আছে 'স্মৃতিসৌধের মুখ্য দরজা ও মহান প্রবেশ পথের মধ্যবর্ত্তী জায়গাটিকে বলা হতো জিলোখানা।... . তাজের অনুষঙ্গ হিসেবে যে কয়টা প্রাসাদ ছিলো, তাদের একটা বিরাট অংশই এখন ভেঙ্গে পড়েছে।...···জিলোখানার চার দেওয়ালের মধ্যবর্ত্তী জায়গাতে ছিলো ১২৮টা ঘর, যার মাত্র ৭৬টি বর্ত্তমান আছে। বাগানের প্রাচীরের কাছে আছে দুটো খাসপুরা (বা ঘেরা জায়গা), যার প্রত্যেকটিতে আছে ৩২টি করে ঘর আর সেই সঙ্গে পরিচারকদের জন্য ততগুলিই দেউড়ি। (বর্ত্তমানে পশ্চিমদিকের পুরাতে আছে ফুলের টব। অপর পুরার

অর্দ্ধেকটা দখল করে আছে এক গোশালা)।' বর্তমানেও তাজমহল সীমানায় এই গোশালাটি আছে, যা প্রমাণ দেয় এর হিন্দু উৎসের।

বক্তব্যটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাজমহল সীমানায় ছিলো অসংখ্য বাড়ী তিন বা চারতলা উঁচু, যাতে ছিলো শতশত কক্ষ। এত বিরাট মাত্রায় শত শত ঘরের এই জায়গার ব্যবস্থা কখনোই কবরের অঙ্গ হতে পারে না। বরং কেন্দ্রীয় বাড়ীটি প্রাসাদ হলেই এর প্রয়োজনীয়তার যাথার্থ্য বোঝা যায়।

'পুরা' এই শব্দটা চলে আসছে সেই সময় থেকে, যখন রাজপুতদের অধিকারে তাজমহল ছিলো। কারণ, সংস্কৃতে 'পুরা' শব্দটা বোঝায় ব্যস্ত জায়গাকে নিস্তব্ধ কবরকে নয়।

'খাসপুরা' এই শব্দটির 'খাস' এই ধ্বনিরও একটা রাজপুতীয় অর্থ আছে. কেননা, খসরা ছিলো রাজপুত রাজাদের ওপর নির্ভরশীল। তাজের সংলগ্ন বাড়ী নিয়ে খাসপুরা গঠিত হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, যখন রাজপুত শাসক কেন্দ্রস্থিত তাজমহলে বাস করতেন, তাঁর অনুগৃহীতরা সংলগ্ন ঘরগুলোতে থাকতো।

এমনকি নীচের তলার কেন্দ্রীয় কক্ষটিও সুন্দরভাবে কারুকার্যমণ্ডিত করা হয়েছিলো, যা বিলাসবহুল প্রাসাদের পক্ষে বেমানান নয়। প্রাসাদটি জবর দখল করে মুসলিম কবর হিসেবে ব্যবহার করার পর, মুসলিম শাসনে এর নীচুতলায় প্রবেশ করাটা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো অমুসলিমের পক্ষে, স্পষ্টতই, যাতে এর অমুসলিম উৎপত্তির কথাটা ফাঁস হয়ে না যায়। Francis Bernier নামে শাজাহানের সভায় এক পর্যটককে ভেতরে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হয়নি এই যুক্তিতে যে, তিনি মুসলিম না হওয়ায় তাঁর পদস্পর্শে জায়গাটি কলুষিত হয়ে যাবে। Bernier ও আমাদের বক্তব্যে পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'গম্বুজের নীচে আছে একটি কক্ষ যাতে রাখা আছে 'তাজে-মহিল' এর কবর। বছরে একবার খুব ঘটা করে এর দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। তবে তা ঐ একবার মাত্রই এবং কোন খৃষ্টানকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, পাছে এর পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। আমি ভিতরটা দেখিনি কিন্তু শুনেছি যে এর চাইতে খরচ সাপেক্ষ এবং সুন্দর অন্য কিছুর কল্পনাও করা

যায় না।' Bernier আমাদের আরো বলছেন যে, কৃপণতা সত্ত্বেও শাজাহান স্বচ্ছল ছিলেন না। Bernier লিখছেন 'শাজাহান খুবই হিসেব করে খরচ করলেও তাঁর হাতে কখনো ছয় কোটি টাকার বেশী অর্থ সঞ্চিত হয় নি।'

মুঘলদের প্রচণ্ড ধনসম্পদের সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত উন্মত্ত কাহিনীই গুজবমাত্র। সন্দেহের কিছু নেই যে, প্রকাশ্যে ভারতীয় প্রজাদের কাছ থেকে লুণ্ঠন করে বা নানা ধরণের উদ্ভট কর ও মুক্তিপণ জোর করে আদায় করে মুঘলেরা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্যই এই অর্থ তাঁদের অধিকারে থাকতো। সংগ্রহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এগুলো খরচ হয়ে যেতো বিভিন্ন খাতে, কেননা, একদল পাপাচারী, দূষিতচরিত্র, বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের প্রচুর অর্থপ্রদানে তৈলাক্ত করতে হতো। ফলে মুসলিম শাসকদের টিঁকে থাকতে হতো লুণ্ঠন চালিয়ে এবং লুণ্ঠিত অর্থ অকাতরে বিতরণ করার মাধ্যমে। তাই শাসকদের নগদ অর্থে টান পড়তো।

কাজেই, ৩০ বৎসরের রাজত্বকালে যিনি ৪৮টি মুখ্য অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং প্রায়ই দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই শাজাহান হিন্দু রীতিতে নির্মাণ করেছিলেন বিলাসবহুল তাজমহল, পুরনো দিল্লীর শহর, জুমা মসজিদ এবং দিল্লীর লালকেল্লা, একথার ইঙ্গিত দেওয়াও অনৈতিহাসিক হবে। তারপর প্রশ্ন ওঠে, যার কেন্দ্রেই আছে ফতেপুর মসজিদ, সেই পুরনো দিল্লীর শহর যদি শাজাহান পত্তন করে থাকেন, কি প্রয়োজন ছিলো আবার জুমা মসজিদ নির্মাণের ?

যখন মুসলিম শাসনকালের জাল করা নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় ইতিহাস রচনা করা হয়েছিলো, তখন এই ধরণের অনেক প্রশ্নই বিবেচনা করা হয়নি।

Sir H. M. Elliot এই ধরণের মিথ্যা এবং জালিয়াতির কিছু রেখাচিত্র দিয়েছেন তাঁর আটখণ্ড পুস্তকের মুখবন্ধে। Keene দেখেছিলেন যে 'তারিখ-ই তাজমহল' গ্রন্থটা জালিয়াতি। একইভাবে ১৯৬৬ সালে Punjab Regional History Congress এ প্রমাণিত হয়েছে যে, গুরু গোবিন্দ সিংয়ের দুই পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করে মালের কোটলার নবাবের মুঘল সম্রাটের নিকট লিখিত চিঠিটা জাল!

The Guide to the Taj of Agra বলছেন, 'জনশ্রুতি এই যে তাজমহলের প্রবেশপথে দুটো রূপোর দরজা ছিলো।'

মওলবী মইনুদ্দীনের বইয়ের ২১ পাতায় উল্লেখিত আছে, 'কবরের চার পাশে নীরেট সোনার গরাদ (পরে যা ··র্মর দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিলো) ১৬৩২ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। শাজাহান এই স্মৃতিসৌধের খরচ নির্বাহের জন্য একটা শহরতলির পত্তন করেন এবং হুকুম দেন মধ্যবর্তী পাহাড়গুলিকে গুঁড়িয়ে দেবার, যাতে তারা এই ব্যাপারে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এই বিবরণগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক, কেননা সেই সময়ের কোন ইংরেজ পর্যটকের তাজ সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাই না।'

প্রসঙ্গত, এখানে যে পাহাড়ের কথা বলা আছে, তা নির্মাণ করেছিলেন রাজপুত শাসকেরা, তাজ প্রাসাদের সুরক্ষার জন্য। তাজের প্রবেশ পথের কাছে এই ধরণের কিছু পাহাড় এখনও আছে।

আত্মরক্ষামূলক এই উঁচু ঢিবি ছাড়াও তাজের ছিলো আরেকটা সুরক্ষার আয়োজন। তা হলো দুর্গপরিখা। প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে যমুনা নদীই পরিখার কাজ করলেও, এখনও একটা শুকনো পরিখা দেখা যাবে, তাজমহলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে এর দক্ষিণ দিকে, লাল পাথরের দেওয়ালের বাইরে।

এই সব সুরক্ষামূলক স্থাপত্যই প্রমাণ করে যে, তাজমহলের উৎপত্তি হয়েছিলো প্রাসাদ হিসেবে, কবর হিসেবে নয়।

ওপরের পরিচ্ছেদগুলো খুঁটিয়ে দেখলে অনেক তথ্য জানা যায়। একজন বলছেন রূপোর দরজার কথা, অপরজন বলছেন কবরের জায়গাটি ঘিরে সোনার গরাদের কথা। শাজাহান যদি এই সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত করিয়ে থাকেন, কে বা কারা এগুলো সরালো তার কোন কারণ বা উল্লেখ নেই কেন?

তাঁর Handbook এর ১৬৩ পাতায় Keene লিখছেন, 'শোনা যায় আদিতে ছিলো দুটো রূপোর দরজা, যার মূল্য ছিলো ১,২৭,০০০ টাকা।' স্পষ্টতই, শাজাহান যখন হিন্দু প্রাসাদটিকে মুসলিম কবরে পরিণত করার

উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলেন, তিনি এই দরজাগুলো গালিয়ে ফেলার জন্য তাঁর কোষাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রূপোর দরজা আর সোনার গরাদ হচ্ছে প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য, কবরের নয়। নিজের প্রাসাদে ঐ ধরনের কিছু না থাকলেও শাজাহান তাঁর স্ত্রীর কবরে সেগুলো স্থাপিত করেছিলেন এটা বিশ্বাস করা চূড়ান্ত ভাবেই অসম্ভব। শাজাহানের কৃপণ, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও গর্বিত স্বভাব সম্পর্কে বিশ্ববাসীর অজ্ঞতার পরিমাণই শুধু এতে বোঝা যায়।

যদি মমতাজের মৃত্যু ১৬৩০ বা ১৬৩১ সালে হয়ে থাকে, কি করে নীরেট সোনার গরাদ ১৬৩০ সালের মধ্যে কবরের চারপাশে রাখা সম্ভব হয়েছিলো? একটা জায়গা দখল করে প্রস্তাবিত কবরের একটা নক্সা স্থির করতে, নক্সাটি তৈরী করাতে, ভিত্তি খুঁড়তে, মালমসলা জোগাড করতে, বাড়ীটি নির্মাণ করতে, সোনার গরাদের নির্দেশ দিতে, একে লাগাতে, আর চুরি হওয়া নিবারণের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বেশ কয়েক বছর লাগার কথা। এ সব কাজই কি এক বা দু বছরে করা সম্ভব?

এখানেই পাওয়া যাচ্ছে সুস্পষ্ট, অপরিবর্ত্তনীয়, দৃশ্যমান প্রমাণ যে, কাল্পনিক ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্যের মাধ্যমে নয়, তাজের উৎপত্তি হয়েছিলো প্রাচীন 'হিন্দু শিল্প শাস্ত্রের' রীতি অনুসারে।

হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে তাজমহলের স্থাপত্যরীতির সাদৃশ্য বিখ্যাতবৃটিশ স্থপতি Havell এর পূর্বেই উদ্ধৃত মন্তব্যের (তাজমহল হচ্ছে হিন্দু নির্মাণ রীতিতে নির্মিত)সঙ্গে মিলিয়েদেখলে পাঠকেরমনে কোন সন্দেহইথাকবেনা যে, তাজমহল হচ্ছে হিন্দু ধারাতে নির্মিত প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ। বাদশানামাতেও স্বীকার করা আছে যে, এটা ছিলো একটা গম্বুজযুক্ত প্রাচীন প্রাসাদ।

সম্মুখের বাগানের জায়গাটুকু তাজ প্রাসাদের মর্মর চত্বরের প্রায় দ্বিগুণ আয়তনের। কাজেই, Vincent Smith তাঁর 'Akbar the Great Moghul' বইয়ের নবম পৃষ্ঠায় তাজকে উদ্যান প্রাসাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন

যাতে মুঘল সম্রাট বাবর ১৫৩০ সালে মারা যান, শাজাহানের স্ত্রী মমতাজের মৃত্যুর একশ বছর আগে।

সেই একই প্রাসাদ বাবর বর্ণনা করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়, একটি 'চতুর্পার্শ্বস্থ স্তম্ভ এবং কেন্দ্রে গম্বুজ যুক্ত প্রাসাদ হিসেবে।'

উনবিংশ অধ্যায়

শিলালিপি।

তাজমহল নির্মাণ সম্পর্কে শাজাহান-ইতিকথার অলীকত্বের সব চাইতে বড়ো প্রমাণ হচ্ছে যে, তাজমহলে খোদিত অসংখ্য লিপির কোনটাতেই এই নামটির উল্লেখ নেই।

তাজমহলের গায়ে কোরাণের ১৪টি অধ্যায় খোদিত করা আছে। এ ছাড়া আছে ধর্ম বিষয় বর্জিত কিছু খোদাই, যার কোনটাতেই দূরতম ইঙ্গিতও নেই যে, শাজাহান তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। শাজাহানের নির্দেশে তাজমহল নির্মিত হলে তিনি কি দেয়ালের গায়ে খোদিত অসংখ্য লিপিতে এই কবরের পরিকল্পনা থেকে শেষ করা পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করাতেন না? অথবা তিনি কি মর্মর ও লালপাথরের এই বিরাট ব্যয়বহুল কৃতিত্বের কথা ভবিষ্যত পৃথিবীকে জানিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতেন না?

Keene এর Handbook for Visitors to Agra বইয়ের ১৭০-১৭৪ পৃষ্ঠায় এই দেয়াল-লিপির প্রতিচিত্র দেওয়া আছে। Keene বলেছেন, 'স্মৃতি-স্তম্ভ প্রকোষ্ঠটির দেয়াল এবং ছাদ বেশ কারুকার্যমণ্ডিত, আর এর খিলান ও মধ্যবর্তী জায়গায় খোদিত আছে কোরাণের উদ্ধৃতি, যা শেষ হচ্ছে, নগণ্য ব্যক্তি আমানত খান শিরাজী কর্তৃক ১০৪৮ হিজরীতে সম্রাটের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (১৬৩৯ সালে) লিখিত হইয়াছে।'

কাজেই তাজমহল নির্মাণের কাজে নিযুক্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর হিসেবে যে আমানত খান শিরাজীর কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, তিনি প্রতিপন্ন হলেন একজন নগণ্য খোদাই কারক হিসেবে, যেমনটি দেখা যায় রান্নার বাসন-পত্র বা পাথরের খণ্ড বিক্রী করার দোকানে।

যাঁর স্মৃতিতে শাজাহান তাজমহল নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়, সেই মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভে খোদিত লিপিতেও পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত নেই। Keene লিখছেন, 'মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভ ফার্সীভাষায় কোরাণের লিপি দ্বারা সজ্জিত। এতে আছে ঈশ্বরের ৯৯টি নাম আর একটি সরল স্মৃতিফলক :—

'মমতাজমহল নামে পরিচিত আর্জুমন্দ-বানু-বেগমের সমাধি, যিনি মারা যান ১০৪০ হিজরীতে (১৬২৯ খৃষ্টাব্দে)।'

শাজাহান যদি তাঁর পত্নীর উদ্দেশ্যে একটা ব্যয়বহুল কবর নির্মাণের নির্দেশ দিতেন, তবে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে এই সম্পর্কে কিছু উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিলো। সমস্ত মধ্যযুগীয় ইতিহাসই দাবী করে আসছে যে, ভারতের মুসলিম শাসকেরা নিজের এবং নিকট আত্মীয়দের জন্য বিলাসবহুল সমাধি নির্মাণের কাজে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। এই দাবীটা অবশ্য একেবারেই অলীক এবং স্বাভাবিক মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। তাহলেও, এই অসংখ্য ভ্রান্ত ঐতিহাসিকের কথা বিশ্বাস করেই আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, যাঁরা আশ্চর্য সব কবর বেছে নেবার জন্য এত আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা কি চাইবেন না এই সবের নির্মাণ কৃতিত্বের কথা ওই কবরের গায়ে খোদাই করে রেখে যেতে ?

ওপরের খোদিত লিপি থেকে যে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায় তা হচ্ছে, মমতাজের মৃত্যুকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে। আগেই আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা দাবী করেছেন যে, মমতাজ মারা গেছেন ১৬৩০ বা ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সমস্ত বিবরণ থেকে যে সার কথাটুকু আমরা জানতে পারি তা হচ্ছে, মমতাজ ১৬২৯ থেকে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে মারা গেছেন। যিনি সম্রাটের চোখের মণি ছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয় এবং যাঁর নিমিত্ত একটা সৌন্দর্যময় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছিলো বলে পৃথিবীটাকে বিশ্বাস করানো হয়, সেই মহিলার সঠিক মৃত্যু সময়ের তিন বৎসরের একটা আনুমানিক কাল ধরা হয়, এটা খুবই আশ্চর্যের। পুরো ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত সত্যি সাধারণকে এখনও বলা হয় নি। তাদেরকে নানারকম ধোঁয়াটে গল্প শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাঁরা জানেন না যে, যখন নির্জলা সত্যি খুঁজতে যাওয়া হয়, শাজাহান-ইতিকথার সমস্তটাই মিলিয়ে যায় পৈশাচিক জালিয়াতি হিসেবে। মমতাজ ছিলেন শাজাহানের হারেমের পাঁচ হাজার মহিলার অন্যতম, কাজেই তাঁর মৃত্যু কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল না। ফলে তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় নি।

মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভের ঠিক নীচে, মাটির নীচের প্রকোষ্ঠে তাঁর আসল কবর আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। Keene বলছেন, 'মমতাজের স্মৃতিফলকটি তাঁর

স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে খোদিত লিপির অনুরূপ। তার মানে হচ্ছে, ঐ কবরের গায়ে খোদিত লিপি আর ওপরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে খোদিত লিপি প্রায় হুবহু এক।

যদি দাবী করা হয় যে, শাজাহান এত বিনয়ী ছিলেন যে, তাজমহল নির্মাণের কৃতিত্বের কথা লিখে রাখতে চাননি (প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মিথ্যা অহংকার সম্পন্ন ও গর্বিত স্বভাবের), মৃত্যুর পর তাঁর কবর ও স্মৃতিস্তম্ভে লিপি উৎকীর্ণ করার সময় অন্যরাও তো সে কথা লিখে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁরাও সাহস করে তা করতে পারেন নি। কি করেই বা পারবেন, যখন তাঁদের সমসাময়িকরা জানতেন যে, জয়সিংহের কাছ থেকে দখল করা একটি ব্যয়বহুল প্রাসাদে মমতাজ ও শাজাহানকে কবরস্থ করা হয়েছিলো? কাজেই, আমরা মনে করি যে, শাজাহানের তরফ থেকে এই ধরণের কোন দাবীর অনুপস্থিতি অযৌক্তিক নয়।

শাজাহান মারা যান ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রী মমতাজের মৃত্যুর প্রায় ৩৬ বছর পরে। Keene বলছেন, শাজাহানের স্মৃতিস্তম্ভে ফার্সীতে কোরাণের বাণী ছাড়াও লিপিবদ্ধ আছে, 'সেই মহান সম্রাটের স্মৃতিস্তম্ভ ও পবিত্র শেষ বিশ্রামের জায়গা, বেহশ তে যাঁর আশ্রয় এবং নক্ষত্রখচিত আকাশে যাঁর আস্তানা। শান্তির এলাকার তিনি বাসিন্দা। দ্বিতীয় সাহির কিরাণ বীর সম্রাট শাজাহান। তাঁর এই স্মৃতিসৌধ উত্তরোত্তর বর্ধমান হোক এবং বেহেশ্‌তেই হোক তাঁর আশ্রয়। এই নশ্বর পৃথিবী থেকে অনন্ত জগতে তিনি মহাপ্রস্থান করেন রজব মাসের ২৮ তারিখের রাত্রিতে ১০৭৬ হিজরীতে (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে)।'

মর্মর প্রাসাদের পশ্চিমদিকেই আছে আরেকটা প্রাসাদ, শাজাহান দখল করে নেবার পর থেকেই যাকে মসজিদ বলে অভিহিত করা হয়ে আসছে। এর খিলানেও উৎকীর্ণ আছে কোরাণের বাণী। Keene বলছেন, 'এ ছাড়াও আছে অনেকগুলো গোলাকার মর্মরখণ্ড, যাতে লেখা আছে 'ইয়া কাফি' (হে সর্বসম্পূর্ণ) এবং আল্লা (ঈশ্বর)'।

কাজেই যে সমস্ত লিপির কথা আমরা উদ্ধৃত করেছি, তার কোনটাতেই শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের দূরতম ইঙ্গিত বা উল্লেখ নেই। যে

সম্রাট সমগ্র প্রাসাদ, স্মৃতিস্তম্ভ দুটির এবং কবর দুটির আগাগোড়া নানা ধরনের লিপি খোদিত করিয়েছেন, প্রাসাদটির নির্মাণ সম্পর্কে তিনি কোন প্রামাণ্য লিপি রাখবেন না, এটা ধারণা করা কষ্টকর। এই অনুল্লেখ এবং এরসঙ্গে আমাদের আহরিত অন্যান্য সব সাক্ষ্য পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, শাজাহান তাঁর স্ত্রীকে সমাহিত করার জন্য একটি হিন্দু প্রাসাদ দখল করেন, নিজে কিছু নির্মাণ করান নি। তাজমহলের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলো সবই হালকা চালের, যেমনটি বনভোজনকারীরা অন্যের দেয়ালে করে থাকেন। এই লিপিগুলোই বোঝাচ্ছে যে, তাজমহল শাজাহানের সম্পত্তি নয়।

বিংশ অধ্যায়

তাজমহল শিবমন্দির হতে পারে

শাজাহানের আদিষ্ট ইতিহাস বাদশানামাতে তাজমহল একটি দখল করা হিন্দু প্রাসাদ, একথা স্বীকার করা থাকলেও, আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে, এর ভিত্তির নক্সা হিন্দু মন্দিরের নক্সার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। বটেশ্বর শিলালিপি নামে পরিচিত একটি শিলালিপি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে আছে। এতে ইঙ্গিত দেওয়া আছে যে, তাজমহল ১১৫৫ সালে নির্মিত শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি হিন্দু মন্দির।

এই সংস্কৃতে উৎকীর্ণ লিপির আছে ৩৪টি স্তবক, যার মধ্যে ২৫. ২৬ এবং ৩৪ নম্বরের স্তবকগুলি এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এর অনুবাদ দেওয়া হলো।

'তিনি (সম্রাট পরমাদ্রিদেব) একটা প্রাসাদ নির্মাণ করালেন আর এর অভ্যন্তরস্থ বিষ্ণু মূর্ত্তির পদতলে তিনি নতশিরে স্পর্শ করছেন।'

'সেই রকম, রাজা আরেকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেই দেবতার উদ্দেশ্যে, যাঁর মস্তকে আছে শাদা পাথরের অর্ধচন্দ্র। সেই সুন্দর মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে দেবতা এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর হিমালয় নিবাস কৈলাস পর্বতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেন নি।'

'এই লিপির তারিখ হচ্ছে ১২১২ বিক্রম সংবত, আশ্বিন মাস, রবিবার, শুক্লা পঞ্চমী।'

উপরে অনূদিত লিপিটি পাওয়া যাবে Kharjurwahak alias wartaman (modern) Khajuraho বইতে, যাঁর লেখক D. J. Kale। আরও পাওয়া যাবে Epigraphia Indicaর প্রথম খণ্ডে ২৭০-২৭৪ পৃষ্ঠায়।

তাঁর বইয়ের ১২৪ পৃষ্ঠায় Kale বলছেন, 'আগ্রার কাছেই মৌজা বটেশ্বরে প্রাপ্ত এই শিলালিপিটি আছে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে। এটা হচ্ছে, সম্রাট পরমাদ্রিদেবের। তারিখ দেওয়া আছে ১২১২ বিক্রম সংবত, আশ্বিন মাসের শুক্লা পঞ্চমী। এতে সব মিলিয়ে আছে ৩৪টি স্তবক, যাতে বর্ণিত আছে চন্দ্রাত্রেয় রাজবংশের উৎপত্তি এবং মুখ্য শাসকদের নাম। বটেশ্বরে একটি ঢিবিতে এই লিপিটা পাওয়া যায়, পরে General Cunningham তা লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে জমা দেন। এখনও তা সেখানেই আছে। বিষ্ণু ও শিবের জন্য সম্রাট পরমাদ্রিদেব যে দুটি সুন্দর মর্মর মন্দির নির্মাণ করান, তা পরে মুসলিম আক্রমণে কলুষিত হয়। কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি মন্দির নির্মাণ সম্পর্কিত এই শিলালিপিটি একটি ঢিবির মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। অনেক বছর এটা মাটির নীচে লুকিয়ে ছিল, পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে খনন কার্য চালাবার সময় General Cunningham এটা খুঁজে পান।'

বটেশ্বর তাজমহল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত।

উপরে উদ্ধৃত পুস্তকের লেখক শ্রী কালে স্পষ্টভাবে বলছেন যে, যে জায়গায় এই লিপিটি পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয়, বিধ্বংসী মুসলিম অভিযানের প্রাক্কালে কোন দূরদর্শী ব্যক্তি বিশেষ উদ্দেশ্যে একে সতর্কভাবে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছিলো।

এই শিলালিপিটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এতে এখন থেকে ৮০০ বছরেরও আগে আগ্রায় দুটি ধবধবে শাদা মর্মর প্রাসাদ নির্মাণের কথা বলা আছে। General Cunningham অঙ্কিত চন্দ্রাত্রেয় (ওরফে চান্দেল) বংশের দুটি সময়পঞ্জী তুলে ধরা আছে Kale এর বইয়ে ১৪০-১৪১ পাতায়। সেই মতে পরমাদ্রিদেবের কাল হবে ১১৬৫ বা ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে।

প্রসঙ্গত, এই শিলালিপি কার্যকরভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই অন্ধ বক্তব্যের যে, কেবল মাত্র মুসলিমরাই প্রথম ভারতে মর্মর প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন! আমরা আগেই দেখেছি যে, ভারতের মুসলিম শাসকেরা একটাও প্রাসাদ, খাল, দুর্গ, কবর বা মসজিদ, তা লাল বা সাদা যে পাথরেরই হোকনা, নির্মাণ করান নি। তাঁরা পূর্ববর্তী হিন্দু প্রাসাদগুলো দখল করে ব্যবহার করেছেন মাত্র।

আমাদের মতে বটেশ্বর লিপিতে যে দুটি প্রাসাদের উল্লেখ করা আছে তা এখনও আগ্রায় মর্মরের সমস্ত জাঁকজমক নিয়ে বর্তমান। তারাই হচ্ছে ইতমাদ-উদ্দৌলার কবর আর তাজমহল।

শিলালিপিতে রাজার প্রাসাদ হিসাবে যা উল্লেখিত আছে, তা হচ্ছে, ইতমাদ-উদ্দৌলার কবর, আর চন্দ্রমৌলিশ্বর (শিব) মন্দির হচ্ছে তাজমহল।

ভারতীয় ইতিহাসের পণ্ডিতদের ব্যর্থতার একটা কারণ হলো যে, তাঁরা সরলভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, ভারতে জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদও কবর মুসলিমরা নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের নির্মিত অনুরূপ কোন প্রাসাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গর্বের সঙ্গে যাকে ইতমাদউদ্দৌলার কবর বলে দেখানো হয়, তা অর্থহীন হয়ে পড়ে, যদি না ঐতিহাসিকেরা দেখাতে পারেন সেই প্রাসাদ, জীবিত অবস্থায় যেখানে মহামান্য সভাসদ ইতমাদউদ্দৌলা থাকতেন। আমাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইতমাদউদ্দৌলা বাস করতেন সেই প্রাসাদেই, সেখানে তাঁকে কবরস্থ করা হযেছে বলে বিশ্বাস করা হয়, আর এই বাড়িটা হচ্ছে একটি আত্মসাৎ করা হিন্দু প্রাসাদ। স্পষ্টতই, বটেশ্বর লিপিতে উল্লেখিত রাজার প্রাসাদ হচ্ছে এই বাড়িটা। ইতমাদউদ্দৌলা সেই প্রাসাদেই বাস করতেন।

নিম্নলিখিত কারণে তাজমহলকে সেই চন্দ্রমৌলিশ্বর (শিব) মন্দির বলে আমরা বলতে চাইছি—

১। এটা হচ্ছে ধবধবে সাদা মর্মর পাথরের তৈরী, শিলালিপিতে যা উল্লেখিত আছে।

২। এর চূড়ায় আছে ত্রিশূল, যা কেবল শিবেরই প্রতীক।

৩। মন্দিরটির সৌন্দর্য এতই চিত্তাকর্ষক ছিলো যে, বলা হয যে, শিব তাঁর হিমালযস্থ কৈলাস শিখরের আশ্রযে আর ফিরে যাবার কথা চিন্তা করেন নি।

৪। আমরা এই বইয়ে অন্যত্র বলেছি যে, তাজমহলের বাগানে আছে হিন্দুদের কাছে পবিত্র অনেক গাছ। এদের মধ্যে আছে বেল ও হরশৃঙ্গার, যার পাতা ও ফুল শিব পূজায় আবশ্যক বলে মনে করা হয়।

৫। শাজাহান ও তাঁর স্ত্রী আর্জুমন্দ-বানু বেগমের স্মৃতিস্তম্ভ আছে তাজমলের যে কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে, তার চার পাশে আছে আটটি আটকোণা ঘর, যা হিন্দু রীতি অনুযায়ী, ভক্তদের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

৬। এই ঘরগুলির প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে যখন ভক্তেরা যেতেন, তাঁরা ছিদ্রপথে দেখতে পেতেন সেই আটকোণা কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলটি, যাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

৭। তাজমহলের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের ওপরের গম্বুজটি প্রতিধ্বনিত করতো

সেই সোৎফুল্ল শব্দ, তাণ্ডবনৃত্যরত শিবের আরাধনার অঙ্গ হিসাবে যা সৃষ্টি করা হতো। শাঁখে ফুঁ দিয়ে, বাদ্য বাজিয়ে, আর ঘণ্টাধ্বনি করে।

৮। গম্বুজ হচ্ছে শিবমন্দিরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার মধ্য থেকে ঝোলানো থাকতো জলের কলসী, শিবলিঙ্গকে অভিষিক্ত করার জন্য।

৯। তাজমহলের অঙ্গ হিসাবে যে রূপোর দরজা আর সোনার গরাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা বর্তমান কালেও হিন্দু মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দৃশ্যমান। যদি বিশ্বাস করা হয় যে, মমতাজের কবরের জন্যই এই সোনার গরাদগুলো রাখা হয়েছিল এবং পরে তা সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে গরাদ আটকানোর জন্য ব্যবহৃত মর্মরের ঠেকনাগুলোতে ছিদ্র দেখা যেত। কিন্তু এই ধরনের কোন ছিদ্র নেই। কাজেই, বোঝা যাচ্ছে, শাজাহান নিজেই এই প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের সোনার গরাদগুলো সরিয়ে রাজকোষে জমা দিয়েছিলেন। পরে ঐ হিন্দুমূর্তির আশ্রয়স্থলে মুসলিম কবর নির্মিত হয়।

১০। তাজমহলের প্রদর্শকেরা এখনো উল্লেখ করে গম্বুজের একেবারে ওপর থেকে স্মৃতিস্তম্ভের ওপর একফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ার রীতির কথা। স্পষ্টতই, এটা জলের কলসী থেকে শিবলিঙ্গের ওপর জল পড়ার অতীত স্মৃতির রেশমাত্র।

১১। Tavernier উল্লেখ করেছেন তাজমহল প্রাসাদ অনুষঙ্গে ছয়টি প্রশস্ত চত্বরের কথা, যেখানে বাজার বসতো। এটা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, হিন্দু ঐতিহ্যে বাজার এবং মেলা বসতো হিন্দু জীবনের কেন্দ্রবস্তু মন্দিরকে ঘিরে।

১২। গম্বুজের নীচে তাজমহলের মর্মরের বাঁকানো প্রধান প্রবেশদ্বারের মাথায় খচিত আছে ত্রিশূল, যা একমাত্র মহাদেবেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাতিয়ার। এতে আছে কিছু লাল ও সাদা দাগ, ঠিক যেমনটি হিন্দুরা তাঁদের কপালে ধারণ করেন। প্রধান দরজার মাথায় এই ত্রিশূল থাকাটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এটা যে শিবমন্দির তাতে কোন ভুল নেই। কাজেই, তাজমহল আদিতে শিব মন্দিরই ছিলো।

১৩। মর্মর প্রাসাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তাজমহলের ডানদিকে লাল পাথরের উঠানে গম্বুজের শীর্ষোত্থিত ত্রিশূলের অগ্রভাগের একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য নক্সা অঙ্কিত আছে দেখা যায়। এটা আবারও প্রমাণ করে হিন্দু উৎসের কথা, কেননা হিন্দু স্থাপত্যের রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক সৌধের নির্মাণে ব্যবহৃত মাপের আকার ঐ সৌধের কোথাও খোদাই করে রাখা হয়। তাজমহলের ক্ষেত্রে এর ত্রিশূলের অগ্রভাগের মাপকে ভিত্তি করে শিব মন্দিরটি গড়ে তোলা হয়েছিলো।

কিছু লোক বিশেষভাবে এটাই দেখাতে চান যে, তাজমহলের গম্বুজের গিলটি করা শীর্ষে আরবী লিপিতে খোদিত আছে 'আল্লাহো আকবর' অর্থাৎ 'ঈশ্বর মহান'। শাজাহান হিন্দু প্রাসাদটি মুসলিম উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবার জন্ত দখল করার পর যে এই অক্ষরগুলি খোদিত হয়েছিলো তা বোঝা যায় এই থেকে যে, লাল পাথরের উঠানের দক্ষিণে অঙ্কিত ঐ ত্রিশূলের প্রতিমূর্তিতে এই অক্ষরগুলি খোদিত নেই।

মর্মরের উঁচু মঞ্চের পিছনে, লাল পাথরের উঠানের নীচে নদীর দিকে মুখ করে আছে দীর্ঘ একসার সুপরিসর কারুকার্য খচিত প্রকোষ্ঠ। এর সঙ্গেই আছে একটা লম্বা ঢাকা বারান্দা, যা ঐ সারির পুরো দৈর্ঘ্য পর্যন্ত প্রসারিত। যেখানে মৃতদেহ রাখা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়, সেই নীচের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের নীচের তলের এই প্রকোষ্ঠগুলিতে কারুকার্য থাকতো না, যদি তাজমহল সত্যই মুসলিম কবর হতো।

এ ছাড়াও আছে, ঐ কবর রাখা নীচের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের ঠিক নীচে আরেকটা আটকোণা ঘর। মনে হয় সমস্ত দর্শকদেরই ভুল বোঝানো হচ্ছে। মমতাজের মৃতদেহ যদি আদৌ তাজমহলে কবরস্থ করা হয়ে থাকে, তবে তা মাটির সমতলের প্রকোষ্ঠে বা তার নীচের প্রকোষ্ঠে নেই।

এই তথাকথিত কবরের ঠিক নীচের যে প্রকোষ্ঠটি ইট এবং চুণ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মনে হয়, সেখানে হিন্দু লিপি বা মূর্তি থাকতে পারে। অনুরূপ ভাবে, লালপাথরের চত্বরের নীচে পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত ঢাকা পথটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার নদীর দিকে মুখ করা লাল পাথরের চত্বরের নীচের সারিবদ্ধ ঘরগুলির বায়ুরন্ধ্রের অনুরূপ দ্বারাকৃতি মুখও দেয়াল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব কুশ্রী বাধা যদি অপসারিত হয়, যমুনা নদীর ঠাণ্ডা বাতাস এবং সূর্যালোকে উদ্ভাসিত নানা রংয়ে চিত্রিত তাজমহলের এই নীচের তলার কক্ষগুলি দর্শকের আনন্দের কারণ হতে পারে, যেমনটি হতো শাজাহানের আমলের আগে। কাজেই এটাই সম্ভাব্য যে, নদীর পাড় পর্যন্ত তাজমহলের মর্মর ভিত্তির নীচে সব মিলিয়ে চারটি বা পাঁচটি তলা আছে।

১৪। তাজমহল কথাটিও ফার্সী থেকে অনেক দূর। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ 'তেজ মহা আলয়' অর্থাৎ উজ্জ্বলতম প্রাসাদ কথাটির অপভ্রংশ। একে উজ্জ্বলতম প্রাসাদ বলা হতো এই কারণে যে, সূর্যালোকে ও চন্দ্রালোকে এর গা থেকে একটা উজ্জ্বল ছটা প্রতিফলিত হতো। এই নামটা আরো দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে, শিবের নেত্র থেকে 'তেজ' বা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়

বলে ধারণা করা হয়। মমতাজমহলের নাম থেকে এই তাজমহল নামটা এসেছে, এই ধারণা একটু খুঁটিয়ে দেখলেই ভিত্তিহীন বলে বোঝা যায়। প্রথমত, শাজাহান নির্দেশিত ইতিহাসে প্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী তাজমহলে সমাহিত মহিলার নাম পাওয়া যায় মমতাজ উল-জামানি, মমতাজমহল নয়। দ্বিতীয়ত, প্রযোজনীয় এবং বিশিষ্ট 'মম' ক'টা বাদ দিয়ে বাকি 'তাজমহল' দিয়ে প্রাসাদের নামকরণটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তৃতীয়ত, যদি কেউ এই 'তাজমহল' কথাটার অন্য অর্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন, তবে তা দাঁড়াবে 'প্রাসাদের মুকুট', কিন্তু তাজমহলের পরিচিতি কবর হিসাবে। চতুর্থত, মুসলিম ইতিহাস বা লোকগাথায় এর অনুরূপ কোন সংজ্ঞা নেই। তাজমহল শব্দটির যদি বেশী প্রচলন থাকতো পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় মুসলিম কবর অথবা প্রাসাদের প্রসঙ্গে এর কথা অবশ্যই শোনা যেতো।

১৫। বটেশ্বর শিলালিপির সাহায্যে আমরা বর্তমান কাল পর্যন্ত তাজমহলের মোট ৮০০ বছরেরও বেশী ইতিহাসের কিছুটা খোঁজ পাই। মনে হয় তাজমহল ওরফে তেজ মহালয়ের উদ্ভব হয়েছিলো শিব মন্দির হিসাবে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে। উপাস্য দেবতা শিবকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় হিন্দু আশ্বিন মাসের রবিবার, শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে। ১২০৬ সালের কিছু পরে যখন দিল্লীতে মূর্তিদ্বেষী সুলতানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন এই মন্দিরটি দখল করা হয়। মূর্তিটি বাইরে ফেলে দিয়ে একে প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহৃত করা হতে থাকে। ৩৭১ বছর পর মুঘল সম্রাট বাবরের আত্মজীবনীতে (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে) এর উল্লেখ দেখে আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছি। পূর্বসূরী ইব্রাহিম লোদীর কাছ থেকে তিনি এই প্রাসাদ অধিকার করেন। বাবরের পুত্র হুমায়ুনের পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটতে থাকে। ১৫৩৮ সালের কাছাকাছি তাজমহল বা তেজমহালয় পুনরায় হিন্দুদের অধিকারে যায়। এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ হচ্ছে যে, ১৫৫৬ সালের ৬ই মে হুমায়ুনের পুত্র আকবর পানিপথের যুদ্ধে হিন্দু যোদ্ধা হিমুকে পরাজিত করে দিল্লী-আগ্রা-ফতেপুরসিক্রি অঞ্চল পুনরায় অধিকার করেন। আকবর জয়পুরের রাজপরিবারকে এই প্রাসাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন নি, কেন না এই জয়পুর পরিবার ছিলেন তাঁর সবচাইতে শক্তিশালী মিত্র এবং এঁদের দলপতি ভগবান দাস ও মানসিংহ ছিলেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি। হুমায়ুনের পরাজয়ের পর যে তাজমহল জয়পুরের রাজপরিবারের অধিকারে চলে যায়, তা বোঝা যায় শাজাহান নির্দেশিত ইতিহাস থেকে, যাতে স্বীকার করা আছে যে, তাজমহল দখল করা হয়েছিলো রাজপরিবারের তদানীন্তন কর্তা জয়সিংহের হাত থেকে। কাজেই, আমরা ১১৫৫ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাজমহলের

একটা সঙ্গত ইতিহাস পাই। ৮০০ বছরেরও অধিক এর অস্তিত্বকালে, আমরা বলতে পারি, এর উদ্ভব হয়েছিলো শিবমন্দির হিসাবে এবং সেই প্রতিষ্ঠাই বজায় ছিলো প্রায় একশো বছর পর্যন্ত। এর পরের তিনশো বছরে কখনো তা প্রাসাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, কখনো বা আবার মন্দিরে রূপায়িত হয়েছিলো। ১৬৩০ সালের পর থেকে এই উজ্জ্বল প্রাসাদ (তেজ মহা আলয়) কবরে রূপায়িত হয়ে এখনো কবর হিসাবেই চলে আসছে।

১৬। ত্রিশূলের অগ্রভাগ ছাড়াও তাজে আছে আরো অনেক হিন্দু প্রতীক, যেমন স্বস্তিকা, পদ্ম এবং দেবনাগরী লিপিতে হিন্দু মন্ত্র 'ওম'।

দর্শকেরা ভিতরের মর্মরের দেয়ালের গায়ে ফুল-কাটা নক্সার ওপর বড় হরফে খোদিত 'ওম' কথাটি লক্ষ্য করে থাকতে পারেন। কবর দেখার প্রকৃত উৎসাহীরা নীচের কক্ষে নামার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন ডান এবং বাম দিকের দেয়ালে বুক সমান উঁচুতে রহস্যময় পবিত্র হিন্দু শব্দ 'ওম' খোদাই করা আছে ফুলকাটা নক্সায়।

সাদা গ্রীলের কাজ স্বস্তিকা ও স্মৃতিস্তম্ভ ঘিরে থাকা গ্রীল করা দরজার কপাটের সীমান্তে অঙ্কিত লাল পদ্মও দেখা যায়।

'ওম', ত্রিশূল এবং মর্মর ভিত্তির নীচে লুক্কায়িত তিন দিকে ছড়ানো সারি-বদ্ধ ঘরের অস্তিত্ব থেকে তথ্যানুসন্ধানীরা ভেবে দেখতে পারেন, মুসলিম অধি-কারের আগে তাজমহল কোন বিরাট শৈব, হিন্দু বা তান্ত্রিক উপাসক দলের পরিকেন্দ্র ছিলো কিনা।

তথাকথিত কবর দেখার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকলে মাঝামাঝি জায়গায় পাওয়া যায় একটা সমতল স্থান। এর দুপাশেই আছে বাঁকানো দেয়াল। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ডানদিকের এবং বাঁ দিকের বাঁকানো দেয়াল অসমঞ্জস মর্মরের টুকরো দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডানদিকের দেয়ালে যে আকৃতির মর্মরের টুকরো ব্যবহার করা হয়েছে, বাঁ দিকের দেয়ালে তা হয় নি। ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মর্মর ভিত্তির নীচে কবর কক্ষের পাশের প্রকোষ্ঠের প্রবেশপথগুলি ভরাট করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো শাজাহানের নির্দেশে, যখন এটি দখল করে মুসলিম কবরস্থানে পরিণত করা হয়। ঠিক এমনটিই ঘটেছিলো ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ অনুষঙ্গে এবং ভুল করে আখ্যাত আকবর, হুমায়ুন, সফদরজঙ্গ ও অন্যান্যদের তথাকথিত কবরের ক্ষেত্রে।

মুসলিম কবরের স্থাপত্য হিসেবে নয়, 'তেজ মহা আলয়' বা তাজমহলকে প্রাচীন হিন্দু মন্দির-বিদ্যার কুসুম হিসেবে অনুধাবন করা অতএব স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্রদের উচিত। প্রথমোক্তটির কোন অস্তিত্বই নেই, অন্ততপক্ষে ভারতে।

সমস্ত তথা-কথিত মধ্যযুগীয় মসজিদ এবং কবর সবই প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ কিভাবে মুসলিম কবর হিসেবে এর উৎপত্তির মিথ্যা কাহিনী দিয়ে তিনশো বছরেরও বেশী সারা পৃথিবীকে বোকা বানিয়ে রাখা হয়েছে, তাজমহল তার রূপদী উদাহরণ। প্রাচীন আমেরের (বর্তমানে জয়পুর) দুর্গ-রাজধানীর ভিতরের কালী (ভবানী) মন্দিরের সঙ্গে আগ্রার তেজ-মহা-আলয়ের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। শাদা মর্মর এবং খোদিত কারুকার্যের এই সাদৃশ্য প্রমাণ করে যে, প্রাসাদ এবং পরে কবর হিসেবে রূপান্তরিত হবার আগে তাজমহল ছিলো একটি হিন্দু মন্দির। প্রায় ৩৫০ বছর হতে চললো সেই প্রাচীন শিব-মন্দিরটি বাধ্য হয়েছে মুসলিম রানীর স্মৃতিসৌধের চরিত্র পালন করতে। ভাগ্যের আর এক পরিবর্তন হয়তো জাগ্রত ভারতের হাতে তাজমহলকে অর্পণ করবে আদি শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা, কে বলতে পারে ?

তাজমহলের জীবনেতিহাসের পরিবর্তন অনুসন্ধান করে বটেশ্বর লিপির ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, যমুনার তীরে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি চন্দ্রাত্রেয় বংশীয় রাজা পরমাদ্রিদেব অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করে তাতে চন্দ্রমৌলিশ্বর (শিব) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৬৩০ সালের কাছাকাছি তাজমহল নামের সেই মন্দির ও প্রাসাদ তৎ-কালীন জয়পুরের শাসক জয়সিংহের কাছ থেকে দখল করে নেওয়া হয়। শাজাহান নির্দেশিত ইতিহাস বাদশানামার মতে, সেই সময় প্রাসাদটি শেষ বিখ্যাত অধিবাসী মানসিংহের প্রাসাদ বলে খ্যাত ছিলো। বাদশানামা একে বলছেন 'ইমারত-এ-আলিশান' বা অতুলনীয় বৈভবের অধিকারী এক প্রাসাদ, 'ওয়া গুম্বজে' বা গম্বুজ দিয়ে ঢাকা। সেইরকম, বটেশ্বর লিপিও বলছে এক ধবধবে সাদা পাথরের সুন্দর মন্দিরের কথা, যাতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিব আর হিমালয়ের আবাসে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করেন নি।

কাজেই, বটেশ্বর শিলালিপির সাহায্যে আমরা ১১৫৫ সালে উদ্ভবের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাজমহলের একটা ইতিহাস পাই।

একটা প্রাচীন হিন্দু শহরের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো এই তাজমহল ওরফে 'তেজ মহা-আলয়'। একথা Keene এর Handbook এর ১৭৯ পাতার মন্তব্যে সমর্থিত হয়। তিনি বলছেন 'তাজগঞ্জে একটা জায়গা আছে যার নাম কালান্দর দরজা, যা মনে হয় আকবরের সময়েরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রাচীন আগ্রা

শহরের বেষ্টনকারী দেয়ালের দরজা ছিলো। তাজমহলের সন্নিহিত অঞ্চল যে অতি পুরাতন আগ্রা শহরের একটা অংশ ছিলো,তা সমর্থিত হয় এই উক্তিতে। আগ্রার এই অংশে ছিলো 'তেজ-মহা-আলয়' নামে খ্যাত শিবমন্দির। একে ঘিরে ছিলো নগরের প্রাচীর, ঠিক যেমনটি দেখা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সব ভারতীয় মন্দিরেই। বস্তুত, 'কালান্দর দরজা' হয়তো কোন সংস্কৃত নামের মুসলিম অপভ্রংশ। আমাদের মতে প্রাচীনকালে সম্মুখের মুখ্য প্রবেশ পথটাই হচ্ছে 'তাজগঞ্জ দরজা'। এর প্রকাণ্ড কাঠের দরজা এখনো অটুট আছে।

তাজমহলের মতো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের অসংখ্য প্রাক্তন হিন্দু প্রাসাদ মুসলিম অধিকারে এসে কবর, মসজিদ, মুসলিম নির্মিত দুর্গ প্রভৃতি মিথ্যা নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। Bayard Taylor নামে একজন আমেরিকান পরিদর্শকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। Keene-এর Handbook-এর ১৭৭ পাতায় তাঁর থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। তিনি বলছেন, 'আমি এটা দেখে হতবাক হয়ে গেছি যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র-বিন্দুতে কলাবিদ্যার সামান্যই উন্নতি হয়েছে, অথচ অনেক দূরবর্তী দেশে (ভারত, স্পেন) এর খুব দ্রুত, সুন্দর পরিণতি ঘটেছে।'

Taylor বোঝাতে চাইছেন, স্পেন এবং ভারতের মতো দূরদেশে মুসলিম আক্রমণকারীরা জাঁকজমকপূর্ণ সুন্দর সব প্রাসাদ বানিয়েছেন বলে মনে করা হয়, অথচ সিরিয়া, ইরাক এবং আরবের অন্যান্য দেশে তাঁদের এই ধরনের কৃতিত্বের সামান্যই স্বাক্ষর আছে।

আমরা Taylor ও তাঁর মত অন্যান্যদের সরলতাকে করুণা করি। সুদূর স্পেন এবং ভারতে যা তাঁরা মুসলিম প্রাসাদ বলে ভাবছেন, তা আদৌ মুসলিম নির্মিত নয়। সেগুলো সবই দখল করা দেশী প্রাসাদ, যা প্রাক-মুসলিম যুগে স্থানীয় কারিগরেরা বানিয়েছিলো। মুসলিম বিজয়ীরা সেগুলো আত্মসাৎ করে শুধু বাহ্যিক সামান্য পরিবর্তন এবং মিথ্যা ইতিহাসের সাহায্যে নিজেদের বলে দাবী করেছেন! আমাদের এই আবিষ্কার স্পেনকে সাহায্য করবে তার প্রাচীন প্রাসাদগুলির নির্মাণ কৃতিত্বের মিথ্যে মুসলিম দাবী নস্যাৎ করতে।

জ্ঞাতব্য হিসেবে আমরা আরো যোগ করতে চাই যে, তাজমহল দিল্লীর

তথাকথিত কুতুবমিনারের চাইতে সামান্য কিছু উঁচু। তাঁর বইয়ের ১৭৪পৃষ্ঠায় Keene বলছেন যে, বাগানের সমতল থেকে প্রধান গম্বুজের ত্রিশূলের ফলার উচ্চতা ২৪৩½ ফিট আর কুতুব মিনারের উচ্চতা হচ্ছে ২৩৮ ফিট ১ ইঞ্চি। যেহেতু দর্শকেরা ত্রিশূলের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে পারেন না, তাঁরা এর শীর্ষসমেত মোট উচ্চতার ধারণা করতে পারেন না।

কিছু ইংরেজের নামসমেত গোড়ার দিকের কিছু সংস্কারকারীর নাম গম্বুজের ফলায় খোদিত আছে।

কাজেই এই গম্বুজের ফলার খোদাইতেও শাজাহানের পক্ষ থেকে কোন দাবী অনুপস্থিত।

একবিংশ অধ্যায়

রাজায় রাজায় যুদ্ধ

প্রায় তিনশো বছর ধরে ভুল করে মেনে আসা হলেও শাজাহান তাজমহলের নির্মাতা তো ননই, বরং তাজের দখল ও স্বত্ব নিয়ে জয়পুরের শাসক জয়সিংহের সাথে মুঘল সম্রাট শাজাহানের তীব্র মতান্তর ও কলহের নজির আছে।

মুঘলদের রাজধানী আগ্রায় অবস্থিত বর্ণাঢ্য তাজমহলের অতুলন সম্পদ, যথা সোনার গরাদ, রুপোর দরজা, মুক্তোর পর্দা, মণিখচিত মর্মরের জাফরি প্রভৃতি বহুদিন ধরেই শাজাহানকে প্রলুব্ধ করেছিলো। রাজকীয় ক্ষমতার বলে ঐ সম্পদ আত্মসাৎ করতে তিনি উৎসুক ছিলেন। মমতাজের মৃত্যুতে সমাধির নাম করে প্রাসাদটি জবরদখল করার সুযোগ এসে গেলো শাজাহানের হাতে।

বিভিন্ন কারণে শাজাহান কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিলেন। প্রথমত, জয়সিংহ ছিলেন মুঘলদের বশম্বদ এক সামন্ত রাজা। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে থাকতেন আগ্রার কয়েকশো মাইল দূরে। জয়পুর রাজের মন্দির প্রাসাদের চারপাশে সৈন্যদের এক বেষ্টনী খাড়া করে প্রাসাদটি কার্যত জবরদখল করা ছিলো শাজাহানের পক্ষে সহজ এবং জয়পুর শাসকের তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা ছিলো না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের হাতে যে সমস্ত নথি এসেছে, তাতে এই বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে।

R—176 ও R—177 নম্বরের দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নথি জয়পুর রাজপরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারী কর্নেল ভবানী সিংএর ব্যক্তিগত হেফাজতে আছে। জয়পুর শহরের City Palace Museum এ তাঁর নিজের সীলমোহরে নথিগুলো রক্ষিত আছে। নথিদুটির ফটোকপি পাওয়ার জন্য কর্ণেল ভবানী সিং ও মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের সমস্ত চিঠিপত্রই উপেক্ষিত হয়েছে। ভাসাভাসা যে জবাব পাওয়া গেছে, তাতে নামগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু এগুলোর বক্তব্য ও ফটোকপি দেওয়া হয়নি।

নামগুলো রক্ষণে এই গোপনীয়তা থেকে কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমত, জয়পুর রাজপরিবারের অধিকারভুক্ত একটি অতি মূল্যবান প্রাসাদ শাজাহান কর্তৃক দখল, বাজেয়াপ্ত ও কলুষিত হওয়াটা খুবই ক্ষতিকর ও

অপমানজনক হওয়ায়, তার পর থেকেই জবরদখলের এই চরমপত্র দুটি জয়পুর শাসকের ব্যক্তিগত গোপন মহাফেজখানায় সঙ্গোপনে রক্ষিত হয়ে এসেছে। হয়তো কর্ণেল ভবানী সিং তাঁর পূর্বপুরুষের দ্বারা গোপনে সংরক্ষিত এই দুটি এবং অন্যান্য নথির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন। ইতিহাস গবেষণায় ঝোঁক না থাকায় তিনি এগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে হয়তো মাথা ঘামাননি। ঐতিহ্যগত পারিবারিক গোপনীয়তা ভঙ্গ করে এগুলোর বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করার সুযোগও অন্যকে তিনি সহজে দেবেন না।

এই পরিস্থিতিতে আমরা কেবল আশা করতে পারি যে, পাঁচশতেরও অধিক ভারতের প্রাক্তন রাজন্য পরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের বুঝিয়ে তাঁদের হেফাজতের সমস্ত গোপন ঐতিহাসিক তথ্য ক্রমে গবেষকদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। অতি সন্তর্পনে সংরক্ষিত এই সমস্ত নথির বিষয়বস্তু ভারতীয় ইতিহাসে যুগান্তর আনবে। মুঘলদের ঘনিষ্ট সাহচর্যে অভ্যস্ত জয়পুর শাসক পরিবারের হেফাজতের কাগজপত্র এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে কাজে লাগবে। সম্ভবত এই নথিগুলোতে বিভিন্ন জবরদখল, বাজেয়াপ্তি, অপমান, রাজকন্যা অপহরণ, প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণের অজানা নানা তথ্য থাকবে।

জয়পুর মহাফেজখানায় সন্তর্পনে সংরক্ষিত এই নথিদুটোর বিষয়বস্তুর সম্পর্কে কিছুটা সূত্র পাওয়া যাবে, Rajasthan State Archive এবং ভারত সরকারের Archives প্রকাশিত Catalogue of Documents এ এদের সম্পর্কে লিপিবদ্ধ মন্তব্য থেকে।

R—176 নং নাম সম্পর্কে মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, জয়পুর শাসক কর্তৃক শাজাহানকে প্রদত্ত এক টুকরো খাস জমির পরিবর্তে শাজাহান কর্তৃক ঐ শাসককে চারটি হাভেলী (প্রাসাদ) দানই এই নথির বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয় নথি সম্পর্কে মন্তব্য হচ্ছে, পাঁচজন ব্যক্তির দখলে থাকা চারটি প্রাসাদের বিনিময়ে তাজ নির্মাণের জন্যে এক টুকরো জমি লাভই নাকি এর বিষয়বস্তু। মন্তব্যে এই পাঁচজন ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই পাঁচটি নামই হিন্দু। এছাড়াও, চাঁদাসিং, ভগবান দাস প্রভৃতি নাম থেকে মনে হয় যে, তাঁরা সকলেই জয়পুর রাজপরিবারের লোক। রাজা ভগবান দাস ছিলেন মানসিংহের সমসাময়িক ও সম্পর্কে খুল্লতাত, আর যে জয়সিংহের কাছ থেকে তাজমহল কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো, তিনি ছিলেন মানসিংহের নাতি।

নথিপঞ্জীর মন্তব্যে এই দুটি নথির বিষয়বস্তুতে তেমন কিছু ফারাক ধরা পড়ে না। কেবল দ্বিতীয় নথি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, পাঁচজন ব্যক্তি চারটি প্রাসাদের মালিক ছিলেন এবং তাদের নামও দেওয়া হয়েছে।

খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ ও আইনজ্ঞ মাফিক জেরার পদ্ধতিতে যাঁরা অভ্যস্ত নন,

সেইসব ঐতিহাসিক এই নথিপঞ্জীর বর্ণনাকেই শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের ঘনিষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে ধরে নেবেন। এযাবৎ তাই হয়ে এসেছে। কিন্তু পাঠক দয়া করে বিপথগামী হবেন না। আমরা আলোচনা করে দেখাবো যে, নথিপঞ্জীর বর্ণনা আমাদের এই বক্তব্যেরই সমর্থন করে যে, শাজাহান একটি প্রাচীন মন্দির প্রাসাদ জবর দখল করেছিলেন।

প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে যে, শাজাহানের আমলের ফার্সী ভাষায় লিখিত নথির বদলে আমরা কেবল এদের সারাংশের উল্লেখই পাই নথিপঞ্জীর ইংরেজী মন্তব্যে।

এরপর বিস্ময় জাগে, জয়পুর-শাসক যে নথি কাউকে দেখাতে চাননা, তার সারাংশ কিভাবে পাওয়া সম্ভব। স্পষ্টত, এই বিভ্রান্তিকর সারাংশ হয় জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে, নয় জালিয়াতি করে পৃথিবীর ওপর চাপানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, একই ব্যাপারে দুটি নথির অস্তিত্বও আমাদের বিস্ময় জাগায়। দ্বিতীয় নথিতে অতিরিক্ত সংযোজনটুকু কেবল চারটি প্রাসাদের পাঁচজন মালিকের নাম উল্লেখেই সীমাবদ্ধ। প্রথম নথিতেই এই নামগুলো থাকা উচিত ছিলো। এক টুকরো জমির বিনিময়ে প্রদত্ত প্রাসাদগুলির মালিকের নাম কেন প্রথম নথিতে দেওয়া হয়নি।

তৃতীয়ত, চারটি প্রাসাদের পাঁচজন মালিক কিভাবে সম্ভব? তাঁরা সবাই কি একযোগে চারটি প্রাসাদেরই মালিক ছিলেন? অথবা হয়তো কোন কোন প্রাসাদের মালিক একক ছিলেন, বাকীরা অন্যসব প্রাসাদের যৌথ মালিক ছিলেন।

চতুর্থত, মুঘল রাজসভা ও জয়পুর শাসক পরিবারের মধ্যেকার এই বিনিময় কি পরিচ্ছন্ন ও সন্দেহের অতীত ছিলো? তাহলে নথিগুলো সম্বন্ধে এত গোপনীয়তা কেন? শাজাহান কর্তৃক জয়পুরের শাসককে লেখা অন্যান্য ফার্সী চিঠি থেকে আলাদা করে এগুলোকে এখন বিকানীরের Rajasthan State Archives-এ রাখা হয়েছে কেন?

পঞ্চম প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ চারটি প্রাসাদের মালিক যদি জয়পুর রাজের আত্মীয়রাই হন, তাহলে একজন মুসলিম শাসক কিভাবে জয়পুর শাসকেরই এক টুকরো জমির বিনিময়ে এগুলো হস্তান্তর করেন? কেউ কি নিজে কিছু পাবার জন্য 'ক' এর সম্পত্তি 'খ' কে দিতে পারে? এটি কি যুক্তিসহ, স্বাভাবিক বাণিজ্য? শাজাহান নিজে কিছুই ত্যাগ না করে বিনিময়ে জমি নেন কিভাবে? কিসের বদলে?

তাই মনে হয় যে, Rajasthan State Archives-এর নথিপঞ্জীতে এই

নথিদুটি সম্পর্কে যিনি মন্তব্য রেখেছেন, সেই আধুনিক গবেষক হয় অজ্ঞ নয় বোকা। ভারত সরকারের নথিপঞ্জীতে স্পষ্টই উল্লেখিত আছে যে, রাজস্থান-সংক্রান্ত সমস্ত নথির বিবরণ তাঁরা Rajasthan Archives-এর অনুরূপ বিবরণ থেকে নিয়েছেন। অর্থাৎ, ভারত সরকার ও রাজস্থান সরকারের নথিপঞ্জী দুটির মন্তব্য পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। Rajasthan Archives এর Catalogue এর ভ্রান্ত মন্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ভারত সরকারের Catalogue-এ।

পরের প্রশ্ন হচ্ছে, নথিপঞ্জীর এই বিভ্রান্তিকর মন্তব্য কি অকৃত্রিম সত্যি অথবা প্রতারণার চেষ্টাই এর প্রেরণা? যে কোনটিই অবশ্য সত্যি হতে পারে। হয়তো কোন নিদ্রালু আমলা মহাফেজখানা থেকে একগুচ্ছ পুরণো, হলুদবর্ণের, সপ্তদশ শতকের, স্বল্প পরিচিত ফার্সীভাষার অখ্যাত নথি পঞ্জীভুক্ত করার ভার পেয়ে ঐ বিভ্রান্তিকর মন্তব্য রেখেছিলেন। ঐ নথি প্রকাশের সময়ও সবাই বিশ্বাস করতেন যে, শাজাহানই তাজের নির্মাতা। তাই, ঐ আমলা মমতাজের সমাধি ও কিছু প্রাসাদ সমুচ্চয়ের কথা একজায়গায় দেখে অসতর্কভাবে মন্তব্য লিখে গেছেন যে, শাজাহান চারটিপ্রাসাদ জয়পুরশাসককে দিয়ে পরিবর্তে এক টুকরো খালি জমি নিয়েছিলেন। কিন্তু শাজাহানের নিজের সভা-নামচা থেকে আমরা জানি যে, শাহাজাহানই ঐ প্রাসাদ সমুচ্চয়ের দখল পেয়েছিলেন। বিনিময়ে হয়তো তিনি একটুকরো জমি দিয়েছিলেন। অবশ্য, তাতেও সন্দেহ আছে।

জয়পুর মহারাজার অধিকারে সংরক্ষিত এই নথিদুটির বক্তব্য শাজাহানের নিজের সভা নামচার বিপরীত হওয়া উচিত নয়। বিশেষত, যখন জয়পুর শাসককে লেখা শাজাহানের চিঠিতেই ঐ নথিদুটির উৎপত্তি। শাজাহানের নিজের বাদশানামার বর্ণনার সঙ্গে এই নথিদুটিরমন্তব্যসম্পূর্ণ মিলে যেতে হবে। বাস্তব অবস্থাও তাই এবং আমরা আগেই তা আলোচনা করে দেখিয়েছি।

আরেকটি সম্ভাবনা হচ্ছে, নথিগুলির অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুসম্পর্কে নথিপঞ্জীতে ইচ্ছে করেই বিভ্রান্তিকর বিবরণ রাখা হয়েছে। জগৎকে এভাবে ভুলবোঝানোর পেছনে হয়তো কোন কায়েমী স্বার্থ আছে। হয়তো, শাহাজানকে তাজের নির্মাতা হিসেবে বিশ্বাসী প্রথাগত ইতিহাসে অভ্যস্ত ঐ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নথিদুটিতে বিপরীত তথ্য পেলেও মিথ্যেটাকেই জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। আবার, হয়তো ঐ আমলা শাজাহান অথবা মুঘলদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ পোষণ করতেন। তাই, শাজাহানকে দেওয়া গৌরব মিথ্যে হলেও যেন অব্যাহত থাকে, তা দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। ফার্সী পণ্ডিতদের মধ্যে এই ধরনের গোঁড়া সমর্থক খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়। আরবদের মতো তাঁরাও পারস্যকে ইসলামের সাথে এক করে দেখেন! ভুলে যান যে, তাঁদের পূর্বপুরুষদের একটি প্রাক্-মুসলিম ঐতিহ্য ছিলো।

স্বেচ্ছাকৃত হোক বা নাই হোক, নথিপঞ্জির এই বিভ্রান্তিকর বিবরণ থেকেও বুদ্ধিমান পাঠক নথিগুলোর আসল বক্তব্য সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত পেতে পারেন। এই নথিদুটি আসলে জয়সিংহকে পাঠানো শাজাহানের চরমপত্র। এতে জয়সিংহকে সম্ভবত জানানো হয়েছে যে, আগ্রায় জয়পুর শাসক পরিবারের অধিকারভুক্ত চারটি প্রাসাদের দখল শাজাহান নিলেন, দৃশ্যত মমতাজের কবরের জন্য। বিনিময়ে তাঁকে এক টুকরো জমি দেওয়া হলো।

মনে হয় যে, বহুমূল্য প্রাসাদ-সমুচ্চয়ের পরিবর্তে এক টুকরো জমি দিয়ে ক্ষতিপূরণ করার আশ্বাস, এই আত্মঘাতের দুর্বিসহ ক্ষতের ওপর প্রলেপ দেবার জন্য দেওয়া হয়েছে। তা না হলে, জয়সিংহকে দেওয়া এই জমিটির অবস্থান, আয়তন ও পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকতো।

তা যাই হোক, এযাবৎ পৃথিবী যা বিশ্বাস করে এসেছে, তার ঠিক বিপরীত-ভাবেই শাজাহান ঐ প্রাচীন, বর্ণাঢ্য তাজমহল প্রাসাদ সমুচ্চয় জবরদখল করে, তার বদলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে জয়সিংহকে একটুকরো খালি জমি দিতে পারেন।

তাহলেও, কর্ণেল ভবানী সিং এর হেফাজতে রক্ষিত ঐ দুটি নথি গভীর-ভাবে খুঁটিয়ে দেখার গুরুত্ব সর্বাধিক। হয়তো এগুলোতে 'তাজমহল' কথাটির উল্লেখ আছে। তিনশো বছর ধরে সারা পৃথিবীকে যে তাজ-ইতিকথা ধোঁকা দিয়ে এসেছে, তার বিভিন্ন দিক তন্ন তন্ন করে আলোচনা করেও, একমাত্র Tavernier-এর বিবরণ ছাড়া মুঘল অথবা অমুঘল কোন বর্ণনাতেই আমরা এযাবৎ ঐ কথাটির সাক্ষাৎ পাইনি। একমাত্র Tavernier-এর ভ্রমণ বিবরণীতেই আমরা 'তাস-ই-মকান' কথাটি পাই। ফরাসী উচ্চারণে এটি দাঁড়ায় 'তাজ-ই-মকান।' ভারতীয় পরিভাষায় 'মকান' শব্দটির অর্থ প্রাসাদ। Tavernier লিখে গেছেন যে, শাজাহান ইচ্ছে করেই সুদৃশ্য তাজমহলের সন্নিকটে মমতাজকে সমাহিত করেছিলেন। তাঁর লেখায় বোঝা যায় যে, মমতাজের মৃত্যুর আগেও তাজমহলের অস্তিত্ব ছিলো।

এরপর আমরা আরো তিনটি নথি পরীক্ষা করবো। এগুলোকে নির্দেশ না বলে জয়সিংহের কাছে শাজাহানের অনুরোধও বলা চলে। এদের একটিতে চতুর্থ আরেকটি নথির উল্লেখ আছে। এই চতুর্থটিও শাজাহান কর্তৃক জয়সিংহের নিকট প্রেরিত বার্তা। কাজেই লক্ষ্যনীয় যে, এদের সবগুলোরই প্রেরক এক ব্যক্তি কিন্তু অপরপক্ষে, বার্তা গ্রহীতা জয়সিংহ সম্পূর্ণ নীরব। তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়াই পাওয়া যায়নি। স্পষ্টতই তিনি পিতৃপুরুষের মূল্যবান প্রাসাদ সমুচ্চয় জবরদখল ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে রাগে ফুঁসছিলেন। তাই, মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে যখন নির্দেশের পর নির্দেশ আসছিলো, জয়সিংহ সম্পূর্ণ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে এগুলো অমান্য করে যাচ্ছিলেন।

খসিয়ে তা দিয়ে সমাধিস্তম্ভ তৈরী করেছিলেন। অর্থাৎ, তাজমহলের দুটি সমাধিস্তম্ভেরই মর্মর নেওয়া হয়েছিলো, বর্তমানে সাধারণের নিকট নিষিদ্ধ, ওপরতলার কিছু কক্ষ থেকে। এই ওপরতলার কক্ষের মর্মর কিভাবে খসিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার একটি ফটো আমরা জোগাড় করেছি। তাই, শাজাহান তাজমহলের নির্মাতা তো ননই, বরং একে অপবিত্র ও কলুষিত করার দায়িত্বই তাঁর ওপর বর্তায়।

অধ্যাপক R. Nath এর প্রবন্ধে শাজাহান কর্তৃক জয়সিংহকে প্রেরিত অপর যে নির্দেশের উদ্ধৃতি আছে, তার তারিখ ৪, রবিওলআওল, ১০৪১ হিজরী অর্থাৎ ৯ই সেপ্টম্বর ১৬৩২ খৃঃ। প্রথমটির প্রায় নয় মাস পর এটি প্রেরিত হয়েছিলো। এটিতেও আগেকার দাবীরই পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, 'মুলুকশাহকে পাঠানো হয়েছে অম্বরে (অর্থাৎ জয়পুরের নিকটবর্তী প্রাচীন রাজধানী আমেরে) (মারকাণায়) নতুন খনি থেকে মর্মর সংগ্রহের জন্য। আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই মর্মর পরিবহনের জন্য কিছু শকট ভাড়া করা হোক। মর্মরের ক্রয়মূল্য ও শকটের খরচ রাজকোষ থেকে দেওয়া হবে। মুলুকশাহ্‌কে যথেচ্ছ মর্মর সংগ্রহের জন্য সাহায্য করা হোক। এই মর্মর সংগ্রহ করে ভাস্করদের নিয়ে রাজধানীতে দ্রুত আগমনের ব্যাপারে তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা হোক'।

মমতাজের মৃত্যুর দু এক বছরের মধ্যেই মর্মর সংগ্রহের জন্য শাজাহানের পাঠানো তিনটি নির্দেশ থেকেই বোঝা যায় যে, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন পরিকল্পনা বা নকসা তৈরী করা সম্ভব ছিলো না বলে, কি পরিমাণ মর্মরের প্রয়োজন হবে তার সঠিক আন্দাজ করাও সম্ভব হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ ও কোরাণের বয়েত খোদাইয়ের জন্য শাজাহানের স্বল্পপরিমাণ মর্মরের প্রয়োজন ছিল এবং তাও তাঁকে বারবার চাইতে হচ্ছিলো একজন অসহযোগী সামন্ত নৃপতির কাছে।

তৃতীয় নির্দেশটির তারিখ হচ্ছে ৭ সফর, ১০৪৭ হিজরী অর্থাৎ ২১ শে জুন, ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয়টির প্রায় পাঁচ বছর পর এটি পাঠানো হয়েছিলো। এর বক্তব্য হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে যে, তোমার লোক ঐ অঞ্চলের প্রস্তর খনকদের অম্বর ও রাজনগরে আটক করে রেখেছে! এতে মাকরাণার খনিতে লোকের অভাব হচ্ছে ফলে (মর্মর সংগ্রহের) কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাই, নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, অম্বর ও জয়নগরে যেন কোন প্রস্তর খনক আটক না থাকে এবং এদের সবাইকে মাকরাণায় মুৎসুদ্দীর (তত্ত্বাবধায়ক) কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়'।

নির্দেশটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জয়সিংহ শাজাহানকে মর্মর প্রেরণ তো করেননি বরং প্রস্তরখনকদের আটকে রেখে তাজমহল প্রাসাদ সমুচ্চয়কে একটি বিষণ্ণ কবরে রূপান্তরিত করার শাজাহানের প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাতে চেয়েছিলেন।

ওপরে উল্লেখিত তিনটি এবং এদের একটিতে উল্লেখিত চতুর্থ নথি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাজমহল নিয়ে জয়সিংহ ও শাজাহানের মধ্যে গুরুতর বিরোধ ঘটেছিলো। এগুলো উদ্ধৃত করে R. Nath. সুনির্দিষ্ট ভাবে 'প্রমাণ' করেছেন যে, শাজাহান জয়সিংহের কাছ থেকে তাজমহল জবর দখল করে এর মণিমুক্তো আত্মসাৎ করেন। অবশ্য তিনি এর বিপরীতটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

যেহেতু আমরা একজন অধ্যাপকের বক্তব্য আলোচনা করেছি, আরেক-জনের কথাও উল্লেখ করা যাক।

এই দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের Iowa বিশ্ববিদ্যালয়ে Indian and Islamic Art-এর সহকারী অধ্যাপেক *D*r. Wayne, E. Begley। ১৯৭৬ সালে তিনি ভারত পরিদর্শনে আসেন। তাজমহল যে মমতাজের প্রতি শাজাহানের ভালোবাসার স্মারক, এই প্রচলিত ইতিকথা Prof. Begley সঠিকভাবেই নস্যাৎ করেন। এরজন্য তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আরেকটি বিচ্যুতি তাঁর হয়েছে। তিনি এখনো শাজাহানকেই তাজমহলের নির্মাতা বলে বিশ্বাস করেন এবং প্রাসাদটিকে বর্ণনা করেন 'স্বর্গ ও ঈশ্বরের সুমহান রূপ ফুটিয়ে তোলার (তার মানে যাই হোক না কেন) একটি অহংকারী প্রচেষ্টা হিসেবে।'

তাজ-ইতিকথার প্রহেলিকা থেকেই বোঝা যায় যে, মমতাজ-শাজাহানের কল্পিত প্রেমগাথার ওপর ভিত্তি করে গবেষণা চালিয়ে শত শত বছর ধরে সারা পৃথিবীতে বহু পণ্ডিত সুনাম অর্জন করে এসেছেন। এই মিথ্যের আবরণ থেকে সত্যিকে খুঁজে বের করার দুরূহ কিন্তু সঠিক কাজের ভার পাঠকদের ওপরই রইলো।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কার্বন-১৪ পরীক্ষা

শাজাহান যে তাজমহলের নির্মাতা নন, আমাদের এই মতবাদ প্রকাশিত হবার পর অনেক স্থপতি, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ও পদার্থবিদ জানিয়েছেন যে, তাঁদের বিভিন্ন পরীক্ষার সিদ্ধান্ত প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

স্থপতিদের বক্তব্য, তাজমহল যে হিন্দু রীতিতে নির্মিত একথা আমরা প্রমাণ করতে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু সেটিই চরমতম প্রমাণ নয়। কেননা, যদিও E. B. Havell এর উদ্ধিতে আমরা দেখিয়েছি যে, তাজমহল হিন্দু মন্দিরের বৈশিষ্ট্যেই নির্মিত, তথাপি পৃথিবী জুড়ে স্থপতিরা শাজাহানকেই তাজমহলের নির্মাতা ভেবে নিজেদের ভুলিয়ে রেখেছেন।

শাজাহান যে মমতাজের কবরের জন্যে একটি প্রাচীন প্রাসাদ সমুচ্চয় জবর-দখল করেছিলেন, মুঘল রাজসভার কাগজপত্র থেকে তার উদ্ধৃতি আমরা দিলেও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তাজের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁদের আগেকার বিভ্রান্তিকর ধারণাই আঁকড়ে রেখেছেন।

পদার্থবিদেরা দাবী করেছেন যে, তাজের সঠিক বয়স জানার জন্য কার্বন-১৪ পরীক্ষার আশ্রয় নেওয়া হোক। আমরা ঐ পরীক্ষাতেও সফলকাম হয়েছি। তথাপি, পৃথিবীর অধিকাংশই এখনো প্রথাগত শাজাহান ইতিকথায় বিশ্বাসী।

এ থেকে শিক্ষণীয় যে, প্রমাণের অভাব নয়, শিক্ষক ও চিন্তাবিদ্‌দের কাপুরুষতা ও অসততাই শাজাহান যে তাজমহলের নির্মাতা নন, এই সত্যি স্বীকারের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ঘুমন্তকে জাগানো যায় কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না' এই প্রবাদ বাক্যটিকে আমরা উদাহরণ স্বরূপ নিতে পারি। তাজের উৎপত্তির প্রথাগত ধারণার ভ্রান্তি থেকে জগতকে জাগরুক করতে গিয়ে অনুরূপ অভিজ্ঞতাই লাভ হয়েছে। পৃথিবী এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগে উৎসুক নয়। সত্যিই তা চাইলে, আমরা যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি, তাই চাই চরম এবং যথেষ্ট বিবেচিতো হতো।

এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠকদের বলতে চাই যে, যথায ভাবে যুক্তির ধোপে টেঁকা সাক্ষ্যের গুরুত্ব কোন একক প্রত্নতাত্ত্বিক বা পদার্থবিজ্ঞানেয় পরীক্ষার চাইতে অধিক।

কোন সন্দেহজনক মৃত্যুর কথা ধরা যাক। এটি হয় হত্যা না হয় আত্মহত্যা। এটি অর্দ্ধেক মৃত্যু ও বাকীটা আত্মহত্যা হতে পারে না। আত্মহত্যার মতবাদের সঙ্গে খাপ না খাওয়া একটি আপাতঃ অসংলগ্ন সূত্র থেকেই বোঝা যায় যে, এটি হত্যা। তাঁজমহলের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়েছি যে, প্রথাগত তাজ-ইতিকথার সমস্তটাই আগাগোড়া ধাপ্পার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মমতাজের প্রতি শাজাহানের অত্যধিক আসক্তির কথার ইতিহাসে কোন উল্লেখ নেই। শাজাহানের সমকালীন মুঘল রাজসভার কাগজপত্রে তাজমহল কথাটির উল্লেখ নেই। মমতাজের মৃত্যুর সঠিক তারিখও অজানা। তাজের নক্সাকারক, নির্মাণের কাল এবং খরচ প্রভৃতি সবই অজানা। কাজেই, সদবুদ্ধি-সম্পন্ন যে কোন আগ্রহী ব্যক্তির পক্ষেই বোঝা সহজ যে, শাজাহান ইতিকথার সমস্তটাই বানানো। তাই, তথাকথিত পণ্ডিতদের আরো অধিক প্রমাণ ও পরীক্ষার দাবী রাখাটা অযৌক্তিক ও অপণ্ডিত সুলভ। বরং, শাজাহান-মতবাদের প্রবক্তাদের তাদের দাবী প্রমাণ করার আহ্বান জানোনাই তাঁদের উচিত। এই পুস্তকটিতে আমাদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হবে যে, তাজ সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথার পরিপোষকেরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন জোরালো প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি। ভাবতেও অবাক লাগে, কিসের ভিত্তিতে তাঁরা এযাবৎ সারা পৃথিবীকে ধোঁকা দিয়ে এসেছেন।

শাজাহানের বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বে যে সম্পূর্ণ অমুসলিম উদ্দেশ্যে তাজমহল নির্মিত হয়েছিলো, আমাদের এই বক্তব্য আমরা উপস্থাপিত করেছি। জগতের উচিত, বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করে এই মতবাদকে যাচাই করে দেখা। বিভিন্ন লোকের মর্জিমাফিক আমরাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করবো, তা আশা করা উচিত নয়। আমাদের বক্তব্য যে সঠিক, তাতে আমরা নিঃসন্দেহ। যাঁরা সন্দেহ করবেন, তাঁদেরই উচিত বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

তাজের এক পাশ্চিমী পরিদর্শক, তাজ-সমুচ্চয়ের পরিবেষ্টনকারী লাল-পাথরের দেয়ালের পূর্ব দিকে নদীর ধারের এক ভগ্নপ্রায় দরজার একটি টুকরো সংগ্রহ করেছিলেন। এটির ওপর কার্বন ১৪-পরীক্ষা প্রয়োগ করা যায় কিনা জিজ্ঞাসিত হয়ে জানিয়েছিলাম যে, ফলাফলের গুরুত্ব জেনে নিয়ে তিনি সানন্দে ঐ পরীক্ষা চালাতে পারেন।

তাঁকে আমরা বোঝাই যে, আমাদের মতে, শাজাহানের অন্তত পাঁচ শতাব্দী পূর্বেও তাজমহলের অস্তিত্ব ছিলো। ফলে মুহম্মদ ঘোরী, তৈমুর লং, সিকান্দার লোদীর মত অনেক মুসলিম অত্যাচারীই এর ওপর আক্রমণ চালিয়ে গেছেন। এর প্রবেশপথের ওপরই হামলার চোট পড়ে সর্বাগ্রে এবং ফলে এর দরজা বিনষ্ট বা পুড়ে গিয়ে থাকতে পারে। কাজেই, এই প্রাসাদের প্রত্যেক নতুন

মালিককেই নতুন করে দরজা লাগাতে হয়েছে। হয়তো, রূপো বসানো দরজা আত্মসাৎ করে শাজাহান নিজেই নতুন দরজা লাগিয়েছেন, যদি না, কেবল দরজার বাইরের রূপোটুকু তুলে নিয়েই তাঁর সন্তুষ্টি ঘটে থাকে। অর্থগৃধ্নু শাজাহানের পক্ষে দরজার সৌষ্ঠবহানি করে কেবল রূপোটুকু তুলে নেওয়া শক্ত নয়। কাজেই, এমনও হতে পারে যে, তাজমহলের দরজাগুলো শাজাহানের পূর্বেকার আমলের হলেও এবং এগুলোর ওপর কার্বন-১৪ পরীক্ষা চালানো হলেও, আসল প্রাসাদ-সমুচ্চয়ের বয়স দরজার চাইতেও অনেক বেশী। এই বক্তব্য খেয়ালে রেখেই ঐ পশ্চিমী পরিদর্শককে আমরা কার্বন-১৪ পরীক্ষা চালাতে বলি। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ঐ পরীক্ষায় আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য সর্বাংশে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। পাশ্চাত্তের দরজার কার্বন-১৪ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এর কাঠের সময়কাল শাজাহানের কয়েক শতাব্দী পূর্বে হলেও, আমাদের বিশ্বাসমতো, তাজমহল প্রাসাদ সমুচ্চয়ের মতো প্রাচীন নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিশ্লেষণ যে একক কোন প্রমাণের চেয়ে অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ, আমাদের এই বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে ওপরের ঘটনায়।

আমরা জোরগলায় বলতে চাই যে, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাজ-রহস্যের উন্মোচনে এযাবৎ করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনশো বছর ধরে তাঁরা তাজমহল সম্পর্কে মাথা ঘামিয়েও বোধ করতে পারেননি যে, এটি শাজাহানের বেশ কয়েক শতাব্দ পূর্বেকার প্রাসাদ। বর্ণাঢ্য, উজ্জ্বল, এই তাজমহল অত্যুচ্চ মহিমায় চোখের সামনে বিরাজমান বহুদিন ধরে। খননের সাহায্যে একে আবিষ্কার করার প্রশ্ন ওঠে না। তবুও, এটিকে শাজাহানের পূর্বেকার একটি প্রাসাদ হিসেবে চিনতে পারায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের অক্ষমতা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই লজ্জা দেবে।

যাই হোক, কার্বন-১৪ পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেবার আগে আমরা এই পরীক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠককে কিছু অবহিত করতে চাই।

এই পরীক্ষা সাধারণত প্রাণীদেহের বা উদ্ভিদের অবশেষের ওপর চালানো হয়। তাই, তাজমহলে ব্যবহৃত কাঠের একটি টুকরোর ওপর এই পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো।

কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবনহানির পর এর শরীরের কার্বনের ভাগে আর সংযোজন হয় না। ঐ সময় থেকে পদার্থবিজ্ঞানের জানা একটি নির্দিষ্টহারে কার্বনের ভাগ কমে যেতে থাকে।

কার্বন-১৪ পরীক্ষার জন্য কোন নমুনা পেলে বৈজ্ঞানিক আগে জেনে নেন, 'মৃত্যুর' সময় এই কার্বনের পরিমাণ কত ছিলো। তারপর তাঁরা দেখেন পরীক্ষার সময় কতোটা ভাগ হয়ে রয়ে গিয়েছে। এই দুটি পরিমাণের বৈষম্য থেকে

তাঁরা নমুনার বয়স নির্ণয় করেন। যেহেতু, কাঠ কিম্বা বাঁশকে হীরের মতো সংরক্ষিত রাখা হয়না এবং বৃক্ষচ্ছেদনের পাঁচ বা দশ বছরের মধ্যেই এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কার্বন-১৪ পরীক্ষায় পাওয়া বয়স থেকে আমরা ন্যূনাধিক পাঁচ বা দশ বছরের সীমার মধ্যে ঐ দরজার নির্মাণের কাল পেতে পারি।

কিন্তু, নমুনা হিসেবে নেওয়া টুকরোটি যে তাজের আদি নির্মাতাদের দ্বারা প্রকৃতই ব্যবহৃত হয়েছিলো, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। তাজমহলের ক্ষেত্রে আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি যে, বর্তমানের দরজাগুলো সম্ভবত পরবর্তীকালে আগেকার দরজার পরিবর্তে লাগানো হয়েছে।

পুরো তাজমহল প্রাসাদ ইট ও বাঁশের বরগার ওপর তৈরী হয়েছে বলা হয়। তা সঠিক হলে, ঐ বরগার বাঁশ পরীক্ষা করে আমরা তাজের সঠিক বয়স জানতে পারবো। কিন্তু তাজের নীচে ভিত্তির ঐ বরগা পর্যন্ত পৌঁছুতে গেলে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে। তাছাড়া, সরকারও হয়তো কোন বেসরকারী সংস্থাকে এই ধরণের কোন খনন বা পরীক্ষার অনুমতি দেবেন না। এতে খরচও পড়বে প্রচুর। এসব নানা কারণে বলা যায় যে, জনগণ যদি সত্যিই তাজের ওপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালাতে উৎসুক হন, তাহলে সরকারের ওপর এই ব্যাপারে চাপ দেওয়া উচিত। আমাদের মতো সামান্য লেখককে নয়। আমরা যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করে জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছি, কিভাবে সুদৃশ্য তাজের উৎপত্তি সম্পর্কে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আসা হয়েছে। এরপরও, তাঁরা যদি ভাণ করেন যে, তাজমহল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বিশ্বাস্য নয়, আর কোন প্রমাণই তাঁদের এই গোঁড়ামি ভাঙ্গতে পারবে না।

যেহেতু তাজের একজন উৎসাহী পাশ্চমী পরিদর্শক তাজের ওপর কার্বন-১৪ পরীক্ষা চালিয়েছেন, আমরা সেই পরীক্ষার ফলাফল পাঠকদের জানাচ্ছি।

'রেডিও কার্বন পরীক্ষার মাধ্যমে তাজমহলের
এক টুকরো কাঠের বয়স নিরূপণ।'

প্রথম নমুনা: যমুনা নদীর মুখোমুখি নদীতটের সমতলে তাজমহলের উত্তরপ্রান্তের দরজার এক টুকরো কাঠ।

বয়স: ১৩৫৯—৮৯ খৃষ্টাব্দ। অর্থাৎ এই নমুনার জন্ম যে ১২৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ, তার সম্ভাবনা শতকরা ৬৭ ভাগ।

উল্লেখনীয়: এই সময়কালের জন্য NASCA সংশোধনীর মূল্য ০।

অতি আধুনিক এই বৈজ্ঞানিক কার্বন-১৪ পরীক্ষায় আমরা পাই যে, তাজের ঐ দরজার টুকরোর সৃষ্টি ১২৭০ থেকে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই হয়েছে। পরবর্তী এই সময়ও শাজাহানের দুশো বছর পূর্বেকার। কেননা, তাজের বহিভাগে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের টাঙানো বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাজের নির্মাণকাল

১৬৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৫১ খৃষ্টাব্দ। কার্বন-১৪ পরীক্ষায় এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে।

এরপরও, আমাদের গবেষণার সঙ্গে পরিচিত স্থাপত্যবিদ্যার এক বিদেশী অধ্যাপক যখন Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, তথাকার তথাকথিত মুঘল স্থাপত্যের অধ্যাপক Dr. Garbar কার্বন-১৪ পরীক্ষার ফলাফল সহ সমস্ত আবিষ্কৃত তথ্যকেই হেসে উড়িয়ে দেন। ভারতের তথাকথিত মুঘল সৌধেরস্থাপত্য সম্পর্কে এ যাবৎ তিনি যা লিখেছেন এবং ছাত্রদের যা শিখিয়ে এসেছেন, তা যে সব মিথ্যে, এই সম্ভাবনাই হয়তো তাঁকে উত্তেজিত করেছিলো। কাজেই, পাঠককে বুঝতে হবে যে, তাজের প্রকৃত উৎপত্তি সম্পর্কে প্রমাণের ঘাটতি নয়,এগুলো বিশ্বাসের ইচ্ছা ও ক্ষমতারই ঘাটতি রয়ে গেছে। শাজাহানই যে তাজমহলের নির্মাতা, এই প্রথাগত ভ্রান্ত ধারণা আঁকড়ে রাখার পশ্চাতে কিছু কায়েমীস্বার্থের খেলা আছে এবং যে কোন পরিস্থিতিতে এটি আঁকড়ে রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। এই মতবাদ পরিত্যাগ করতে গেলে স্থাপত্যবিদ্যার ইতিহাস সহ ইতিহাসের সমগ্র পরিমণ্ডলে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হবে। ক্ষমতার আসনে থেকে অধ্যাপক, গবেষণার নির্দেশক, গ্রন্থকার, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাস বিভাগের প্রধান, প্রভৃতি যাঁরা শাজাহানের কৃতিত্বের মতবাদ জাহির করে এসেছেন এতদিন, তাজের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের যুগান্তকারী আবিষ্কারের, জগতে পরিচিতি ও স্বীকৃতির বিরুদ্ধে তাঁরা শেষ সংগ্রাম অবিরত চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বীরত্বপূর্ণ (?) সংগ্রামেরই শরিক Prof. Begley ও Prof. Grabar-এর মতো ব্যক্তি। কিন্তু আর কতদিন তাঁরা টিঁকে থাকবেন? তাজমহল নিয়ে শাজাহান ইতিকথার ভ্রান্ত ধারণা জিইয়ে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত পণ্ডিত সমাজ একদিন মুছে যাবেন। সে দিনের খুব দেরী নেই। অবশ্য, তাজের উৎপত্তি সংক্রান্ত এই ভ্রান্তি কোন শাসনগত বা বাণিজ্যিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না বলে ঐ পণ্ডিতেরা তাঁদের মতবাদ চালিয়ে যেতে পারছেন। পক্ষান্তরে, তাজ সম্বন্ধে বর্তমানে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা চালাবার জন্য যাঁরা চেষ্টা ও বিনিয়োগ করেছেন, আমাদের আবিষ্কার স্বীকৃতি পেলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে গভীর লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথাগত ইতিকথার প্রচার চালানো সমস্ত প্রাচীরপত্র, ভ্রমণ পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সবকিছুই জঞ্জালের স্তূপে নিক্ষেপ করতে হবে। এর জন্যই সারা পৃথিবী প্রথাগত ধারণাকেই আঁকড়ে রাখতে চাইছে। অবশ্য, এমন একদিন আসবে যেদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও পৃথিবীকে স্বীকার করতে হবে যে, শাজাহানের কয়েক শতক পূর্বেও তাজমহলের অস্তিত্ব ছিলো।

বুজিয়ে দেওয়া কক্ষে কক্ষে জঞ্জালের স্তূপে, অথবা যমুনা বা বহুতল কূপের

নীচে তাজমহল নির্মাণের প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রমাণ হয়তো লুকিয়ে আছে। এই সমস্ত জায়গাই খুব ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু, বর্তমানের রাজনৈতিক বাতাবরণে এমন কি ভারত সরকারও তাজের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন সত্যিকারের অনুসন্ধান চালাতে উৎসুক নন, পাছে শাজাহানের পূর্বে তাজের হিন্দু-উৎপত্তির কথায় মুসলিম নাগরিকদের অসন্তোষ জন্মে। তাজের প্রকৃত নির্মাতা কে, তা সঠিক অনুসন্ধানের অন্যতম বাধা হচ্ছে এই পলায়নী মনোভাব।

আমাদের আবিষ্কারের সমর্থনে আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমরা পেশ করতে চাই। প্রথমটি হচ্ছে যে, তাজমহল একটি সুসমঞ্জস সৌধ। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, এর আকৃতি একই রকম ঠেকে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় অষ্টকোণ কক্ষের অভ্যন্তরে দুটি চওড়া আকারের সমাধিস্তম্ভ পরবর্তীকালের সংযোজন। যেহেতু শিবলিঙ্গ একটি বেলনাকার প্রস্তরখণ্ড, তাজমহলের কেন্দ্রীয় কক্ষে সেই দেবতাই যথাযথভাবে কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করতে পারেন।

আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে, পণ্ডিতদের অধুনা প্রচলিত মত অনুসারে খৃষ্টধর্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে পর্যন্ত ভারতবর্ষ একটি অতি সমৃদ্ধশালী ও বিখ্যাত দেশ ছিলো। তারপর ধরে নেওয়া হয় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর বিদেশী মুসলিম আক্রমণ কারীরা বিরাটাকার কবর, দুর্গ, মসজিদ, লক্ষ্যস্তম্ভ প্রভৃতি তৈরী করা শুরু করেন। তা সত্যি হলে, মধ্যবর্তী ১২০০ বছর ধরে কি হয়েছিলো? তাঁদের কাণে ক্রমাগত আউড়ানো ইতিহাসের এই ফাঁকটুকু পাঠক যদি চিন্তা করে দেখেন তবে বুঝবেন যে, শতশত বর্ণাঢ্য, মধ্যযুগীয় যে সব প্রাসাদকে আজকাল ভুল করে আক্রামকদের সৃষ্টি বলে বলা হয়, তা সবই প্রথম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু রাজা ও অভিজাত ব্যক্তিরা নির্মাণ করিয়েছিলেন। মুসলিমদের ভারত আক্রমণ ও দখলের পর যা ঘটেছিলো তা নির্মাণ নয় বরং ধ্বংস। এর অর্থ প্রাচীন বাঁকানো তোরণের অর্দ্ধাংশ প্রভৃতি ঐ সৌধগুলির যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা সবই হিন্দুর নির্মিত। ছাদ, তোরণের বাকী অংশ প্রভৃতি যা কিছু লুপ্ত হয়েছে, তা সবই মুসলিমদের আক্রমণ ও লুঠনের ফল।

ওপরের সিদ্ধান্তগুলি কর্কশ শোনাতে পারে এবং মনে হতে পারে যে, এগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই রাখা হয়েছে। কিন্তু, শিক্ষাজগতের গবেষণা ও বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অপছন্দের কারণে কোন সিদ্ধান্তেআসা থেকে বিরত হওয়া যায় না। এই ধরণের অনুসন্ধানের ফলাফলের ওপর কোন রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য চাপানো উচিত নয়। শাজাহানই তাজমহলের নির্মাতা, প্রচলিত এই

মত যদি হিন্দু বিরোধী না হয়, তবে শাজাহান যে তাজের নির্মাতা নন আমাদের এই আবিষ্কারকে মুসলিমবিরোধী বলে কেন মনে করা হবে? এই ধরনের তুচ্ছ আপত্তি যাঁরা তোলেন, সেই সমস্ত ব্যক্তির উচিত কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুকূল প্রতিকূল মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাসের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া। তাঁদের বুঝতে হবে যে, বর্তমানের সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিবেচনাকে কখনোই ইতিহাসের পর্যালোচনার সময় বিবেককে আচ্ছন্ন করতে দেওয়া উচিত নয়। যৌনসম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে ধাত্রীবিদ্যার কোন অধ্যাপক সন্তান জন্মের রহস্য ব্যাখ্যা করলে যেমন অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হন না, সঠিক সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় ইতিহাসের গবেষকের বিরুদ্ধেও কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাবের অভিযোগ ওঠা উচিত নয়। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এই সমস্ত বিবেচনায় কখনোই মনকে পক্ষপাতদুষ্ট ও কলুষিত হতে দেওয়া অনুচিত। যাঁদের তা হয়, সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাই মন থেকে মুছে ফেলে, সস্তা রাজনীতির মোহে ইতিহাসকে কলুষিত করার প্রচেষ্টায় তাঁদের শাস্তি দেওয়াই সঙ্গত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ছিলো হিন্দুদের

আমরা আগের এক অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে, হিন্দু তাজপ্রাসাদে জমির সমতলে, কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠ ও নীচের ঘরগুলো বর্ণাঢ্য কারুকার্যখচিত। ঐ প্রকোষ্ঠের ছিলো রূপার দরজা সোনার গরাদ আর মুক্তোখচিত মর্মরের পর্দা দিয়ে ঘেরা একটি জায়গা। ঐ ঘেরা জায়গাটিতে কি ছিলো? নিশ্চয়ই এমন কিছু, যার ঐশ্বর্য সমান ভাবেই চিত্তাকর্ষক। গিলটি করা কাঠামোতে নিশ্চয়ই কোন অনুল্লেখ্য চিত্র ছিলো না। অনুরূপভাবে, মূল্যবান ধাতু ও পাথরে সজ্জিত কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠই ছিলো হিন্দু ময়ূর সিংহাসনের উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক। আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কেন না, শাজাহানের রাজত্বকালের কল্পিত ইতিহাসে তাজমহল ও ময়ূর সিংহাসনের উল্লেখ প্রায় একই সময়ে এসেছে।

খুবই গোঁড়া মওলবী পরিবেষ্টিত ধর্মান্ধ মুসলিম শাসকেরা কখনই ময়ূর সিংহাসন নির্মাণের হুকুম দিতে পারতেন না। ভারতে দীর্ঘকালস্থায়ী রাজত্বে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো মূর্ত্তি ভাঙ্গা, নির্মাণ নয়।

বস্তুত, হিন্দু তাজ প্রাসাদ দখলে একটা ধনবান ও শক্তিশালী পরিবারকে হীনবল করাই শাজাহানের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো না। ঐ প্রসাদে রক্ষিত প্রচুর ধন-সম্পত্তি গ্রাস করাও তার উদ্দেশ্য ছিলো। কাজেই তাজমহল নিয়ে নেওয়ার পর শাজাহান রূপোর দরজা, সোনার গরাদ, মর্মর পর্দার মূল্যবান মুক্তো (যেখানে কিছু ছিদ্র এখন অবশিষ্ট আছে) প্রভৃতি খুলে নিলেন, আর সেই সঙ্গে নিলেন সেই বিখ্যাত ঝলমলে ময়ূর সিংহাসন।

ময়ূর সিংহাসন কেবল মাত্র হিন্দু প্রাসাদেই আসবাবের অঙ্গ হতে পারে। কেন না, প্রথাগত ভাবে হিন্দু সিংহাসনের ওপর কোন বীর্যশালী, মহিমামণ্ডিত জন্তু বা পাখির মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকতো। হিন্দু ধারণা অনুযায়ী সিংহাসনের অর্থ হচ্ছে সিংহ চিহ্নিত আসন।

হিন্দু দেবতা এবং শাসকদের প্রিয় পাখি বা জন্তুর মূর্ত্তি থাকতো তাঁদের সিংহাসনে। হিন্দু ধর্মগাথার ঈগল, সিংহ, বাঘ, ময়ূর এবং আরো অন্যান্য পাখি ও জন্তু জড়িত হয়ে আছে সিংহাসনের চিহ্ন হিসাবে। অন্যদিকে মুসলিম ধর্মের ঐতিহ্যে কোন মূর্ত্তি বা প্রতিলিপি অঙ্কন কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এই সমস্ত বিষয়

বিবেচনা করলে ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে, অতি সূক্ষ্ম ভাবে শাজাহান কর্তৃক ময়ুর সিংহাসন নির্মাণের কাহিনী তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কেননা, তৎকালীন মালিক জয়সিংহের কাছ থেকে প্রাসাদটি দখলের অনতিপরেই শাজাহান ঠ'ণ্ডা মাথায় এই সিংহাসনটি তাঁর প্রাসাদে নিয়ে আসেন।

আরো মনে হয় যে, এই ঝলমলে সিংহাসনটি একটা মূল্যবান চাঁদোয়া ও মুক্তোর ঝালর দিয়ে ঢাকা থাকতো। তাজের প্রাসাদকে এই ধরণের প্রচুর ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করতে গিয়ে শাজাহান যেন মুক্তোর খনির সন্ধান পেয়েছিলেন। বদলে তিনি রেখে গিয়েছিলেন মমতাজ এবং হারেমের অন্য এক অধিবাসিনীর জন্য শীতল প্রস্তরের ফলক।

মুসলিম আক্রমণকারী নাদির শাহ কর্তৃক পারস্যে নিয়ে যাওয়া সেই ময়ুর সিংহাসন এখন আর নেই। সিংহাসনটিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে টুকরো হিসাবে লুট বা বিতরণ করা হয়। কেননা, লুণ্ঠিত সম্পত্তি হলেও, একটা পৌত্তলিক সিংহাসনের উপস্থিতি ধর্মান্ধ মুসলিম শাসকদের কাছে অস্বস্তিকর ছিলো।

১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে শাজাহানের রাজত্বের অষ্টমবর্ষের কাহিনী বর্ণনায় শাজাহানের সভা-লেখক মোল্লা আবদুল হামিদ ময়ুর সিংহাসনের একটা বিবরণ দিয়েছেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে, মমতাজের মৃত্যু হয় ১৬৩০ সালে আর তাজমহল সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীতে এই স্বপ্নরঙ্গীন বর্ণাঢ্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ শুরু হয় তাঁর মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই। আর এই কাজটি নাকি শেষ করা হয় ১০ থেকে ২২ বছর ধরে।

আরও মনে রাখতে হবে যে, ১৬২৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সিংহাসন লাভের পর পরবর্তী কয়েক বছর শাজাহানকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিনাশের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো আর তাঁর পুরো রাজত্বকালে মোট ৪৮টি অভিযানের কোনো না কোনটিতে তাঁকে মনোযোগ দিতে হয়েছিলো। মমতাজ যখন ১৬৩০ বা ১৬৩১ সালে মারা যান, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত বাদশানামার পরিচ্ছেদ অনুযায়ী, শাজাহান ফকির ও দরিদ্রদের মধ্যে প্রচুর ধন বিতরণ করেছিলেন। আমাদের বলা হয়েছে যে, তারপরই শাজাহান তাজমহল প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন।

আমাদের আরও বলা হচ্ছে যে, কাজ শুরু হওয়ার অনতিপরেই, ১৬৩৪ সালে, তাঁর সিংহাসন লাভের ছয় বৎসরের মধ্যে শাজাহান এতো ধনরত্ন যোগাড় করলেন যে, তা কিভাবে খরচ করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। মোল্লা আবদুল হামিদ বলছেন, 'কয়েক বছরে রাজকীয় মুক্তা ভাণ্ডারে অনেক মুক্তা জমা পড়েছিলো।...'। এই ধরণের আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করতে গেলে

সরলতার চাইতেও ভিন্ন জিনিষের প্রয়োজন হবে। মনে হয়, কেউই এই ধরণের উক্তিকে যুক্তি দিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেন নি। আমরা যদি এই ধরণের অমিতব্যয়ের কথা বিশ্বাস করি, তাহলে সেই সঙ্গেই বিশ্বাস করতে হয় যে, বৃষ্টির ধারার মতো অজস্র পরিমাণ ধন ও মণিমুক্তা মুঘলদের ছিলো।

কাজেই আমরা শাজাহান দ্বারা এই সিংহাসন নির্মাণের উদ্ভট কাহিনী উপেক্ষা করে মনোযোগ দিতে পারি এই সিংহাসনের আয়তন আর নির্মাণকার্যে ব্যয়িত ধনরত্নের পরিমাণের প্রতি। যদি স্বীকার করেও নেওয়া হয় যে, মোল্লা হামিদ এই সিংহাসনে ব্যয়িত অর্থ এবং মণিমুক্তোর পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছেন, তবুও তাঁর বর্ণনাতে শাজাহানের আত্মসাৎ করা এই সিংহাসন দেখতে কেমন ছিলো সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

শাজাহানের সভা লেখকের মতানুযায়ী ময়ূর সিংহাসন ছিলো, 'তিনগজ লম্বা, আড়াই গজ চওড়া, পাঁচ গজ উঁচু, আর খচিত ছিলো ৮৬ লক্ষ টাকা দামের মণিমুক্তো দিয়ে। চাঁদোয়াতেই ছিলো বারটি মরকতমণির সারি। প্রত্যেকটি স্তম্ভের ওপরে ছিলো দুটি করে ময়ূরের প্রতিকৃতি, যার সর্বাঙ্গ মুক্তা-খচিত ছিলো। প্রত্যেক জোড়া-ময়ূরের মধ্যে ছিলো রুবি, হীরা, মরকত ও মুক্তা খচিত একটা করে গাছ। সিংহাসনে খরচ হয়েছিলো ১ কোটি টাকা, আর নির্মাণের সময় লেগেছিলো সাত বছর।' তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, তাজমহলের সাথে শাজাহান আরেকটা ব্যয় বহুল প্রকল্পে হাত দিয়েছিলেন। এটা আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর থেকেও আজগুবি। এই সিংহাসনে ছিলো এগারটি আসন, কেন্দ্রেরটি নির্দিষ্ট ছিলো শাসকের জন্য।

কালক্রমে শাজাহানের হাতে এসে পড়া এই হিন্দু আসনটি কোন রাজ নির্মাণ করেছিলেন, তা জানবার একটা সম্ভাব্য উপায় আসে।

হিন্দু ঐতিহ্যে প্রথম সিংহাসন আরোহণ এবং অন্যান্য উৎসবের সময় শাসকের চারপাশে থাকতেন তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতারা। রামচন্দ্রকে দেখানো হয়, সবসময়ই সীতা ও তিন ভাইকে নিয়ে উপবিষ্ট হিসেবে। ঐ থেকে মনে হয় যে, ময়ূর সিংহাসন নির্মাণকারী হিন্দু রাজার নয়টি পুত্র ছিলো। সিংহাসনের এগারটি আসন নির্মিত হয়েছিলো শাসকের নিজের, তাঁর স্ত্রীর এবং নয় পুত্রের বসার জন্য। যদি ভারতের প্রাক-মুসলিম ইতিহাসে আমরা বীর ও সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নয় সন্তানের পিতা। কোন হিন্দু শাসককে খুঁজে পাই, তবে তিনিই হবেন এই সিংহাসনের প্রকৃত নির্মাণকারী।

এমনও হতে পারে যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপাধি এসেছে তাঁর ময়ূর সিংহাসন থেকে, কেননা মৌর্য শব্দটি ময়ূর থেকে নেওয়া হতে পারে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে শাজাহান দ্বারা আত্মসাৎ করা ময়ূর সিংহাসনের অস্তিত্ব আমরা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় পর্যন্ত খুঁজে পাই।

আরেকটা। সম্ভাবনা হতে পারে যে, একজন সাহিত্যরসিক, যোদ্ধা হিন্দু শাসক এই সিংহাসন নির্মাণ করিয়েছেন, কেননা হিন্দু ধর্মগাথা অনুসারে ময়ূর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী এবং যুদ্ধের দেবতা কার্ত্তিক উভয়েরই বাহন। প্রাচীন ভারতে তাঁর বীর্য, বিদ্যাবত্তা ও সত্যনিষ্ঠার জন্য খ্যাত এমন একজন শাসক ছিলেন বিক্রমাদিত্য, ৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বিক্রম সংবতের প্রবর্তন করেন। কাজেই আরববিজয়ী বিক্রমাদিত্যই এই সিংহাসনের নির্মাণকর্তা হতে পারেন; যা পরে তাজমহলের সঙ্গে দখল করেন শাজাহান।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
প্রচলিত কাহিনীর অসঙ্গতি

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসকদের দরবারে আড়ম্বর ও জাঁকজমক ছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিলো ষড়যন্ত্র, পাপ, নিষ্ঠুরতা আর উৎপীড়নের উত্তপ্ত পীঠস্থান। কলাচর্চা বা জীবনের অন্যান্য উচ্চতর বৃত্তির বিকাশের কোন সুযোগই সে সময় ছিলো না। কাজেই নৃত্য, অঙ্কন, সঙ্গীত ও স্থাপত্যবিদ্যাকে উৎসাহিত করার সমস্ত কাহিনীই ভিত্তিহীন। বস্তুত, মুসলিম অভিযান শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছিলো, কেন না, অধিকাংশ নাগরিককেই তখন নিজের ও স্ত্রী পুত্রের নিরাপত্তার চিন্তায় বিব্রত থাকতে হতো। এই ভয়াবহ সন্ত্রাসের যুগে কোন কিছুরই বৃদ্ধি ঘটে না। তাজমহলের মতো প্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব হয় কেবল দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও উন্নতির যুগে।

শ্রী কেশবচন্দ্র মজুমদার বলছেন, 'নূরজাহানের পিতা ইতমদউদ্দৌল্লা বলছেন যে, অন্তত ৫০০০ মহিলা মুঘল হারেমের অধিবাসিনী ছিলেন।—এঁদের কারুর গর্ভজাত পুত্রসন্তানকে সারাজীবনের জন্য নিঃসঙ্গ কারাবাস করতে হতো।' শাসকের নিজের ঔরসজাতদের যখন এরূপ পরিণতি ঘটতো, সহজেই কল্পনা করা যায় সাধারণ মানুষের অবস্থা, যাদের অধিকাংশই ছিলো এমন ধর্মও কৃষ্টির লোক শাসকেরা যা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তাছাড়াও আমরা জানি, শাসক পরিবার এবং সম্ভ্রান্ত অমাত্যদের পরিবারে সমকামিতার বেশী রকম প্রাদুর্ভাব ছিলো। পুং বেশ্যারা মুসলিম দরবারের একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ ছিলো। এই ধরণের আবহাওয়া কি সমস্ত ধরণের কলাবিদ্যার বিলুপ্তি বা অবনতির সহায়ক নয়?

সব সময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকা, অসংখ্য ভৃত্য পরিপোষণ, অর্থগৃধ্নু অমাত্যদের সঙ্গ, এবং প্রকাণ্ড হারেম রক্ষণাবেক্ষণ—এগুলোর জন্য ভারতের মুসলিম শাসকদের সব সময়েই অর্থের অভাব লেগে থাকতো। সাধারণ লোকের ভাষায়, তাঁদের দৈনন্দিন খরচ নির্বাহ করাও কঠিন হতো। কাজেই এই দরবারগুলির প্রচুর ঐশ্বর্যের বর্ণনা সমস্তই ভ্রান্ত। সন্দেহ নেই যে, প্রজাদের অবিরত লুণ্ঠন করে অর্থের যোগাড় হতো প্রায়ই, কিন্তু আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা খরচ হয়ে যেতো। ফলে দরবারের অর্থ কখনো স্ফীত হতো, কখনো বা একেবারেই কমে যেতো। তাই জরুরী প্রয়োজনে রাজাশাসন নীতির অঙ্গ হিসেবে দরিদ্র ও

অসহায় প্রজাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হতো। কিন্তু অর্থ যোগাড় হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা বিতরণ করতে হতো। মৃতা পত্নীর কবরের জন্য তাজমহলের মতো রূপকথার সৌধ নির্মাণের মতো অর্থ কখনোই জমা থাকতো না।,, মধ্য-যুগীয় মুসলিম লেখকদের পরস্পর বিরোধী বিবরণ লেখা হয়েছিলো, শাসককে খোসামোদে সন্তুষ্ট করে নিজেদের জন্য কিছু অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে। রাজকীয় অনুগ্রহের সূর্যকিরণে স্নাত এই সমস্ত লেখকেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতেন, যাতে শাসককে সবচাইতে বেশী প্রশংসা করে বেশী অর্থ পেতে পারেন।

ভারতীয় সৌধ ও তাদের স্থাপত্য ইতিহাসে কিভাবে উদ্ভট কল্পনার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় Keeneএর Handbookএ। 'কান্দাহারের শাসক আলীমর্দান খান সম্ভবত কন্দাকৃতি গম্বুজ প্রবর্তন করেন, যা ভারতের সারাসেনীয় স্থাপত্যের ক্ষয়িষ্ণুতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর সম্যক উদাহরণ হলো তাজমহলের গম্বুজ।' এটাই দেখাচ্ছে যে প্রচলিত ধারণা কাল্পনিক উচ্ছ্বাস মাত্র। 'চৌষট খাম্বা, প্রচলিত বিশ্বাসের মতে শাজাহানের মুখ্য খাজাঞ্চী বকসী সলাবত খানের কবর।' এই চৌষট খাম্বা কথাটি অমুসলিম। ইতিহাসের ছাত্রদের কি জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, মুঘল আমলের অসংখ্য ব্যয়বহুল স্মৃতিসৌধের খরচ কে জুগিয়েছিলেন। এই সৌধগুলোর বেশীর ভাগই নাকি নির্মিত হয়েছিলো পুংবেশ্যা, ফৌজদার, বেশ্যা, ফকির, পুত্র, প্রপৌত্র এবং পুত্রের প্রপৌত্রের স্মৃতির উদ্দেশে। মানুষের স্বভাবের সঙ্গে কি এই ধরণের উদারতা সঙ্গতিপূর্ণ? এটা কি সম্ভব যে, যাঁরা নিজের বা পুত্রদের জন্য কোন প্রাসাদ নির্মাণ করাননি, তাঁর পূর্বপুরুষদের জন্য সমাধি নির্মাণ করিয়েছেন?

তাঁর Handbook এর ১৫০ পাতায় Keene বলছেন 'মমতাজকে এখানে কবরস্থ করার পর দুটো প্রমোদ শিবির ও এর আনুষঙ্গিক কিছু এখানে রাখা হলো। কল্পনা করাও অসম্ভব যে, পত্নীর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত শাসক রাজদরবারের খরচায় শিবির নির্মাণ করবেন, যাতে লোক এই জায়গাটি দর্শন করতে এসে আমোদ-প্রমোদ করতে পারে। বিশেষত, যখন শাজাহানের অত্যাচারী রাজত্বে প্রজারা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিলো না। কিন্তু এই প্রমোদ শিবিরের উপস্থিতিই বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রমাণ করে যে, এই ঢাকা প্রবেশ পথগুলি আগে থেকেই আছে, কেননা তাজমহলের উৎপত্তি রাজপুত প্রাসাদ হিসেবে।

প্রচলিত বিবরণের আরেকটা দুর্বল সূত্র থেকেও জানা যায় তাজমহল নির্মাণের এই কাহিনী কতটা ধাপ্পা। Handbook এর ১৬৫ পাতায় Keene বলছেন 'এটার সম্ভাবনা খুবই অধিক যে মমতাজের দেহাবশেষ (বুরহানপুরে ছয় মাস সমাধিস্থ থাকার পর যা আগ্রায় আনা হয়েছিলো) বাওলি মসজিদের কাছে অস্থায়ী কবরে প্রায় নয় বৎসর ছিলো।..... ঠিক কখন তা এই কবরে

(তাজমহলের নীচের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে) সরানো হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা নেই।' শাজাহান বিশেষ করে মমতাজের সমাধির জন্যই তাজমহল বানিয়েছিলেন বলে ঢাকঢোল পেটানো সত্ত্বেও, যেখানে মমতাজের মৃতদেহ তাঁর শেষ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার সঠিক সময় পাওয়া যায় না, তখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাজ মহলে সত্যি মমতাজ এবং শাজাহানের দেহাবশেষ আছে কিনা অথবা প্রাচীন রাজপুত প্রাসাদটি আত্মসাৎ করার জন্যই স্মৃতিস্তম্ভ তুটি নির্মিত হয়েছিলো।

তাজের নির্মাণ সম্পর্কে শাজাহান-ইতিকথার আরেকটি করুণ অসঙ্গতি হলো স্মৃতিস্তম্ভের চারপাশের মর্মর পর্দাকে ঘিরে। এই প্রসঙ্গে Handbook এর ১৭১ পাতায় Keene বলেছেন, 'বাদশানামার মতে স্মৃতিস্তম্ভের প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রে একটি জায়গাকে ঘিরে যে মর্মরের পর্দা তা স্থাপন করেছিলেন শাজাহান ১৬৪২ সালে ··কিন্তু উপযুক্ত ঐতিহাসিকদের মতে এটা স্থাপিত হয়েছিলো আওরঙ্গজেবের হাতে, তাঁর পিতার দেহাবশেষ এখানে রাখার পর।'

এই পরিচ্ছেদটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা লক্ষ্য করতে হবে যে শাজাহানের নির্দ্দেশে লিখিত বাদশানামাকে Keene কোন মুল্য দেন না, কেননা তিনি অন্যান্যদের আরো 'উপযুক্ত' বলেছেন। বাদশানামাকে অবিশ্বাস করে Keene ঠিকই করেছেন, কেননা, আমরা ছাড়াও ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠকেরা জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিহাস লেখা হয়েছিলো তোষামোদের দ্বারা শাসকের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু Keene ভ্রান্ত হচ্ছেন, যখন তিনি অন্যান্যদের 'উপযুক্ত' বলে বিশ্বাস করছেন। শাজাহানেরই হোক বা আওরঙ্গজেবের দরবারেরই হোক চাটুকারেরা সবাই ছিলো একই শ্রেণীর। কাজেই একমাত্র যে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি তা হচ্ছে এই যে তাজমহলের রাজপুত অধিকারীর ময়ুর সিংহাসনকে ঘিরে রাখার এই মর্মর পর্দা বরাবরই ছিলো। ঘৃণিত পিতার কবর সজ্জিত করার মতো লোক আওরঙ্গজেবের কখনো ছিলেন না।

Sleeman বলছেন, রানীর কবরে উদ্ধৃত এক কোরাণের উক্তির শেষ হচ্ছে "আমাদেরকে অবিশ্বাসীর দলের হাত থেকে রক্ষা করুন।"···

···এই শেষ কথাটা অর্থবোধক, কেননা, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রমাণ করা যে, তাজমহল একটা অবিশ্বাসী পরিবারের হাত থেকে ঐ দলকে শেষ করার জন্যই দখল করা হয়েছিলো। মমতাজের কবরে উদ্ধৃতির জন্য এই পরিচ্ছেদ বাছাইয়ের মধ্যেই উদ্দেশ্যটা পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীনকালে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় সুন্দর এবং বিরাট সৌধগুলিকে মুসলিম বলে সাধারণ, লোক, ইতিহাস এবং স্থাপত্যের ছাত্রদের কিভাবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে বোকা বানানো হয়েছে কয়েক শতাব্দী

ধরে অবিরত প্রচারের সাহায্যে, তার উদাহরণ আমরা Sleeman এর অভি-জ্ঞতা থেকেই রাখছি। তাঁর বইয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯ পাতায় আগ্রায় সৌধ পরিদর্শনের প্রসঙ্গে Sleeman বলেছেন, 'আমি একদিন যমুনা পার হয়ে ইত্মাদ-উদ্দৌলার স্মৃতিসৌধ দেখতে যাই।···ফেরার পথে আমি একজন মাঝিকে জিজ্ঞেস করি দুর্গের মধ্যে প্রতীয়মান একটা নতুন গম্বুজ কে নির্মাণ করেছেন।'

'কোন এক জন সম্রাট'—সে বললো

'কিভাবে বুঝলে'?

'কেননা এই ধরণের জিনিষ সম্রাটেরাই নির্মাণ করতে পারেন'—লোকটি শান্তভাবে জবাব দিলো। 'সত্যি, অতি সত্যি, কথা'—আমাকে অনুসরণ করে নৌকা থেকে নামা একজন মুসলিম সৈন্য মাথা বিষণ্নভাবে ঝাঁকিয়ে বললো 'খুবই সত্যি, সম্রাট ছাড়া আর কেই বা করতে পারেন।'

সৈন্যটির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে মাঝিটি বলে চললো 'তাদের ধিক্কৃত আধিপত্যের সময় জাঠ ও মারাঠারা ধ্বংস ও ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া আর কিছুই করেননি'—

স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের আবোলতাবোল বিশ্বাস করে পশ্চিমী পণ্ডিত ও ভ্রমণকারী কিভাবে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়েছেন তার কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হলো। স্পষ্টতই মারাঠা ও জাঠদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ কি রকম অবাস্তব তা বোঝা যায় তাজ এবং তথাকথিত ইতমাদউদ্দৌলার কবরের ব্যবহৃত হবার পর থেকে জাঠ ও মারাঠারা এদের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত কাটেন নি। কিন্তু মধ্যযুগীয় সৌধগুলির নির্মাতা মুসলিমরা, এটা লোককে ভ্রান্তভাবে বিশ্বাস করতে, বিদ্বেষমূলক প্রচার এযাবৎ বেশ সাফল্য লাভ করে এসেছে।

আমাদেরও Sleeman এর অভিজ্ঞতা হয়েছিলো।

আগ্রা দুর্গ পরিদর্শনকালে একবার এক শ্মশ্রুযুক্ত মুসলিমকে আমরা জিজ্ঞেস করি, দুর্গের কোন অংশে আওরঙ্গজেব শিবাজীকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমরা শুধু প্রচলিত কাহিনীটাই পরীক্ষা করে দেখতে চাই, কেন না আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা আছে যে, শিবাজীকে দুর্গের বাইরে রামসিং এর বাড়ীতে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু ঐ মুসলমানটি চোখের পাতাও না নাড়িয়ে বা উত্তরের জন্য বিন্দুমাত্র না হাতড়িয়ে একটা দেয়ালের পশ্চাৎবর্তী দূর স্থানের দিকে দেখিয়ে দিলে, যা তখন সৈন্যদের অধিকৃত জায়-গার অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং দর্শকদের সেখানো যাওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। আমরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারলাম, কিভাবে সাধারণ মানুষ এবং ইতি-হাসের বিচক্ষণ পাঠকও একইভাবে বিভ্রান্ত হয়েছেন অসৎ লোকদের দ্বারা। শুধু

মুখের কথাতেই নয়, সরকারীভাবে লিপিবদ্ধ মধ্যযুগীয় ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণ বলে আখ্যাত মধ্যযুগীয় ইতিহাসও এই বিভ্রান্ত বাড়িয়েছে।

ওপরের পৃষ্ঠাগুলিতে যা বলা হলো, তাতে একান্ত বিশ্বাসীরও বুঝতে কষ্ট হবে না যে, তাজ-ইতিকথা সরলবিশ্বাসী পৃথিবীকে চাপিয়ে দেওয়া এক বিরাট ধাপ্পা। এর প্রত্যেকটা বিবরণে রয়ে গেছে বিরাট অসঙ্গতি। শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের প্রচলিত কাহিনীর মিথ্যাটার খোলস খসে পড়েছে দেখানোর পর আমরা চেষ্টা করবো, তাজমহলের সঠিক উৎপত্তির একটা তথ্য-নির্ভর বিবরণ তৈরী করতে।

ওপরে আলোচিত কিছু বিছু সূত্র আমাদের দেখাচ্ছে যে তাজমহলের উৎপত্তি হয়েছিলো প্রাসাদ হিসেবে, কবর হিসেবে নয়। এর জাঁকজমক প্রমোদ শিবির মর্মরের পর্দা, সুন্দরভাবে মোজাইক করা মেঝে, রূপোর দরজা ও সোনার গরাদের মতো ব্যয়বহুল উপকরণ, শত শত কক্ষ, খাসপুরা ও জয়সিংহ-পুরার মতো নাম, হিন্দুদের কাছে পবিত্র একেবারে বাছাই করা ফল ও ফুলের বাগান —সবই এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিবৃত্তের মিথ্যাচার সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে Keene বলছেন 'ভারতীয় লেখকরা তাঁদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকদের প্রশংসা করতে গিয়ে এমন সব উক্তির অবতারণা করেছেন, যা-পরবর্তীকালের সন্ধানী-দৃষ্টিতে একেবারেই অসত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।, এই লেখকদের ভারতীয় বলে Keene ভুল করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন বিদেশী মুসলিম।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে তিনি স্বীকার করছেন, 'শাজাহানের স্মৃতিস্তম্ভটি······ অসমঞ্জস ভাবে স্থাপিত হয়েছে। এই মহান প্রাসাদের নীচের তলায় আছে নদীর দিকে মুখ করা সারিবদ্ধ ১৪টি ঘর (পৃ ১৭৭).' এই ঘরগুলি সম্বন্ধে Keene বলছেন 'একই সারিতে এই ১৪টি ঘর নীচের প্রকোষ্ঠ নদীর দিকে মুখ করে চত্বরের নীচে অবস্থিত। এর প্রত্যেকটি যুক্ত আছে একটি দ্বারপথের দ্বারা, যার পুরো দৈর্ঘটাই পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রসারিত। এই ঢাকা জায়গাটির প্রত্যেক প্রান্ত থেকে একগুচ্ছ সিঁড়ি উঠেছে ঐ প্রকোষ্ঠ চত্বরের দিকে, যেখানে এর বাইরের দরজা লাল পাথরের টুকরো দিয়ে বন্ধ করা আছে। কয়েক বছর পূর্বে আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত এর অস্তিত্ব সন্দেহ করা হয়নি। এই সন্দেহ জাগায় একেবারে পূর্বদিকে দুটি ঘরে নদীর দিকে মুখ করে বসানো একটি করে ছোট জানালা। আগে দেয়ালচিত্রে বা অন্যভাবে সজ্জিত এই ঘরগুলো আজকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বাদুড় সমাকীর্ণ হওয়ায় টর্চ বা অন্য আলো ছাড়া খুঁটিয়ে দেখা যায় না। পূর্বে তাদের মাঝখান দিয়ে নদীর ঘাটে পৌছুনো যেতো। ফলে, এগুলোকে নদীর দিক থেকে তাজে প্রবেশের পথ হিসেবে গণ্য করা হতো।

আবার দিনের প্রচণ্ড উত্তাপের সময় শীতল আশ্রয়স্থল হিসেবেও এগুলোর ব্যবহার কল্পনা করা যেতে পারে।'

তাজমহলের কত অংশই যে সাধারণের কাছ থেকে লুক্কায়িত আছে, সেই সম্পর্কে ওপরের পরিচ্ছেদ একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। সাধারণ দর্শক, স্মৃতিস্তম্ভের কক্ষে উঁকি দিয়ে, দিনের পরিশ্রম সার্থক ভেবে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসেন এই ধারণা নিয়ে যে, তিনি ধনবান শাজাহানের স্বনির্মিত একটা মহান সমাধি দেখে এলেন। কিন্তু তিনি খুবই খারাপভাবে প্রতারিত হচ্ছেন। Keene উল্লেখ করেছেন যে, অসংখ্য নিচুতলার ঘর লালপাথরের খণ্ড দিয়ে বন্ধ করে রাখা আছে। এই ব্যয়বহুল প্রাসাদকে মুসলিম কবরে পরিণত করার পর ঘরগুলোর আর প্রয়োজন না থাকায়, শাজাহান সেগুলো বন্ধ করিয়ে দেন। কাজেই, নতুন কিছু নির্মাণ করা তো দূরস্থান, শাজাহান তাজমহলের এক বিরাট অংশ হয় ধ্বংস করেছিলেন, নয়তো বুজিয়ে দিয়েছিলেন। এই একই জিনিষ ঘটেছে ভারতের সমস্ত মধ্যযুগীয় কবরের ক্ষেত্রে, যতই তাদের হুমায়ুন, আকবর ইতমাদ উদ্দৌলা, সফদরজং বা অন্য কারুর কবর বলে দেখবার চেষ্টা হোক না কেন।

তাজমহলের পশ্চাৎভাগে প্রশস্ত লাল পাথরের চত্বরে দাঁড়িয়ে, পার্শ্বে প্রবাহিত যমুনা নদীর দিকে তাকিয়ে, দর্শক হয়তো অনুমান করতে পারেন যে, শুধু নদীর দিকে মুখ করে সারিবদ্ধ ১৪টি ঘর থেকে থাকলে, বিরাট মর্মর ভিত্তির নীচে সম্পূর্ণ নীচের তলাটিতে কত বেশী ঘরই না থাকবে।

দর্শক আরো অনুমান করতে পারেন, শুধু লাল পাথরের চত্বরের নীচে যদি এতগুলো ঘর থেকে, থাকে পুরো জমির সমতলের নীচে যমুনা পর্যন্ত মোট কত-গুলো নীচের তলা থাকতে পারে। কাজেই জমির সমতল থেকে মর্মরের ভিত্তি পর্যন্ত এই রকম অনেকগুলো নীচের তলা আছে, যার প্রত্যেকটিতেই আছে অসংখ্য ঘর। দর্শকদের এর একটাও দেখানো হয় না। এই হিন্দু প্রাসাদকে মুসলিম কবরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শাজাহান আত্মসাৎ করার পর থেকেই এই সমস্ত ঘরগুলো দর্শকদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিকদেরও তাজমহলের সকল কক্ষে প্রবেশের ঘরে অধিকার দেওয়া হয় না। পরিবর্তে তাকে গেলানো হয় কল্পিত শাজাহান-মমতাজের প্রেমকাহিনীর রূপকথা।

Bernier এর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট যে, ১৬৩০ সালে শাজাহান কর্তৃক এই হিন্দু প্রাসাদটি দখলের পর থেকেই এই ঘরগুলো পরিদর্শনের ওপর নিষেধ আরোপ করা হয়েছিলো। শাজাহানের রাজত্বকালে Bernier এসেছিলেন ফরাসী পর্যটক হিসেবে। তিনি লিখছেন 'গম্বুজের নীচে আছে একটা ছোট ঘর, যাতে আছে একটা সমাধি, যা আমি ভিতরে গিয়ে দেখতে পারিনি। বছরে মাত্র

একবার ছাড়া এটা উন্মুক্ত রাখা হয় না। সেই সময় বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু সমাধির পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে কোন খৃষ্টানকে (অমুসলিমকে) প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না।' প্রকৃতপক্ষে এর কারণ হচ্ছে, অত্মসাতের কথা যেন জানাজানি না হয়ে যায়।

লালপাঁথরের চত্বরের নীচের অংশ ছাড়াও আরেকটি বিরাট নিম্নতল আছে মর্মর মঞ্চের নীচে, যাতে অনেক ঘর আছে। স্মৃতিস্তম্ভের কক্ষ থেকে সিঁড়ি দিয়ে কবরের কক্ষে নেমে আসা দর্শককে বোঝান হয় যে, ওখানে একটাই অন্ধকার ঘর আছে, যাতে আছে দুটি কবর। সত্যির সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। সেখানকার এই অন্ধকারটা পাশের কক্ষগুলি সম্পর্কে দর্শকের অজ্ঞতার একটি প্রতীক।

তাড়াহুড়ো করে দেখতে আসা অনেকেই এই ধারণা নিয়ে আসেন যে, মর্মর প্রাসাদটিতে আছে জমির ওপরে একটা স্মৃতিস্তম্ভের কক্ষ আর নীচে একটি কবরের কক্ষ। কিন্তু এদেরকে ঘিরে অনেক বিস্তৃত কক্ষ আছে। তাঁর Handbook এর ১৬৪ পাতায় Keene বলছেন, 'স্মৃতিস্তম্ভের প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরের চারপাশে আছে চারটি চতুষ্কোণ হলঘর, আর আছে চারটি আটকোণা হলঘর। এই হলঘরগুলো একটা প্রবেশ পথের দ্বারা পরস্পর যুক্ত আছে স্মৃতিস্তম্ভ প্রকোষ্ঠের সঙ্গে, যাতে ঐ কবরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ এবং নির্গমন করা যায়। প্রত্যেক আটকোণা হলের দক্ষিণে আছে একটা সিঁড়ি, যা উঠে গেছে ওপরতালায়। সেখানে আছে একই ধরণের হল এবং প্রবেশ পথ।'

যেহেতু, মাটির সমতলে মর্মর প্রাসাদে অনেক হলঘরও আটকোণা কক্ষ আছে, এটা পরিষ্কার যে, ঠিক নীচের তলাতেও এই ধরণের হলঘর ও কক্ষ আছে। দর্শক যদি কেন্দ্রীয় কবরের প্রকোষ্ঠ থেকে কক্ষগুলোতে প্রবেশের পথ না দেখেন, তার কারণ হচ্ছে যে, ওগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই মর্মরের ভিত্তি থেকে যমুনার তল পর্যন্ত তাজমহলের নিচু তলায় প্রকোষ্ঠগুলিতে অনেক কিছুই অনুসন্ধান, অপসারণ এবং আবিষ্কার করার আছে। এই মাটির তলায় সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি যদি উন্মুক্ত করা হয়, তবে শাজাহান কর্তৃক এই প্রাসাদ আত্মসাতের কাহিনীটি জোড়া লাগাতে তা খুবই সাহায্য করবে।

'নীচু তলার ঘরগুলি দেয়ালচিত্র ও অন্যান্য কারুকার্য দ্বারা সজ্জিত ছিলো' Keene এর এই মন্তব্যের প্রতি আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাজমহল যে প্রাক্তন হিন্দু প্রাসাদ, তার সপক্ষে এটি একটি দৃষ্টান্ত। শাজাহান মাটির নীচে অসংখ্য কারুকার্যখচিত ঘর নির্মাণ করে থাকলে সেগুলো এভাবে বন্ধ করিয়ে দিতেন না। বাদশানামার মতে মমতাজাবাদে (খাসপুরা ও জয়-সিংহপুরার ওপর নামটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো) চারটি সরাই ছিল, যার

প্রত্যেকটিতে ছিলো ১৩৬টি করে কক্ষ। আর ছিলো একটি কেন্দ্রীয় চতুষ্কোণ চত্বর, যেখান থেকে নির্গত হয়েছিলো পরস্পরের সমকোণে সংযুক্ত রাস্তা। বর্তমানে তাজমহল নামে পরিচিত হিন্দু প্রাসাদটির চারপাশে যে ছিলো অসংখ্য রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত অন্যান্য বিরাট সৌধ, তারই সাক্ষ্য মেলে এই উক্তিতে। সংস্কৃতে 'পুরা' শব্দের অর্থে এই জিনিষটিই বোঝায়। এই বিরাট প্রাসাদ অনুষঙ্গ যুক্তি-গ্রাহ্য হয়, যদি ধরে নেওয়া যায় যে এর কেন্দ্রস্থলে ছিলো একটি অনুপম প্রাসাদ। যার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহ করাও কঠিন, সেই ধরণের অনুষঙ্গ কবরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়।

বই এবং প্রবন্ধ থেকে তাজের সম্বন্ধে উদ্ধৃত উক্তি প্রথাগত তাজ ইতিকথার অসারত্বই প্রতিপন্ন করে এবং প্রমাণ করে যে, তাজমহলের উদ্ভব হয়েছিলো কবর হিসেবে নয় প্রাসাদ হিসেবে। আমরা এখন এই প্রাসাদটির সমীক্ষায় মন দেবো।

Vincent Smith কর্তৃক তাঁর বই 'Akbai the great Moghul' বইয়ের ৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বাবর তাঁর আগ্রার উদ্যান প্রাসাদে পরলোকগমন করেন। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, বাবরের পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরী যাঁরাই আগ্রার শাসক ছিলেন, তাঁরাই অধিকারী হিসেবে অথবা তাজমহলের তদানীন্তন অধিকারী মানসিংহ বা তাঁর পৌত্র জয়সিংহের অতিথি হিসাবে অন্তত কয়েকটা দিন বা ঘণ্টা তাজমহলে কাটিয়ে গেছেন। ফার্সী কবি সলোমনের মতে একটা প্রচণ্ড আক্রমণের পর জয়পালের হাত থেকে আগ্রা দুর্গ অধিকার করেন মহম্মদ ঘোরী। যিনি দুর্গের অধীশ্বর হতেন, তাজের অধিকারও তাঁর ওপর বর্তাতো। কাজেই, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে, জয়পালের অধিকারে ছিলো তাজ এবং তিনি সেখানে বাস করতেন। তারপর নিশ্চয়ই মহম্মদ ঘোরী তাজমহলে বাস করে থাকবেন, যদিও নিরাপত্তার কারণে হয়তো তিনি পছন্দ করে থাকবেন আগ্রা দুর্গের ঘেরা জায়গায় থাকতে। অন্য যারা এই ২৬ কক্ষ বিশিষ্ট মর্মর প্রাসাদের অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয়, তাঁরা হচ্ছেন মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের পর ক্ষমতায় আসা ডুয়ার রাজপুত গোষ্ঠির লোকেরা, বিশালদেব চৌহান, বহলুল লোদী, সিকিন্দার লোদী, বাবর, হুমায়ুন, শের শাহ, জালালখান লোদী, হুমায়ুন আবার, আকবর, মানসিংহ, জগৎ সিংহ এবং জয়সিংহ। সমস্ত প্রচলিত বিবরণীর স্বীকৃতি অনুযায়ী শেষোক্ত ব্যক্তির কাছ থেকেই তাজমহল ছিনিয়ে নিয়ে শাজাহান একে কবরে রূপান্তরিত করেন।

যেহেতু আগ্রার নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা তাজমহল বংশানুক্রমে রাজকীয় নিবাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, এটা পরিষ্কার যে এখানে বহু রাজকীয় জন্ম ও মৃত্যু ঘটেছে, যার সাক্ষ্য মেলে এখানে বাবরের মৃত্যুর উল্লেখ থেকে।

আগ্রা দুর্গের দরদালানে তাজের দিকে মুখ করে আছে একটি ছোট কাঁচ, যা দেওয়ালে গাঁথা আছে তাজমহলের চিত্রকে ধরার জন্য। তাজ ইতিকথার উদ্ভাব-

করা এই উদ্‌ভাবনটিকে কাজে লাগিয়েছেন ইতিকথার মোহ বাড়িয়ে তুলতে। হাজার হাজার ক্ষুদ্র প্রতিফলক প্রাসাদের বাঁকানো দরজায় বা মেয়েদের পোষাকে খচিত করা; প্রাচীন বহুল প্রচলিত রাজপুত প্রথা। রাজস্থানের অসংখ্য প্রাচীন প্রাসাদে এই ধরনের কাচের প্রতিফলক এখনো রয়েছে দেখা যায়। মেয়েদের পোষাক সজ্জার কাজে এখনও এগুলো ব্যবহৃত হয়। যদি সারাসেনীয় স্থাপত্য বলে কিছু থাকে, তবে তা ঢাকা দেওয়ায় বিশ্বাসী হতে পারে কিন্তু কখনোই কাঁচের প্রতিফলকের কথা চিন্তা করতে পারেনা। আগ্রা দুর্গের সুড়ঙ্গ পথে রক্ষিত এই কাঁচের প্রতিফলকের সাহায্যে রাজপুত শাসক দুর্গ থেকে তাজ নিরীক্ষণ করতেন। বন্দীদশায় শাজাহানকে তাজের দিকে মুখ করা দুর্গের অংশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কাজেই বন্দীদশায় তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন এই ক্ষুদ্র কাঁচের টুকরোয় প্রতিফলিত তাজের প্রতিবিম্ব দেখে. একথা ধারণা করা অবাস্তব। আর একটা অবাস্তব ও অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই ধারণা যে, একজন বৃদ্ধ শাসক সমস্ত সময় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টিকে আরো ক্ষীণ করে তুলবেন একটি ক্ষুদ্র কাঁচের টুকরোর দিকে তাকিয়ে থেকে তাজের অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখে, যখন ঐ সৌধের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তিনি একটি প্রত্যক্ষ এবং পরিষ্কার দৃশ্য পেতে পারেন। তাছাড়া, এই ধরণের কাজে কি তাঁর ঘাড় ব্যথা হবে না? ইতিহাসের পাঠক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং সাধারণ দর্শকেরা কখনো মাথা ঘামান নি তাজইতিকথার এই সমস্ত শিথিল অংশগুলিকে ঠিকভাবে সাজিয়ে দেখতে যাতে সব মিলিয়ে কাল্পনিক হলেও একটা সুসঙ্গত কাহিনী দাঁড় করানো যায়। তা যে করা হয়নি তার প্রমাণ ওপরেই দেওয়া আছে।

একটি সরকারী পিয়ন আমাদের জানায় যে তার পিতা ইনশা-আল্লাখান প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই আয়নাটি স্থাপন করে। তা হয়ে থাকলে, আয়নায় শাজাহান কর্তৃক তাজমহলের প্রতিচ্ছবি দেখার কাহিনী একটা বিরাট ধাপ্পা।

মধ্যযুগীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজে ব্যয়িত সময়, পরিশ্রম এবং অর্থের সাহায্যে লব্ধ ফলের সম্বন্ধে পাঠকদের ধারণা স্পষ্ট হবে, যদি সমসাময়িক এই ধরণের কোন প্রকল্পের সঙ্গে তাদের তুলনা করে দেখা হয়। মহাত্মা গান্ধীর সমাধির সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাক তাজমহলকে, যদি তা মূলত কবর হিসাবে উদ্ভূত বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। মহাত্মা গান্ধীর সমাধি নির্মাণেও ১৭ বছর লেগেছিলো। এর চারপাশে আছে একটা বাগান। নির্মাণে ব্যয় হয়েছে কোটি কোটি টাকা। কাজেই মোটা মুটি ভাবে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি নির্মাণে ব্যয়িত সময়, পরিশ্রম এবং অর্থ মিলে যায় সবচাইতে অত্যুক্তিকর বিবরণী মতেও, তাজমহল নির্মাণে ব্যয়িত সময় অর্থ এবং পরিশ্রমের সঙ্গে। কিন্তু ফল হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা। আড়ম্বর, বিরাটত্ব, পরিসর, কারুকার্য এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তাজমহলের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর

সমাধির কোন তুলনা চলে না। মহাত্মা গান্ধী সর্ব জনের শ্রদ্ধা এবং অনেক বেশী সংখ্যক লোকের ভালবাসার পাত্র হওয়া সত্ত্বেও এই তফাৎ ঘটেছে। স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের সঙ্গে, বিশ্বাস করা হয় যে, তাজে ছিলো রূপোর দরজা, সোনার গরাদ, আর মুক্তো খচিত এক মর্মরের পর্দা। পাঠকেরা সহজেই এই সবের মোট খরচ অনুমান করতে পারেন, যা পৌছুবে একটা অবিশ্বাস্য অঙ্কে। সম্ভবত, সমস্ত মুঘল শাসকেরা একযোগেও কেবল একটা স্মৃতিসৌধে এতটা অর্থ ব্যয় করতে পারতেন না। তাছাড়া ভিখারী এবং ফকির অধ্যুষিত স্মৃতিসৌধের জন্য কে এত অর্থ ব্যয় করতে পারেন? আর, সমাধির ক্ষেত্রে এই বিলাসিতা অশোভন। কেবল মন্দির এবং প্রাসাদেরই এই জাঁকজমক উপযুক্ত।

মর্মর চতুষ্কোণের দিক থেকে তাজে প্রবেশের দরজা এবং স্মৃতিস্তম্ভ প্রকোষ্ঠে প্রবেশের জায়গা দুটোই দক্ষিণমুখো। তাজমহল মূলত কবর হলে, এই দরজা হতো পশ্চিমমুখী, কেননা ইসলাম ধর্ম মতে জীবিত বা মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পশ্চিম দিক নির্দিষ্ট। তাজমহলের কবর হিসেবে উৎপত্তির প্রচলিত কাহিনীকে খণ্ডন করার পক্ষে এইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া মধ্যযুগীয় মুসলিম সৌধসমূহের প্রায় সবই কবর। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, একদল বহির্মুখী শাসক বসবাসের জন্য প্রাসাদ না বানিয়ে কবর বানিয়েছেন অজস্র। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী পূর্বসূরীর জন্য যিনি প্রাসাদোপম কবর বানিয়েছেন, তিনিই আবার পূর্বসূরীর রাজত্ব কালে তাঁর রক্তের জন্য লালায়িত ছিলেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে ওপরের দুটো বিবৃতিই সত্যি, তা হলেও, এই কবর নির্মাণের মধ্যে কিছুটা সঙ্গতি ও মাত্রা থাকা প্রয়োজন ছিলো। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আকবর, হুমায়ুন ও মমতাজের কবর তুলনা করে দেখা যাক। হুমায়ুন ভারতে নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার ছয় মাসের মধ্যেই মারা যান। তাঁর গর্ব করার মতো কোন সাম্রাজ্য ছিলো না, অথচ তাঁর তথাকথিত কবরটি একটি প্রাসাদোপম সৌধ। মুঘলদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আকবরের কবরটি সিকান্দ্রায় অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল ও সাধাসিধে। শাজাহানের দ্বিতীয় মহিষী এবং তাঁর সহস্রাধিক নর্মসহচরীর একজন মমতাজের স্মৃতিসৌধটিই সবচাইতে শ্রেষ্ঠ। আড়ম্বর এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে তাজমহল প্রথম, হুমায়ুনের কবর দ্বিতীয় ও আকবরের সমাধি তৃতীয় বলে গণ্য হয়।

পাঠককে এখন চিন্তা করে দেখতে হবে, এই প্রাসাদগুলি যাদের কবর বলে পরিচিত, উৎকর্ষেরদিক থেকে ইতিহাসেও তাঁরা একই ক্রমানুসারে চিহ্নিত হয়েছেন কিনা। এই সমস্ত কবরগুলি যে সবই প্রসাদ এবং আগাগোড়া হিন্দু রীতিতে নির্মিত সেই কথাও মনে রাখতে হবে। এতেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, প্রশ্নটা ছিলো নতুন কোন সমাধি সৌধ নির্মাণের নয়, হাতের কাছে পাওয়া রাজপুত

প্রাসাদ বা মন্দিরকে কবরের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার। সেই কারণেই কবর-গুলিতে শায়িত দেহগুলির অপেক্ষাকৃত গুরুত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এদের তুলনামূলক নির্মাণসৌকর্যের মধ্যে। প্রত্যেকটি মুঘল শাসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে বিশৃঙ্খলা ও ভয়ানক গৃহবিবাদ শুরু হয়ে যেতো, তাতে পরলোকগতের জন্য কোন বিশেষ সমাধিসৌধ নির্মাণের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। কারুর হাতেই রাজকোষের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকতো না, আর থাকলেও উত্তরাধি-কারের দাবী সাব্যস্ত করার যুদ্ধে তা খরচ না করে একটা নিস্ফলা আবেগের প্রকল্পে, মৃত পূর্বসূরীর স্মৃতিসৌধের জন্য খরচ করতে যাবেন কে? কেইবা এই প্রাসাদ নির্মাণের তত্ত্বাবধান করবেন, কি ভাবেই বা করবেন?

তাজমহল ইতিকথার প্রচলিত বিবরণীর অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধের মধ্যে একটা ব্যাপারে প্রত্যেকটি বিবরণীই একমত, তা মধ্যযুগীয়, আধুনিক, মুসলিম বা অমুসলিম যে কোন বিবরণীই হোক না কেন। তা হচ্ছে তাজের অধিকার সম্পর্কে কোন বিতর্ক বা প্রশ্ন নেই, এটা ছিলো মানসিংহের নাতি জয়সিংহের দখলে। তাদের থেকেই জয়পুরের রাজপরিবার এসেছেন।

এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, নতুন দিল্লীর তথাকথিত হুমায়ুন কবর এখনো 'জয়পুর এষ্টেটের' অংশে অবস্থিত। কাজেই দিল্লীর জয়পুর রাজপরিবারের মালিকানাস্থিত একটি প্রাসাদ ছিলো এই কবরটি।

আর তাজমহল ছিলো একই পরিবারের দখলে আগ্রায় একটি প্রাসাদ। স্থাপত্যের দিক দিয়ে দুটোই অনুরূপ, কিন্তু আড়ম্বর, সৌন্দর্যও সূক্ষ্মতায় তাজমহল দিল্লীর সৌধটিকে ছাড়িয়ে যায়।

শাজাহান কর্তৃক অধিকারের আগে তাজের উপর জয়সিংহের অবিসম্বাদী দখল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বস্তুত, আমাদের পাওয়া সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে তাজে জয়সিংহের মালিকানার সংবাদটি হচ্ছে সেই কেন্দ্রদণ্ড যার মাধ্যমে সমস্ত ব্যাপারটা শাজাহান-ইতিকথাকে নস্যাৎ করে রাজপুত উৎপত্তির দিকে ঘুরে গেছে।

আবেগের দ্বারা আপ্লুত কাহিনী যদি বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত না করে তাহলে এক নজরেই বুঝতে পারা যাবে যে, তাজের সম্পত্তির ওপর জয়সিংহের অধিকার সম্পর্কে সর্ববাদীসম্মত বিবরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ঠিক এখানে এসেই ভয়ানক ভুলের শিকার হয়েছেন। শাজাহান কবরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বিশ্বাস করে তাঁরা সবাই ধারণা করেছেন যে, তিনি জয়সিংহের কাছ থেকে একখণ্ড উন্মুক্ত জমি দখল করেছিলেন। কিন্তু আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে খুঁটিয়ে দেখে আগেই জানতে পেরেছি যে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তাজমহল ইতিকথার সবটাই বানানো। শাজাহান যে একটা তৈরী করা প্রাসাদ দখল করে

তা কবরের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, এই সিদ্ধান্তের হাত কিছুতেই এড়ানো যাচ্ছে না।

যদিও আমরা দেখিয়েছি যে, জয়সিংহের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া দিয়ে পুরো ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যায়, তাহলেও উত্থাপিত অন্য প্রমাণগুলি আমাদের বক্তব্যকে আরো জোরদার করে। তাজমহলের অভ্যন্তরে পুরো কারুকার্যমণ্ডিত দেয়ালের পর্দা রচিত হয়েছে ভারতীয় ফুলকাটা-নক্সা অনুযায়ী। যদি কবর হিসেবে তাজের উদ্ভব হতো, স্ত্রীর স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরের দেয়ালের পর্দায় শাজাহান কখনোই ভারতীয় ফুলের চিত্র অঙ্কিত হতে দিতেন না। অবশ্য তর্ক তোলা যেতে পারে যে, যেহেতু তাজের নির্মাণে নিযুক্ত কারিগরেরা হিন্দু ছিলো, অতএব তাজের অঙ্গে তাদের অঙ্কনরীতিই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যিনি অর্থের যোগানদার, তাঁর মতই এই ব্যাপারে প্রাধান্য পাবে। তাছাড়াও, যখন ব্যাপারটা মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি সম্বন্ধীয়, একটা বিকৃত ধর্মের প্রতীককে কখনই স্বেচ্ছায় তাজের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হতে দেওয়া হতো না। বস্তুত, ইসলাম ধর্মও ঐতিহ্যে এই ধরণের ব্যয়বহুল কবর নির্মাণ করে অভ্যন্তরে বিস্তৃত অলঙ্করণ করানোর ধারণা কখনোই সমর্থিত হয় না। অবশ্য শাজাহানের পক্ষে এগুলো মানিয়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না, কেন না তিনি পেয়েছিলেন একটা তৈরী 'পৌত্তলিক' প্রাসাদ।

যাঁরা প্রচার করেন যে, মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসকেরা তাঁদের নির্মিত স্মৃতিসৌধে হিন্দুরীতি ব্যবহারে অনুমতি দিতেন উদারতার সঙ্গে, তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন যে, এই বিংশশতকের কম গোঁড়ামির যুগেও কোন গোঁড়া মুসলিম, মন্দিরের অনুকরণে কোন মসজিদ বা কবর নির্মাণের পরিকল্পনা সাহস করে করতে পারবেন না।

অন্য একটা দিক থেকে দেখলেও নির্মাণকার্যের কারিগরেরা হিন্দু ছিলেন বলেই তাজের অলঙ্করণে হিন্দু রীতি ও চিহ্নের উপস্থিতির ব্যাখ্যা নিরর্থক হয়। প্রচলিত মুসলিম বিবরণীতে (যা সবই আমরা কাল্পনিক বলে প্রমাণ করেছি) বরাবর দেওয়া আছে তাজের নক্সাকারী ও কারিগরদের মুসলিম নাম। হিন্দুরীতি বা চিহ্নের প্রতি তাদের ভালোবাসা বা ভক্তির প্রশ্ন অবান্তর। আরও মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু মন্দির, চিত্রকর্ম, লেখা, ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃতি ও ধর্মের বিনাশই ছিলো ভারতস্থিত প্রত্যেক মুসলিম শাসকের প্রাথমিক এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই উৎসাহ দেবার কথা না হয় বাদই গেলো, তাঁদের নির্মিত স্মৃতিসৌধে ভারতীয় চিত্রকলা, পদ্ধতি ও প্রতীকের আমদানীই বা সেই একই মুসলিম শাসকেরা কি করে সহ্য করবেন ? এই সমস্ত বিবেচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, একটা অলীক ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐতিহাসিক ও স্থপতিরা

করেছেন যে, মধ্যযুগীয় কবর ও মসজিদ সবই মুসলিম স্থাপত্য। তাঁরা এগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে খুঁটিয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

আরো দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কখনো অসংখ্য উদাহরণের সম্মুখীন ঐতিহাসিক ও স্থপতিরা অস্বস্তির সঙ্গে সচেতন হন বটে যে, যাঁদের কবর হিসেবে সৌধগুলি নির্মিত বলে বলা হয়, তাঁদের জন্মের বহু পূর্বেই এই সৌধগুলি বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু তাঁরা ব্যাখ্যা দেন এই মর্মে যে, মৃতব্যক্তিরা আগেই তাঁদের কবর নির্মাণ করে রেখে গিয়েছিলেন। তাই মাণ্ডুতে (মধ্য ভারতে) হোসার শাহের কবর, সেকান্দ্রায় আকবরের কবর আর দিল্লীতে গিয়াসুদ্দীন তোগলকের কবর সম্বন্ধে বলা হয় যে আত্মকবর নির্মাণকারী শাসকেরা এগুলো আগেই রেখে গিয়েছেন। তাঁরা জীবিতাবস্থায় কোন কিছুই গ্রাহ্য করতেন না, বরং এমনভাবে জীবন যাপন করতেন যেন তাঁদের কোনদিন মৃত্যু হবে না। মৃত শাসকেরা নিজেদের কবর আগে নির্মাণ করিয়ে রেখে গিয়েছিলেন এটা বিশ্বাস করা অবাস্তবতার চূড়ান্ত। পরিষ্কার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, প্রাচীন রাজপুত-নির্মিত প্রাসাদগুলিই ব্যবহৃত হয়েছিলো মুসলিম শাসকদের সমাধির উদ্দেশ্যে। জীবিত- কালে সর্বশক্তিমান শাসকের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরী উপযুক্ত মর্যাদায় তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করেন নি এটা শুনতে ভাল দেখাবেনা বলে পরবর্তীরা সমাধি সৌধ নির্মাণের মিথ্যে বিবরণ রেখে গিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আকবরের কবর নির্মাণ সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের দাবী। ঐতিহাসিক ও স্থপতিরা জাহাঙ্গীর ও অন্যান্যদের তাঁদের পূর্ববর্তীর কবর নির্মাণের দাবীর অসারতা বুঝতে পেরে তার জায়গায় নিজেদের বানানো কাহিনী দিয়ে অসঙ্গতি দূর করতে চেয়েছেন। এই ধরণের বিচ্যুতি ও ইচ্ছাকৃত বিকৃতি থেকে ভারতীয় ইতিহাসকে মুক্ত করার সময় এসেছে।

তাজমহলের অলঙ্করণের ফাঁকে ফাঁকেই দেখা যায় পদ্মফুল অঙ্কিত রয়েছে। পদ্ম হিন্দুদের শুধু পবিত্র ফুলই নয়, হিন্দু অলঙ্করণের কাজের একটা অত্যাবশ্যক উপকরণও বটে। তাজমহলে এর সোচ্চার উপস্থিতি, তাজের রাজপুত উৎপত্তির কথাই জোরদার করে।

জয়সিংহপুরা পুরীকে ঘিরে থাকা প্রাচীর তাজমহলের চারিপাশ দিয়েও গেছে, মাঝখানে কোন ছিদ্র না রেখে। শাজাহান তাজমহলকে কবর হিসেবে নির্মাণ করিয়ে থাকলে এর চারপাশে ঘেরা থাকতো আলাদা প্রাচীর, পুরী থেকে দূরে, নৈঃশব্দ্য ও নির্জনতার খাতিরে। ঐ নগর প্রাচীর দিয়ে তাজমহলের ঘিরে থাকাটা আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই জোরদার করে যে মন্দির ও প্রাসাদ হিসেবে তাজের উৎপত্তি শহরের অংশ হিসেবেই। বর্তমানে কথিত তাজগঞ্জের প্রকাণ্ড দরজা দিয়েই তাজমহল প্রাসাদ অথবা মন্দিরের প্রবেশপথ। বারাণসীতেও

কাশী বিশ্বনাথ নামে খ্যাত শিবমন্দিরও শহরেরই অংশ এবং শহরের মধ্য থেকেই তাতে প্রবেশ করতে হয়।

তাজ, আগ্রা দুর্গের সঙ্গে একটা সুড়ঙ্গপথের দ্বারা যুক্ত। তাজের উৎপত্তি যদি কবর হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়, তবে একটা সুড়ঙ্গপথের উপস্থিতি শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অবাস্তবও বটে। কিই ব' জরুরী প্রয়োজনে নিষ্কাশনের দরকার হবে কবরে শায়িত মৃতদেহের ? শুধু মজা করবার জন্য এই সুড়ঙ্গ পথটি খোঁড়া হয়নি, কেননা, এই পথ নির্মাণে প্রভূত অর্থ ও উচ্চস্তরের দক্ষতার প্রয়োজন। বিগত প্রায় দু'শ বছর ধরে বৃটেন ও ফ্রান্স ভেবে আসছে, ইংলিশ চ্যানেলের তলা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করে দুটি দেশকে যুক্ত করার কথা। কিন্তু প্রচণ্ড সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা এই কাজটি হাতে নিতে সাহস করেনি। তাছাড়া পথটি রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রহরার ব্যবস্থা করা বেশ কষ্টসাধ্যও বটে। রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজন হবে অভ্যন্তরভাগ আলোকিত করার ব্যবস্থা, পাশ থেকে এবং ওপর থেকে মাটি পড়া বন্ধ করার ব্যবস্থা, স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাওয়া আর সরীসৃপের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা, আর রাজনৈতিক শত্রু ও দুষ্কৃতকারীদের লুকোনোর জায়গা হিসেবে যাতে ব্যবহৃত হতে না পারে তা লক্ষ্য করার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য, সুড়ঙ্গপথ কোন প্রাসাদের শুধু শোভা বাড়ানোর অপ্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে নির্মিত হয় না। তাজে এই সুড়ঙ্গপথের উপস্থিতি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় তখনই, যখন বোঝা যায় যে, তাজমহল নির্মিত হয়েছিলো প্রাসাদ হিসেবে, কবর হিসেবে নয়। প্রাসাদে বসবাসকারী রাজার পলায়নের জন্য প্রয়োজন হয় সুড়ঙ্গপথ, যখন আচমকা তিনি শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। কবর হিসেবে নয়, প্রাসাদ হিসেবেই যে তাজের উৎপত্তি হয়েছিলো সেই সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

তাজের নিকটে একটি ঘাট এবং নৌকা ভেড়াবার জায়গার অস্তিত্বও এই অমোঘ সিদ্ধান্তের দিকেই ইঙ্গিত দেয় যে, তাজ ছিলো একটি প্রাসাদ। মাটির নীচের ১৪টি কক্ষ কবরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হলেও, প্রাসাদের পক্ষে দরকারী। বসাই স্তম্ভ এবং অন্যান্য যে সব অনুষঙ্গের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সম্পর্কেও একথা খাটে।

শাজাহান কর্তৃক দখলের আগে তাজ সম্পত্তি যে জয়সিংহের অধিকারে ছিলো, এসম্বন্ধে সব বিবরণী একমত হলেও এই দখল করার পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের মতের অনেক পার্থক্য আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, শাজাহান নিযুক্ত লেখক মোল্লা আবদুল হামিদের মতে তাজপ্রাসাদ নেওয়া হয়েছিলো, সাজাহানের অধিকারভুক্ত অন্য জায়গায় জয়সিংহকে কিছু জমি প্রদানের বিনিময়ে। কিন্তু

শ্রী বি. পি. সাকসেনা তাঁর বইতে বলছেন যে, এই জমিটি সামান্য কিছু মূল্য দিয়ে কিনে নেওয়া হয়েছিলো। লক্ষণীয় যে, মোল্লা হামিদ যেমন লিখে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন তাজের পরিবর্তে কোন জমিটা দেওয়া হয়েছিলো, শ্রীসাকসেনাও বলতে পারছেন না, ঐ সামান্য মূল্য কত ছিলো।

জাল এবং মিথ্যা বিবরণ লিপিবদ্ধ করাবার নির্দেশ দিতে শাজাহানের কোন দ্বিধা ছিলো না। ঐতিহাসিকেরা একথা জানেন। রাজপুত থাকা অবস্থাই শাজাহান তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। কাজেই জাহাঙ্গীরের নির্দেশে লিখিত বিবরণীতে তাঁর সম্বন্ধে খুবই খারাপ অনুলিপি শাজাহানের সিংহাসনরোহণের সময়ও সভাসদদের কাছে ছিলো। তাঁর রাজত্ব শুরু হওয়ার পরেও এই ধরণের অনিষ্টকর বিবরণী সভাসদদের কাছ থেকে যাবে এটা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। কাজেই তিনি নির্দেশ দিলেন একটা জাল 'জাহাঙ্গীর নামা' লেখার এবং তাঁর পিতার নির্দেশে লিখিত বইয়ের বদলে এর অনুলিপি বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। তাই, যদি দেখা যায় যে, শাজাহানের নিজের নির্দেশে ও প্ররোচনায় তাজমহল নির্মাণের পুরো বিবরণ জাল করা হয়েছে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না।

প্রায়ই তর্ক করা হয় যে একমাত্র ভারতের মুসলিম শাসকদের পক্ষেই সম্ভব ছিলো ব্যয়বহুল সৌধ নির্মাণ করানো, কেননা, পশ্চিম এশিয়ার তথাকথিত কুতুব মিনারের ও তাজমহলের মতো মধ্যযুগীয় ভারতের অনেক সৌধের অনুরূপ সৌধ দেখা যায়। এই মতবাদের প্রবক্তারা সুবিধাজনকভাবে ভুলে যান যে, মোহম্মদ গজনী, তৈমুরলং ও অন্যান্য আক্রমণকারীরা স্বীকার করে গেছেন যে, জোর করে ভারতে প্রবেশের পর তাঁরা ভারতে নদীর ঘাটের সৌন্দর্য দেখেই হতবাক হয়ে গিয়েছেন, বিরাট প্রাসাদ আর মন্দিরের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেলো। ভারতের দক্ষতার যে উৎকর্ষ ঘটেছিলো সেই তুলনায় পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্য শৈশবেই ছিলো। ভারতের ক্ষত্রিয়েরা যখন পশ্চিম এশিয়া শাসন করতেন, তখন সেখানে অনেক প্রকাণ্ড সৌধ নির্মিত হয়েছিলো। কিন্তু তাঁদের কাজ শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের যুগের সূচনা হয়। চতুর্দিক ব্যাপী বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংস নিয়ে আসে অশান্তির দীর্ঘ সময়, যখন কলাবিদ্যার চর্চা উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, আর সমস্ত ধরণেই শিক্ষাই বাধা প্রাপ্ত হয়। ভাগ্যান্বেষী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত বিরাট সব দল তাদের নিজেদের দেশে শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ না পেয়ে লোভীর মতো দৃষ্টি ফেরায়, প্রাচুর্য্যের জন্য বিখ্যাত ভারতে।

তৈমুরলং আত্মজীবনীতেই স্বীকার করে গেছেন যে, নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করার সময় তিনি পাথরের কারিগর, বাড়ী তৈরীর অন্যান্য মিস্ত্রী ও

চিত্রকরদের রেহাই দিয়ে পাঞ্জাব ও অন্যান্য উত্তরের অঞ্চল দিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় পাঠিয়ে দিতেন যাতে তারা ভারতীয় সৌধের মতো বিরাট কবর ও মসজিদ নির্মাণ করতে পারে।

তৈমুলং ও অন্যান্য আক্রমণকারীরা একটা ছককাটা পদ্ধতির অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। তাঁর স্বীকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সকল মধ্যযুগীয় মুসলিম আক্রমণকারীদের অনুসৃত পদ্ধতির কথা, যাতে তারা হাজার হাজার ভারতীয় কারিগরকে পশ্চিম এশিয়ায় পাঠিয়ে তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। সেই সঙ্গে তাদেরকে সেখানেই বসবাসে বাধ্য করে ভারতীয় যন্ত্রপাতি, দক্ষতা ও ঐশ্বর্য দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার ভারতের অনুকরণে অসংখ্য সৌধ নির্মাণ করিয়ে নেন।

পণ্ডিত, ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র ও স্থপতিদের একথা বোঝা উচিত যে, ভারতীয়-সারাসেনীয় স্থাপত্যের মতবাদটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা দরকার। ভারতীয় সৌধগুলি সারাসেনীয় নক্সা অনুযায়ী নির্মিত হয়নি, বরং সারাসেনের সৌধগুলি নির্মিত হয়েছিলো ভারতীয় নক্সায়, ভারতীয় কারিগর, যন্ত্রপাতি ও অর্থের সাহায্যে। কাজেই, প্রাচীন ভারতীয় সৌধের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সৌধের কোন সাদৃশ্য যদি থেকে থাকে, তার ব্যাখ্যা এভাবেই করা উচিত।

তাজমহল যে মূলত কবর নয় বরং মুসলিমপূর্ব যুগের প্রাসাদ, ওপরে উদ্ধৃত সাক্ষ্যের সাহায্যে একথা প্রমাণ করার পর এর নির্মাণকর্তা ও সঠিক নির্মাণ সময় খুঁজে পাবার চেষ্টা করাটা সঙ্গত হবে। সম্ভবত 'পুঁথিখানা' বা জয়পুর রাজ পরিবারে নথিপত্রের ভাণ্ডারে ১৬৬০ সালের কাছাকাছির ঘটনাবলীতে এবং ফতেপুর সিক্রীর প্রতিষ্ঠাতা সিকরওয়াল রাজপুতদের নথিতে এই সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত হতে পারে। এই ধরণের প্রচেষ্টা সার্থক হবে, যদি তা মধ্যযুগীয় ইতিহাসের স্বার্থপ্রণোদিত মিথ্যাচারকে খণ্ডন করতে পারে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে, তাজ নির্মিত হয় ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে। আমরা আগেই বলেছি যে, তাজের সৌন্দর্য, আড়ম্বর ও পরিসর তখনই সম্ভবপর ছিলো, যখন ভারতীয় জীবন মুসলিম আক্রমণের ফলে ডামাডোলের মধ্যে পড়েনি। বহুপ্রাচীন কালে নির্মিত হওয়ার দরুণ কালক্রমে মুক্তোখচিত মর্মরের পর্দা, ময়ূর সিংহাসন, রূপোর দরজা, সোনার গরাদ প্রভৃতি ব্যয়বহুল অনুষঙ্গ তাজ প্রাসাদেরই অংশ হয়ে পড়ে। এই বিরাট ঐশ্বর্যের অধিকার পাওয়ার জন্য শাজাহান লালায়িত ছিলেন। একটি শক্তিশালী মহান রাজপুত পরিবারের সর্বস্ব অপহরণ করার রাজনৈতিক সুবিধার কথা ভেবে তিনি মমতাজের মৃত্যুকে কাজে লাগিয়ে জয়সিংহকে তাঁর পিতৃপুরুষের প্রাসাদ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। তারপর থেকেই তাজমহল কবর হিসেবে অপ-ব্যবহৃত হয়।

এই সময় তাজের সমস্ত ঐশ্বর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ ও আসবাব খুলে নেওয়া হয়, সোনার গরাদ, রূপোর দরজা, ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতির ঠাঁই হয় শাজাহানের কোষাগারে, আর তাঁর নির্দেশিত ইতিহাসে মিথ্যে করে দেখানো হয় যে, এগুলো, তাঁরই সৃষ্টি।

সব ঐশ্বর্য লুণ্ঠিতা সুন্দরী বিধবার মতো সব অনুষঙ্গ বিবর্জিত বর্তমান তাজমহল দীন বিষণ্ণ মূর্তি সত্ত্বেও সুন্দর দেখায়। সমস্ত সাজসজ্জা যখন অটুট ছিলো কি অপরূপ মহিমময় সৌন্দর্যের দৃশ্যই না সে তুলে ধরতো। ঝলমলে আস্তরণ, মহামূল্যবান আসবাব, বিরল ফলও ফুলের বাগান, রূপোর দরজা, সোনার গরাদ, মুক্তো খচিত মর্মর জাফরি আর উজ্জ্বল ময়ূর সিংহাসন, এই সব মিলিয়ে তার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতো একটা শক্তিশালী রাজপুত শাসক-পরিবারের ব্যস্ততার কলরব।

দিনের পর দিন অসংখ্য দর্শক যে রকম তাড়াহুড়ো করে আগ্রা ষ্টেশন বা বাসের ঘাঁটি থেকে তাজে গিয়ে আবার ফিরে আসেন, তাকে একাধিক অর্থে সত্যিই দুঃখজনক বলা যেতে পারে। তাজের ভ্রান্ত ইতিকথা প্রচার ও জোরদার করার পিছনে এই ধরণের দর্শকের অবদান কম নয়। তাজকাহিনীর প্রচলিত বিবরণে অভিভূত সাধারণ দর্শক তাজে যাবার আগেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর অনুভূতি আরো মন্থর হয়, যখন সেচ্ছাবৃত বা অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত পরিদর্শ-কেরা তোতাপাখির মতো তাদের কানে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন।

দর্শক এতটা গভীরভাবে বিভ্রান্ত, অভিভূত এবং সম্মোহিত হয়ে পড়েন যে, ভুলে যান যে, মাটির নীচের কবর, তার ওপরতলার স্মৃতিস্তম্ভ এবং ওপরতলায় সব মিলিয়ে ২০ খানারও অধিক কক্ষ আছে ঐ আটকোণা কেন্দ্রীয় মর্মর প্রাসাদে। এটাই হচ্ছে সেই মুক্তোর মতো শাদা রাজপুতীয় কেন্দ্রীয় মর্মর প্রাসাদ। যে সামান্য পরিবর্তন শাজাহান এখানে করেছেন বলে মনে হয়, তা হলো কিছু উল্টানো 'u' আকৃতির বাঁকানো দরজার চারপাশের প্রস্তরখণ্ডের ওপর কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা আর নীচের তলায় একটি কবর ও তার ওপরতলায় ময়ূর সিংহাসনের কক্ষে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা। সাধারণের বিশ্বাসের ঠিক বিপরীতভাবে, কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ আছে দেওয়ালের প্রকাণ্ড আয়তনের তুলনায় খুবই সামান্য অংশে, আর তাও কয়েকটি বাঁকানো দরজার পাশের সমতল জায়গায়।

তাজমহল দেখে ফিরে আসা দর্শকেরা সাধারণত এই ধারণাই নিয়ে আসেন যে কবরের জন্য নীচের তলায় একটি ঘর আর তার ওপরের তলায় স্মৃতিস্তম্ভের জন্য একটি ঘর, মোট দুটি ঘরই এই প্রাসাদটিতে আছে। তাঁরা শুনে আশ্চর্য হন যে, মর্মরের তিনটি তলা মিলিয়ে মোট ২৬টিরও বেশী ঘর আছে তাজের, যা একটি প্রাসাদের পরিসরেরই সূচনা করে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মর্মর ভিত্তির নীচে যমুনা নদীর তল পর্যন্ত আরও দুটি তলা আছে, যাতেও আছে অসংখ্য ঘর।

শহর থেকে তাজের দিকে যাত্রা করলে এর একেবারে দূরের প্রবেশপথ যখন আধমাইল দূরত্বে, তখন দেখা যায় একটা লালপাথরের স্তম্ভ রাস্তা থেকে প্রায় দশগজ দূরে মাটিতে অর্ধলুক্কায়িত আছে। আরো দেখা যায়, এই স্তম্ভ থেকে একটা দেয়াল উঠে গিয়ে অ্যাসফল্টের পথের কোণাকুণি জমির সঙ্গে মিশে গেছে। উভয় পার্শ্বেই দেখা যায় কিছুটা ঘাসে আবৃত মাটির ঢিবি। স্পষ্টতই, এই ঢিবিগুলো সুরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো, যখন তাজ ছিলো একটি প্রাসাদ এবং যখন কবর হিসেবে এর রূপান্তর হয়নি।

এই যে স্তম্ভের কথা বলা হলো, তা দেখাচ্ছে যে, আরেকটা প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর তাজের চারপাশের বেশ খানিকটা জায়গা ঘিরে রেখেছিলো। আর এই প্রাচীরের মধ্যেই ছিলো কয়েকটা লক্ষ্যস্তম্ভ। এটাই হয়তো খাসপুরা ও জয়সিংহপুরা জনপদকে ঘিরে রাখা প্রাচীর হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, শাসকের প্রাসাদ তাজকে ঘিরে ছিলো অন্যান্য নাগরিকদের বাসস্থান। স্তম্ভের উত্তর পার্শ্বের দেওয়ালকে ঢেকে রাখা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য খনন কার্য চালালে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

শহর থেকে অ্যাসফল্টের রাস্তা ধরে এগুলে একেবারে বাইরের প্রবেশপথের অভ্যর্থনা চত্বরের কাছে কিছু লালপাথরের ঢাকা জায়গা দেখা যায়। এসবই দেখাচ্ছে যে, কবর হিসেবে নির্মিত হওয়া তো দূরস্থান, তাজমহল ছিলো পুরাতন আগ্রা শহরের প্রাণকেন্দ্র একটি প্রাসাদ।

একটা রূপকথার প্রাসাদের রাজপুত আধিপত্য সহ্য করা শাজাহানের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিলো। তিনি ঠিক করলেন যে একে বাসগৃহের অনুপযুক্ত করে দিতে হবে। তাই একে রূপান্তরিত করলেন কবরে। কাজেই, অধিকৃত রাজপুত প্রাসাদ ও মন্দিরকে কবরে পরিণত করার ১০০০ বছরের পুরাণো মধ্যযুগীয় প্রথারই একটি নিদর্শন এই তাজমহল।

প্রথাগত তাজমহল ইতিকথায় কিছু লোকের মন এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, তাঁরা বরং মমতাজের প্রতি শাজাহানের অলৌকিক ভালোবাসাই তাজমহল সৃষ্টির কারণ এই ভ্রান্ত ধারণায় অবিচল থাকবেন, কিন্তু সম্মত হবেন না এর পরিবর্তে একটা কম রোমহর্ষক কিন্তু সর্বাংশে সত্যি কাহিনী গ্রহণ করতে। বস্তুত, প্রাসাদ হিসাবে তাজের উৎপত্তির ধারণাই রোমাঞ্চকর ও সম্ভাব্য, কবর হিসাবে উৎপত্তির ধারণা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁরা ইতিহাসের চাইতে বিভ্রান্তিকে এবং সত্যির চেয়ে গোঁড়ামিকেই বেশী পছন্দ করেন, তাঁদের শোধরাবার কোন উপায় নেই। এঁদের মধ্যে আছেন সাধারণ পাঠক, আবার

তাঁরাও, যাঁদের ইতিহাসের পণ্ডিত বলা হয়। পূর্ববর্তীপৃষ্ঠাগুলিতে যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে, খোলামনের পাঠকেরা অবশ্যই তা বিবেচনা করে দেখবেন। কিন্তু গোঁড়াদের জন্য আমরা এক ভাঁড়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা না করে পারছি না। এই ভাঁড দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে বগলের নীচে একটা ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হতো। ভেড়ার ডাক অনুকরণ করতে পারে ঘোষণার পর সে বগলের নীচের ভেড়াটির ওপর চাপ দিতো, কিন্তু শ্রোতারা ঐ ভেড়ার সত্যিকারের ডাককে নকল ডাক মনে করে সন্তুষ্ট হতেন না। তারপর ভাঁড় মুখ দিয়ে আওয়াজ করতো ভেড়ার অনুকরণে আর এতে সন্তুষ্ট হতেন শ্রোতারা। এই কাহিনীতে একটা শিক্ষা আছে তাঁদের জন্য, যাঁরা বিপক্ষে প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস করে যাবেন যে, সুন্দর তাজের উৎপত্তি হয়েছিলো আনন্দের মধ্যে নয়, শোকের মধ্যে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সংগৃহীত সাক্ষ্যের সাল—তামামি

এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে স্মরণ করছি প্রচলিত কাহিনীর পক্ষে ও বিপক্ষে আহরিত সমস্ত প্রমাণ, যা অনুধাবনের ফলশ্রুতি হিসাবে পাঠক বুঝতে পারবেন প্রচলিত তাজ ইতিকথার অন্তঃসারশূন্যতা ও মিথ্যাচার। আমাদের আহরিত সাক্ষ্যের গুণাগুণ ও পরিমাণ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি যে, তাজমহল ছিলো একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ এবং একে শাজাহান জবরদখল করে সামান্য কিছু বাহ্যিক পরিবর্তনের সাহায্যে তাঁর অনেক নর্মসহচরীর একজনের কবরে রূপান্তরিত করেছিলেন।

শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের যুক্তির সপক্ষে আমরা মাত্র তিনটি তথ্য স্বীকার করে নিচ্ছি, যদিও এগুলো সম্পূর্ণ আপত্তিমুক্ত নয়।

১। আমরা স্বীকার করি যে, তাজের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে দুটি মুসলিম কবরের মতো স্তূপ আছে এবং এগুলো শাজাহানের অসংখ্য প্রেয়সীর অন্যতমা মমতাজের এবং শাজাহানের নিজের হতে পারে। এটুকু স্বীকার করে নেবার পর আমরা আমাদের আপত্তির কথা জানাচ্ছি। এটা ভালোভাবেই জানা গেছে যে, এই ধরণের অনেক স্তূপই জাল। অন্যান্য ঐতিহাসিক সৌধের চত্বরেও এই ধরণের স্তূপ দেখা গেছে, কিন্তু সেখানে মৃত ব্যক্তির সমাহিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আরেকটা আপত্তি এই যে, মমতাজকে সেখানে সমাহিত করার সঠিক তারিখ লিপিবদ্ধ নেই। কাজেই, খুবই সন্দেহ আছে যে, মমতাজকে আদৌ সেখানে সমাহিত করা হয়েছিলো কিনা। তাঁকে সমাহিত করার সময় উল্লেখিত আছে মৃত্যুর ছয়মাস থেকে নয় বছর পর্যন্ত। তাঁর মৃতদেহের জন্য একটি প্রাসাদোপম সৌধ নির্মিত হয়ে ছিলো বলার পর এই ধরণের অস্পষ্টতা সন্দেহজনক। আওরঙ্গজেবের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন অফিসার Manucci লিখে গেছেন যে, আকবরের কবরের ভিতরটা ফাঁকা। কে বলতে পারে যে, মমতাজের তথাকথিত কবর ফাঁকা নয়। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি সত্ত্বেও আমরা ধরে নিতে রাজী আছি যে, ঐ কবর দুটি মমতাজ এবং শাজাহানের হতে পারে।

২। প্রচলিত তাজ-ইতিকথার সপক্ষে আরেকটা তথ্য হলো এই যে, খিলান

এবং কিছু বাঁকানো দরজার পাশের দেয়ালে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা আছে। এই ব্যাপারে আমাদের আপত্তি এই যে, এই ধরণের বাণী আজমীরের আড়াই-দিন্‌-কা-ঝোপড়া ও দিল্লীর কুতুবমিনারে খোদিত আছে, যা পরিষ্কার ধাপ্পা। কাজেই, তাজের গায়ের এই খোদাইগুলির মূল্য সন্দেহাতীত নয়।

৩। প্রচলিত কাহিনীর সপক্ষে তৃতীয় তথ্য হলো এই যে, কিছু লেখক তাজ নির্মাণের কৃতিত্ব শাজাহানকেই দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের অনেক আপত্তি আছে। মোল্লা আবদুল হামিদের মতো লেখকেরা ছিলেন খোসামোদে শাসককে সন্তুষ্ট করে সহজে কিছু অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশী। দ্বিতীয়ত, শাজাহানের নিজের সভাসদ লেখক মোল্লা আবদুল হামিদও দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বীকার করেছেন যে, আর্জুমন্দ বানু বেগম ওরফে মমতাজ মানসিংয়ের প্রাসাদে শায়িত আছেন।

তাজমহল নির্মাণ সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর সপক্ষে যে সামান্য তিনটি তথ্য দেওয়া হয় তা কত দুর্বল একথা লক্ষ্য করার পর, আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আহরিত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

তাজ যে একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ এই বক্তব্যের সমর্থনে আমরা পাঁচটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেছি। তা হলো :—

১। শাজাহানের নিজের সভাসদ-লেখক মোল্লা আবদুল হামিদ স্বীকার করেছেন যে, জয়সিংহের অধিকারভুক্ত মানসিংহের গম্বুজ ওয়ালা রাজকীয় প্রাসাদটি নেওয়া হয়েছিলো মমতাজের সমাধির জন্য। তিনি প্রাসাদটি ধ্বংস করার কোন কথা বলেন নি।

২। শ্রীনুরুল হাসান সিদ্দিকীর বই 'The city of Taj' এ একই কথা বলা আছে।

৩। Tavernier এর সাক্ষ্যেও পাওয়া যায় যে, একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নেওয়া হয়েছিল। আর মমতাজকে সমাহিত করার আগেও এটা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করতো।

৪। সম্রাট শাজাহানের বৃদ্ধ প্রপিতামহ বাবরের স্মৃতিকথায় তাজের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। যাঁর নিমিত্ত এই কবরটি নির্মিত হয়েছিলো বলে বিশ্বাস, তাঁর জন্মের ১০০ বৎসর আগের কথা এটি।

৫। Encyclopaedia Britannica-র উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি এটা দেখাতে যে, তাজমহল প্রাসাদ অনুষঙ্গে আছে অতিথিশালা, রক্ষীগৃহ এবং আস্তাবল। এগুলো সবই প্রাসাদের অনুষঙ্গ কিন্তু কবরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। ওপরের এই প্রমাণগুলি ছাড়াও আমরা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলিও উপস্থিত করেছি :

৬। তাজমহল এই নামটাই বোঝায় মুকুট-প্রাসাদ বা ঝলমলে নিবাস (তেজ-মহা-আলয়), কবর নয়।

৭। শাজাহানের রাজত্ব পরিপূর্ণ ছিলো বিশৃঙ্খলা আর যুদ্ধবিগ্রহে, যেমনটা ছিলো ভারতের অধিকাংশ মুসলিম শাসকের ক্ষেত্রে। কাজেই তাঁদের অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা অথবা তাজের মত উচ্চাকাঙ্খী প্রকল্প শুরু করার প্রবণতা ছিলো না।

৮। শাজাহানের কামুকতা ও লাম্পট্যের জন্য মমতাজের প্রতি তাঁর এমন কোন বিশেষ আসক্তির সম্ভাবনা ছিলো না, যাতে তিনি একটা প্রাসাদই নির্মাণ করাবেন মমতাজের কবরের জন্য।

৯। শাজাহান ছিলেন নিষ্ঠুর, কঠোরহৃদয় এবং কৃপণ। কাজেই তাঁর শিল্পীর কোমলচিত্ত বা উদার লোকের ব্যয়প্রবণতা ছিলোনা, যা দিয়ে একটি মৃতদেহের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করে প্রাসাদ নির্মাণ করানো যায়।

১০। বাবর যদি ভারতে সমাহিত হতে চাইতেন, তবে তাজমহল খুব সম্ভবত তাঁরই অনুগত পুত্র হুমায়ুন কর্তৃক নির্মিত স্মৃতিসৌধ বলে আখ্যাত হতো। বাবরের মৃত্যুও হয় এই প্রাসাদে।

১১। শাজাহানের অপর পত্নী শাহারান্দি বেগমের মৃত্যু মমতাজের আগে হলে আমরা হয়তো শুনতাম যে, শাহারান্দি বেগমের প্রতি অত্যধিক আসক্তির জন্য শাজাহান এই সৌধটি বানিয়েছিলেন, যেমনটি আমরা শুনি মমতাজকে নিয়ে।

১২। সভাসদ-লেখক মোল্লা আবদুল হামিদ কোন স্থপতির উল্লেখ করেননি এবং কাজ নির্বাহের খরচ অনুমান করেছেন মাত্র ৪০ লক্ষ টাকা, যা স্পষ্টতই দেখায় যে, কোন নতুন সৌধ নির্মিত হয়নি।

১৩। যাঁর রাজত্বকাল ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যাত হয়ে থাকে, সেই শাজাহান এক টুকরো প্রামাণিক কাগজও রেখে যাননি তাজমহল নির্মাণের ব্যাপারে। এই নির্মাণের নির্দেশ সম্বলিত কোন প্রামাণিক হুকুমনামা নেই, জমিটি ক্রয় বা দখলের জন্য কোন চিঠি পত্রের উল্লেখ নেই, কোন নক্সার অঙ্কন নেই, কোন বিল বা রসিদ নেই আর নেই ব্যয়ের কোন তালিকা। এই প্রসঙ্গে কিছু নথির অবশ্য উল্লেখ করা হয় কিন্তু আগেই দেখানো হয়েছে যে, সেগুলি জাল।

১৪। শাজাহান যদি সত্যি তাজমহল নির্মাণ করে থাকেন তবে এই নির্মাণ প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ সরকারী ইতিহাসে না তোলার নির্দেশ দেবার তাঁর কোন কারণ ছিলো না। কোন শাসকের পক্ষে তাজের মতো জমকালো সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণের কৃতিত্ব কখনোই বেতনভুক্ লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো না।

সুড়ঙ্গ পথ কেবল একটি প্রাসাদেই সম্ভব। মাটির নীচে দিয়ে পলায়ন পথের কোন্ প্রয়োজন মৃতদেহের থাকতে পারে না।

২২। পশ্চাৎভাগে নৌকা ভেড়ানোর জায়গার অস্তিত্ব প্রাসাদেরই সূচনা দেয়, কবরের নয়।

২৩। কেন্দ্রীয় মর্মর সৌধেও আছে ২৬টি কক্ষ, যা প্রাসাদের উপযুক্ত কিন্তু কবরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়।

২৪। তাজের নির্মাণে ব্যবহৃত নক্সা মিলে যায় প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নক্সার সঙ্গে।

২৫। পুরো তাজমহল প্রাসাদে সমুচ্চয়ে আছে ৩৫০ বা তারও অধিক কক্ষ। ঢাকা পথ, মাটির নীচের দুটো তলা এবং অসংখ্য স্তম্ভের মধ্যস্ত এই সমস্ত ঘর সাক্ষ্য দেয় যে, এটি নির্মিত হয়েছিলো প্রাসাদ হিসেবে।

২৬। তাজের সংলগ্ন অনেক সৌধ, প্রহরী ও অতিথিদের কক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, এটা একটা প্রাসাদ। তাজের চত্বরের মধ্যে প্রমোদ শিবিরের উপস্থিতিও কবরে অংশ হিসেবের ভাবা যায় না।

২৭। তাজের অনুষঙ্গে আছে নক্কর খানা বা বাদনের জায়গা। এটি কবরের পক্ষে অপ্রয়োজনই নয়, বেমানানও বটে, কেননা মৃতব্যক্তির আত্মার চাই শান্তি এবং বিশ্রাম। অন্যপক্ষে, প্রাসাদের ক্ষেত্রে বাদনের জায়গা থাকা আবশ্যক কেন না, রাজকীয় আগমন ও প্রস্থান ঘোষণা এবং প্রজাবৃন্দকে রাজকীয় নির্দেশ শোনার জন্য আহ্বানের কাজে এটা ব্যবহৃত হয়।

২৮। এই তাজ অনুষঙ্গে আছে গো-শালা যা সকল হিন্দু রাজপ্রাসাদেই রাখা হতো।

২৯। 'কলস' ও 'প্রাঙ্গী' (গম্বুজের চারপাশে বাঁকানো খোলা জায়গা) এই সংস্কৃত শব্দ দুটি তাজে থাকতো না, যদি মুসলিম কবর হিসেবে এর উদ্ভব হতো।

৩০। তাজমহলের সর্বত্র ব্যবহৃত অলঙ্করণের ছাঁদ ও চিহ্ন শুধু যে পুরোপুরি ভারতীয় তাই নয়, এগুলোতে আছে পদ্মের মতো পবিত্র হিন্দু প্রতীক। এই সমস্ত পৌত্তলিক বৈশিষ্ট্য ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী পরলোকগতা মহিলার (যদি তিনি সত্যিই তাজে সমাহিত থেকে থাকেন) আত্মাকে শান্তি দিতে পারে না।

৩১। তাজের দরদালান' ধনুকাকৃতি খিলান, দেয়ালগিরি এবং গম্বুজের অভ্যন্তরের ছাদ সম্পূর্ণ হিন্দুরীতিতে নির্মিত,যেমনটি দেখা যায় রাজস্থানের সর্বত্র

৩২। তাজ সম্পর্কে অন্যান্য সমস্ত সন্দেহজনক তথ্যের মতো এর নির্মাণ-

১৫। সুদূরতম কল্পনাতেও যে শাজাহান এই ধরণের প্রকল্প নির্মাণের কাজে হাত দিতে সাহস করতেন না তা জানা যায়, যখন বানানো কাহিনীতেও পাই যে, কোন নগদ অর্থ না দিয়ে তিনি সামান্য দৈনিক বরাদ্দের মারফৎ মজুরদের পরিশ্রমে বাধ্য করতেন। Tavernier বলেছেন যে, শাজাহান ভারা বাঁধার কাজের জন্যই যথেষ্ট বাঁশ বা কাঠ যোগাড় করতে করতে সক্ষম হননি। কোন কোন বিবরণীতে উল্লেখিত আছে, শাজাহান রাজা রাজড়াদের বাধ্য করেছিলেন ব্যয়ের এক বিরাট অংশের সংকুলান করতে। কাজেই, একটি হিন্দু প্রাসাদকে মুসলিম কবরে রূপায়িত করার জন্য যে সংযোজন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিলো, তাও করা হয়েছিলো মজুরদের সামান্য দৈনিক খাদ্য বরাদ্দের বিনিময়ে পরিশ্রম করিয়ে এবং সমস্ত-রাজাদের ওপর কর বসিয়ে।

১৬। যদি মহিষীর সমাধির জন্য তাজের মত এক বিরাট প্রাসাদ নির্মিত হয়ে থাকে, তবে একটা উৎসবের মধ্য দিয়ে সমাহিত করানোর কাজটা হতো এবং তার সঠিক তারিখও অলিখিত থাকতো না। কিন্তু শুধু যে এই সমাহিত করার তারিখটির উল্লেখ নেই তা নয়, মোটামুটি মৃত্যুর কতটা সময় পরে আর্জুমন্দ বানু বেগম তাজমহলে সমাহিত হয়েছিলেন, তাও উল্লেখিত হয় ছয় মাস থেকে নয় বছর পর্যন্ত বিভিন্নভাবে।

১৭। মমতাজের বিয়ে হয়েছিলো শাজাহানের ২১ বছর বয়েসের সময়। তাঁর সময়ে রাজপরিবারের সন্তানদের আরো অনেক আগেই বিয়ে হয়ে যেতো। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মমতাজের পূর্বেও শাজাহান অনেক বিয়ে করেছিলেন। কাজেই বিশেষ কোন সৌধে মমতাজকে সমাহিত করার কোন কারণ ছিলো না।

১৮। জন্মসূত্রে সাধারণ নাগরিক মমতাজের বিশেষ সৌধে সমাধির দাবীর প্রশ্ন উঠে না।

১৯। ইতিহাসে কোন উল্লেখ নেই শাজাহান ও মমতাজের মধ্যে কোন অসাধারণ আসক্তি বা প্রেমানুরাগের কথার, যেমনটি আছে জাহাঙ্গীর ও নূর-জাহানের ক্ষেত্রে। এতে প্রমাণ হয় যে, তাঁর মৃতদেহের ওপরে তাজ নির্মাণের কল্পকথায় স্বপক্ষে তাঁদের এই ভালোবাসার কাহিনী বানানো হয়েছে।

২০। শাজাহান কলাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক হলে তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিসৌধের কাজে নিযুক্ত কারিগরদের হাত কেটে ফেলার মতো হৃদয়হীন হতেন না। বিশেষ করে স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকতপ্ত কোন কলানুরাগী ব্যক্তি দক্ষ কারিগরদের পঙ্গু করার বীভৎসতায় লিপ্ত হতে পারেন না। কিন্তু এই পঙ্গু করার কাহিনী মনে হয় সত্যি কেন না, সামান্য দৈনিক বরাদ্দের বিনিময়ে তাঁদের অধিপতির কাছ থেকে আত্মসাৎ করা প্রাসাদে নির্ভরভাবে পরিশ্রম করতে বাধ্য মজদুরেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলো।

২১। জরুরী প্রয়োজনে নির্গমনের জন্য তাজ থেকে আগ্রা দুর্গে যাবার

কাল নানাভাবে উল্লেখিত আছে ১০, ১২, ১৩, ১৭ বা ২২ বছর হিসেবে, যা আবার প্রমাণিত করে যে, প্রচলিত কাহিনীটি কাল্পনিক।

৩৩। Tavernier তাঁর সাক্ষ্যে অবশ্য বলছেন যে, তিনি এই প্রাসাদটির নির্মাণের আরম্ভ ও শেষ স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর উক্তি প্রচলিত কাহিনীকে দুর্বল করে আমাদের বক্তব্যকেই জোরদার করে। Tavernier প্রথম ভারতে এসেছিলেন ১৬৪৩ সালে মমতাজের মৃত্যুর ১১ বছর পর। তাঁর বক্তব্য যদি বিশ্বাস করতে হয়, আর্জুমন্দ বানুর মৃত্যুর এগার বছর পরও তাজমহল নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়নি। কাজেই তাঁর বক্তব্য প্রচলিত কাহিনীর খণ্ডনেই সাহায্য করে। আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে, জয়সিংহের পৈতৃক প্রাসাদটি জোর করে দখল করে আর্জুমন্দ বানুর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁকে এখানে সমাহিত করা হয়। যেহেতু Tavernier এর ভারতে আগমনের ১১ বছর আগে মমতাজকে সমাহিত করা হয়েছিলো একটি তৈরী প্রাসাদে, Tavernier একেই উল্লেখ করেছেন তাঁর কবর হিসেবে। তারপর ভারতে তাঁর উপস্থিতির সময় (১৬৪৩-১৬৪৮) যখন ভারা বাঁধা ও কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা হয়, তিনি তাকেই বলছেন তাঁর উপস্থিতিতে কাজটা শুরু ও শেষ হয়। কাজেই আমরা Tavernier এর বক্তব্যকে পুরোপুরি গ্রহণ করে আমাদের আহরিত প্রমাণের মধ্যে একটা সম্মানজনক জায়গা দেই। Tavernier এর আরেকটা যে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি, সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয় তা হচ্ছে, ভারা বাঁধার খরচ পুরো কাজটার খরচের চাইতে বেশী পড়েছিলো। ভারা বাঁধার খরচ পুরো কাজটার খরচের চাইতে বেশী হতে পারে, যদি একটা সমুন্নত প্রাসাদের খুবই উঁচুতে কিছু কাজের জন্য প্রকাণ্ড ভারা বাঁধার প্রয়োজন হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শাজাহান একটা তৈরী করা প্রাসাদ দখল করার পর যা করেছিলেন তা হচ্ছে কোরানের লিপি উৎকীর্ণ করা, আর প্রাসাদের নীচের প্রকোষ্ঠে মৃতদেহটি কবরস্থ করে তার উপরের তলায় ময়ুর সিংহাসনের প্রকোষ্ঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ মাত্র।

৩৪। শাজাহান যে রাজারাজড়াদের ওপর প্রচুর কর ধার্য করেছিলেন আর প্রাসাদের বিকৃতির কাজটা ধীরগতিতে চলেছিলো ১০, ১২, ১৩, ১৭ এমনকি ২২ বছর ধরে, তা খুবই সত্যি। আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে এটা পুরোপুরি খাপ খায়, যেহেতু শাজাহান তাঁর রাজকোষ থেকে এক কপর্দক ব্যয় না করার মতো তীক্ষ্ণধী ও কঠিনমস্তিষ্ক ছিলেন। সাধারণ মানুষের ওপর উৎপীড়ন ও কর ধার্য করার কোন সুযোগই তিনি ছাড়তেন না। এমন কি তাঁর পত্নীর মৃত্যুকেও সুবিধা আদায় করার কাজে লাগিয়েছেন। একদিকে তিনি রাজারাজড়াদের

বাধ্য করেছেন তাঁদেরই একজনের সম্পত্তি ঐ প্রাসাদের কবরে পরিবর্ত্তনের জন্য অর্থের যোগান দিতে, অন্যদিকে মজদুর ও কারিগরদের বাধ্য করেছেন সামান্য দৈনিক বরাদ্দের বিনিময়ে ক্লান্ত পরিশ্রম করতে। ফলে কাজটা শম্বূকগতিতে চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে।

৩৫। এই প্রাসাদের নক্সাকারীদের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলছেন মুসলিম বলে, আবার ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর নথিপত্রে আছে কিছু হিন্দু নাম। প্রচলিত তাজ ইতিকথার সর্বৈব মিথ্যা সম্পর্কে এর চাইতে বড় আর কি প্রমাণ দরকার?

৩৬। তাজমহলে ছিলো একটা প্রকাণ্ড উদ্যান। সুস্বাদু ফল ও সৌরভ যুক্ত ফুলগাছ কখনো কবরের গর্বের ব্যাপার হতে পারে না, কেননা, কবরের বাগানের ফল ও ফুল আস্বাদের কল্পনা করাটাও উদ্ভট। কাজেই, এই বাগানটা প্রাসাদেরই অংশ ছিলো মনে করতে হবে।

৩৭। তাছাড়া, এর গাছগুলোর ছিলো সংস্কৃত নাম, আর এগুলো ছিলো বাছাই করা পবিত্র গাছ। যেমন, কেতকী, জুঁই, চম্পা, মৌলশ্রী, হরশৃঙ্গার এবং বেল।

৩৮। ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর নথিপত্রে হিন্দু নামের উল্লেখ থাকা ছাড়াও তাজের নকসাকারীদের ইউরোপীয় বা মুসলিম বলে উল্লেখ করার প্রথাগত দাবী খণ্ডন করার পক্ষে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আছে। লক্ষ্য করতে হবে যে, পশ্চিমী পণ্ডিতদের মধ্যে দুটো দল আছে। একদল তাজের নক্সার নির্মাণ কৃতিত্ব দিচ্ছেন একজন ফরাসী Austin de Bordeauxকে। অন্যদলের মতে এই কৃতিত্ব হচ্ছে Geronimo Veronimo নামে এক ইতালীয়ের। মুসলিম শিবিরেও বিভ্রান্তি কম নয়। একদলের মতে Essa Effendi নামে এক তুর্কী বা রুমী বা পার্শী এই নক্সা বানিয়েছিলেন। অন্যদলের মতে আহমদ মাহান্দীস, শাজাহান নিজে বা অন্য কেউ এই নক্সা বানিয়েছিলেন!

৩৯। কোন খরচ হওয়া দূরে থাক, তাজ দেখা দিয়েছিলো শাজাহানের কাছে লোক-গাথার সোনার ডিম-পাড়া মুরগীর মতো। প্রচলিত কাহিনীতে আমরা জানি যে, তাজে ছিলো মুক্তো খচিত মর্মরের পর্দা, সোনার গরাদ আর রূপোর দরজা। শাজাহানের নিজের বা তাঁর সমাহিত পত্নীর বাসস্থানেও তাঁদের জীবিতকালে এই ধরণের ব্যয়বহুল আসবাব ছিলোনা। এটা ইঙ্গিত করা অবাস্তব যে, আর্জুমন্দ বানুর সঙ্গে এই ধরণের আসবাব আকাশ ফুঁড়ে হাজির হয়ে ছিলো। অথচ এই আসবাবের অস্তিত্বের কাহিনী নির্ভেজাল সত্যি। এতে আমাদের বক্তব্যই সমর্থিত হয় যে, তীক্ষ্ণধী শাজাহান স্ত্রীর

মৃত্যুকে ওজর হিসেবে ব্যবহার করে জয়সিংহকে তার পৈতৃক প্রাসাদ থেকে উচ্ছেদ করেন। আর্জুমন্দ বানুকে একটা নিরলঙ্কার ঠাণ্ডা পাথরের প্রকোষ্ঠে সমাহিত করে প্রাসাদের সমস্ত মূল্যবান অলঙ্করণ খুলে নিয়ে শাজাহানের কোষাগারে জমা করা হয়। শুধু এই সব অলঙ্করণেরই নয়, এই ঝলমলে 'পরি-পার্শ্বিকের কেন্দ্রমণি ময়ূর সিংহাসনেরও অনুরূপ দশা হয়েছিলো। উজ্জ্বল ময়ূর সিংহাসন ছাড়া রূপোর দরজা এবং সোনার গরাদ সজ্জিত মুক্তোখচিত মর্মরের জাফরি দিয়ে ঘেরা জায়গায় আর অন্য কিই বা থাকতে পারে? বর্তমানে বিলুপ্ত ময়ূর সিংহাসনের মণিমুক্তো পরবর্তীকালে খুলে নেওয়া হয় ঠিক এই কারণে যে, খণ্ডখণ্ড করে লুণ্ঠন করা ছাড়া এই 'পৌত্তলিক' সিংহাসনের কোন প্রয়োজনীয়তা মুসলিমদের ছিলো না। শাজাহান যদি এইটি নির্মাণ করাতেন, তবে তা এইভাবে ভেঙে ফেলা হতো না। শাজাহান এই ময়ূর সিংহাসন নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারেন না, কেন না এই ধরণের মূর্ত্তি নির্মাণের বিরুদ্ধে ইসলামে বিশেষ নিষেধ আছে। কাজেই একে মুঘল উত্তরাধিকারের সম্পত্তি হিসাবে ধারণা করা ভুল। হিন্দু ময়ূর সিংহাসনটি সম্ভবত ছিলো চন্দ্রগুপ্তের বা বিক্রমাদিত্যের, যিনি বিক্রম সংবতের প্রবর্তন করেন।

৪০। যে দুটি যুগ্ম নগরীর মধ্যে তাজ প্রাসাদ অবস্থিত, সেই খাসপুরা ও জয়সিংহপুরা রাজপুত নাম, মুসলিম নয়। সংস্কৃতে 'পুরা' শব্দে বোঝায় একটা ব্যস্ত জনপদ, প্রচলিত কাহিনীর এক খণ্ড উন্মুক্ত জমি নয়।

৪১। তাজের প্রবেশ পথগুলো হচ্ছে দক্ষিণ মুখো, মুসলিম প্রাসাদ হলে এগুলো সব পশ্চিমমুখো হতো।

৪২। তাজের অলঙ্করণ ও মর্মর পাথরের কাজের মিল আছে ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত আমের (জয়পুর) প্রাসাদের অনুরূপ কাজের সাথে।

৪৩। তাজের মুখ্য লাল পাথরের সীমানা-প্রাচীরের বাইরে আরো অনেক সৌধ আছে, সভাসদ ও প্রাসাদের কর্মচারীদের বসবাসের জন্য।

৪৪। আকবর আগ্রায় তার প্রথম দিককার পরিভ্রমণের সময় খাসপুরা ও জয়সিংহপুরাতে থাকতেন, যা স্পষ্টই দেখাচ্ছে যে, তিনি তাজেই থাকতেন। তাজের সৌন্দর্য সত্ত্বেও তিনি এখানে বাস করতে পারেন নি; কেন না, এর সুরক্ষার প্রাচীরগুলো পরপর আক্রমণে অনেক শিথিল হয়ে পড়েছিল। নিজের পুত্র থেকে শুরু করে সবার কাছেই তীব্র ঘৃণার পাত্র আকবর একটা অরক্ষিত প্রাসাদে বাস করার ঝুঁকি নিতে পারেন নি।

৪৫। শাজাহানের সময় আরেক বিদেশী পর্যটক Bernier বলছেন যে, নীচের প্রকোষ্ঠদ্বয় বছরে মাত্র একবার খুলে দেওয়া হতো। তাদের নাকি একটা বিরল সৌন্দর্য ছিলো এবং কোনো অমুসলিমকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি

দেওয়া হত না। এতেই বোঝা যাচ্ছে, ঐ কক্ষদুটি সম্পর্কে কিরূপ গোপনীয়তা রক্ষা করা হতো। এটা দুঃখের যে, সরকার অথবা ইতিহাসের পণ্ডিতরা তাজের নীচের প্রকোষ্ঠগুলো খুলে জঞ্জাল পরিষ্কার করে, আলোর ব্যবস্থা করে, সিঁড়ি এবং ঘরগুলোর বন্ধন দূর করে ইতিহাসের পাঠক এমনকি সাধারণ দর্শকদেরও ঐ প্রাসাদে অবাধ বিচরণের সুযোগ দেবার আগ্রহ দেখান না। এতে সরকারের বেশ কিছু টাকা রোজগার হবে প্রবেশমূল্য হিসেবে; আর গবেষক, সাধারণ দর্শক, বাস্তুকার এবং স্থপতিরা লাভবান হবেন এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ সমুচ্চয়ের নীচের ঘরগুলো দেখার সুযোগ পেয়ে। গবেষণার প্রথম শ্রেণীর মালমশলা এখানেই আছে, কিছু লুকোনো ধনরত্ন ও থাকতে পারে, কে জানে। কাজেই, তাজের এই কক্ষগুলো খুলে দিয়ে সবাইকে যদি দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাতে সরকার এবং সাধারণ লোক উভয়েই উপকৃত হবেন।

এই ধরণের অসংখ্য যুক্তি আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে রাখা যেতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি যে, পাঠককে বোঝাবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ আমরা উপস্থিত করেছি।

বুরহানপুরের কবর থেকে তাঁর মৃতা স্ত্রীর দেহ সরিয়ে নিয়ে শাজাহান যে অন্যায় করেছেন, তার সংশোধন করা যায়, যদি আর্জুমন্দ বানুর দেহাবিশেষ, তাজমলে সত্যিই তা থেকে থাকলে, বুরহানপুরে এখনো বর্তমান তাঁর কবরে অনুরূপভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শাজাহানের দেহাবশেষও তাঁর স্ত্রীর কবরে বা তার পাশে সমাহিত হওয়া উচিত, কেননা সমস্ত বিবরণী মতে তিনি তাঁর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন। ন্যায়বিচারের খাতিরে, তাজ প্রাসাদকে তার পর ঐ স্মৃতিস্তম্ভ ও শূন্য কবরের হাত থেকে মুক্ত করা উচিত।

ষড়বিংশ অধ্যায়

কিছু ব্যাখ্যা

বইটি পাঠ করার পর, তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথা যে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় একথা বুঝেও পাঠকের মনে কিছুটা সন্দেহ রয়ে যায়। তাঁদের লেখা অজস্র চিঠি ও বিভিন্ন সময়ে তাঁদের উত্থাপিত নানা প্রশ্ন থেকেই এটি স্পষ্ট হয়।

শাজাহান ইতিকথার অলীকত্ব অত্যন্ত বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার পরও এই সন্দেহের অস্তিত্ব ছবির মত বুঝিয়ে দেয় যে, শতশত বছর ধরে চালিয়ে আসা মিথ্যে সারা পৃথিবীর মানুষের যুক্তিবুদ্ধিকে খুবই গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই, পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা তাদের উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের আলোচনা এই অধ্যায়ে রাখছি।

প্রশ্ন: প্রচলিত শাজাহান-ইতিকথার বিভিন্ন অসঙ্গতি আপনি দেখালেও তাজমহল যে প্রাক্‌মুসলিম যুগের হিন্দুরাজার নির্মিত, আপনার এই বক্তব্যের সপক্ষে কোন জোরালো প্রমাণ রাখতে পারেননি কেন ?

উত্তর: ওপরের প্রশ্নে এমন অনেক ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, যা সঠিক নয়। প্রথমত, পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলোতে বেশ কিছু জোরালো প্রমাণ রাখা হয়েছে। যেমন, শাজাহানের নিজস্ব সভালিপি বাদশানামা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, রাজা মানসিংহের নামাঙ্কিত প্রাসাদটি তাঁর পুত্র জয়সিংহের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিলো মমতাজের সমাধির জন্য। Tavernier এর উক্তিও উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে যে 'তাসিমকান' অর্থাৎ 'তাজ' নামে পরিচিত প্রাসাদটি আগে থেকেই একটি পৃথিবীখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র থাকায়, শাজাহান এটিকে মমতাজের কবরের উপযুক্ত হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তৃতীয় জোরালো প্রমাণ হচ্ছে সংস্কৃত শিলালিপিটি, যাতে বোঝা যায় যে, পূর্বে তেজ-মহা-আলয় নামে খ্যাত মন্দিরটিই তাজমহল নামে পরে প্রসিদ্ধ হয়েছে। চতুর্থ জোরালো প্রমাণসমূহের মধ্যে আছে তাজমহলের শীর্ষস্থ ত্রিশূল, এর উদ্যানে 'বেল' প্রভৃতি পবিত্র বৃক্ষের উপস্থিতির উল্লেখ এবং সমাধিকক্ষের চারপাশের মর্মর পর্দায় পবিত্র 'ওম্' শব্দ ফুটিয়ে পুষ্পাকৃত নক্সার কারুকার্য। পঞ্চম জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় আওরঙ্গজেবের চিঠিতে। তাছাড়া, নঞর্থক প্রমাণ যে যথেষ্ট নয়, এই ধারণাও কিন্তু ভুল। আদালতে প্রতিদিন খুনী ও প্রতারকদের দণ্ডাদেশ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে দেওয়া হচ্ছে এই তথাকথিত নঞর্থক প্রমাণের ভিত্তিতেই। অপরাধ

সংঘটনের বহু দিন বা বছর পর ঘটনার বিশদ বিবরণ থেকেই অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা ও দণ্ড দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, জীর্ণ পোষাকের কোন ব্যক্তির কোন দামী হীরা বিক্রির চেষ্টার কথাটাই ধরা যাক। ব্যাপারটির আপ্রান্ত-অসঙ্গতিতেই যে কোন নাগরিক এই বিক্রয়েচ্ছুকে আটক করে চুরি বা প্রতারণার অভিযোগ আনবেন। কারণ, হয় ঐ লোকটির ভিক্ষুকের পরিচ্ছদ ছদ্মবেশ মাত্র, অথবা হীরেটি নকল, নয়তো লোকটি বেআইনি ভাবে হীরেটির মালিকানা হস্তগত করেছে। এইক্ষেত্রে, লোকটিকে স্বচক্ষে চুরি করতে না দেখলেও সন্দেহবশে তাকে আটক করা থেকে কেউ নিবৃত্ত হবেন না। কাজেই, সাধারণ লোক যা ভুল করে নঞর্থক প্রমাণ বলে ভাবে, তা প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন সকল ব্যাপারে গ্রাহ্য জোরালো প্রমাণ বই কিছু নয়। আরেকটি সূত্র মনে রাখা দরকার। তাজমহলের নির্মাতা হিসাবে শাজাহানের কৃতিত্বের দাবী যখন মিথ্যে বলে বোঝা যায়, ভারতের অবস্থিত ঐ সৌধটির নির্মাণ কৃতিত্ব স্বতই হিন্দুদের ওপর বর্ত্তায়।

প্রশ্ন: তাজমহলের হিন্দু উৎপত্তির ধারাবাহিক সঠিক ইতিহাস আপনি রাখেন নি কেন?

উত্তর: এর কারণ হচ্ছে, তাজমহল সম্পর্কে যতটা গবেষণা হওয়া দরকার তা এখনো হয়নি। তা করতে গেলে গবেষকের পক্ষে তাজপ্রাসাদের সমস্ত কক্ষের চাবি এবং অভ্যন্তরের সমস্ত স্থান খুঁজে দেবার মত অর্থ ও ক্ষমতা থাকা চাই। মাটির নীচের যে সমস্ত কক্ষ শাজাহান ইঁট ও চুন দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছিলেন তা খুলে বিশদভাবে অনুসন্ধান চালানো উচিত। অমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্ত বদ্ধ ঘরের মধ্যেই আছে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসার অকাট্য প্রমাণ। এগুলোতে সংস্কৃত লিপি, হিন্দু দেবমূর্তি, ধর্মগ্রন্থ বা বিভিন্ন মুদ্রা থাকতে পারে, যাতে আমরা প্রাসাদটির শাজাহানের পূর্ববর্ত্তী ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে পারি। তাজ-প্রাসাদের পরিমণ্ডলে বহুতল কূপটিরও জল নিষ্কাষণ করে এই ধরণের সাক্ষ্যের জন্যে অনুসন্ধান চালানো উচিত। এ পর্যন্ত আমরা যেটুকু প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি তা হচ্ছে, তাজমহল স্পষ্টতই শাজাহানের জবর দখল করা একটি অকৃত্রিম হিন্দু প্রাসাদ। প্রকৃতপক্ষে কোন হিন্দু শাসক কি উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন' তা আরো বিশদভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে খুঁজে বের করা উচিত।

প্রশ্ন: শাজাহান যখন এই প্রাসাদটিকে তাঁর স্ত্রীর কবর হিসাবেই পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন তখন তিনি এর ত্রিশূল শীর্ষটির উৎপাটন বা অভ্যন্তরের অন্যান্য হিন্দু চিত্রের অপসারণ ঘটান নি কেন?

উত্তর: তাজমহলকে নিজের সৃষ্টি হিসেবে দেখানোর কোন অভিসন্ধি

শাজাহানের ছিলোনা কেননা, তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন যে, প্রাসাদটি জয়সিংহের হাত থেকে নেওয়া হয়েছিলো। তাছাড়া, প্রাসাদটিকে নিজের নির্মিত বলে মিথ্যে দাবী জানানোর ইচ্ছে শাজাহানের থাকলেও এটির বাস্তবায়ন ছিলো অসম্ভব। কেননা, শাজাহানের সমসাময়িক ব্যক্তিরাই জয়সিংহের কাছ থেকে প্রাসাদটি দখল করে অভ্যন্তরে মমতাজের সমাধি নির্মাণের কাজে জড়িত ছিলেন। হিন্দুচিহ্নের প্রতি অসহিষ্ণু মুসলিম ঘৃণার বশবর্তী হয়ে শাজাহান হয়তো ত্রিশূল শীর্ষটি উৎপাটনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তা করলে গম্বুজে দেখা দিতো এক বিরাট ফাটল, যাতে বর্ষাকালে সমগ্র প্রাসাদটিপ্লাবিত হয়ে যেতো। উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে এই ধরণের কাজে প্রবৃত্ত না হওয়ার মতো বিচক্ষণতা অবশ্য শাহজাহান ও তাঁর সভাসদদের ছিলো। ত্রিশূল শীর্ষটি উৎপাদন করলে যে ফাটল দেখা দিতো তা মেরামতির জ্ঞান তদানীন্তন মুসলিমদের ছিলো না। গম্বুজটির কেন্দ্র থেকে তিরিশ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত এই ত্রিশূল শীর্ষের প্রসার। এতোটা উচ্চতায়, সোজাভাবে রাখার জন্য ঐ শীর্ষের নিম্নাংশের অনেকটা গম্বুজের অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত রাখতে হয়েছিলো। তাই, গম্বুজের ক্ষতি না করে সমূলে ত্রিশূলটির উৎপাদন করাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

প্রশ্ন : শীর্ষদণ্ডটি কি মুসলিম অর্দ্ধচন্দ্রের দ্যোতক নয়?

উত্তর : শীর্ষদণ্ডটি মুসলিম অর্দ্ধচন্দ্র নয়। মুসলিম অর্দ্ধচন্দ্র কখনো আড়াআড়ি থাকে না। সম্মুখের তারকার জন্য কিছুটা উন্মুক্তি ছাডা এই অর্দ্ধচন্দ্র প্রায় সমগ্রভাবেই একটি বৃত্ত। আরেকটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে, কেন্দ্র থেকে বহির্গত কোন কেন্দ্রীয় দণ্ডই এই অর্দ্ধচন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে নি। তাজমহলের গম্বুজের শীর্ষদণ্ডটি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু চিহ্নের দ্যোতক কেননা, এখানে অর্দ্ধবৃত্তের আকারের একটি আড়াআড়ি রাখা ধাতুদণ্ডকে কেন্দ্রীয় দণ্ডটি দ্বিখণ্ডিত করেছে। এই শীর্ষের পুরো মাপের একটি নক্সা তাজমহলের পূর্বদিকের লালপাথরের চত্বরে খোদিত আছে। এটি ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখলে গম্বুজের ওপরের শীর্ষদণ্ডটির আকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে গোলাকার দণ্ডটির শেষাংশ হিন্দু কলসের আকৃতি পেয়েছে। এর দুদিকে বেরিয়ে এসেছে দুটি পাতা যার ওপর রয়েছে হিন্দুদের পবিত্র নারিকেল। হিমালয়ের পাদদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরে এই ধরণের শীর্ষদণ্ড দেখা যায়।

প্রশ্ন : গম্বুজের ওপরের এই শীর্ষদণ্ডটি কি বিদ্যুৎ পরিবাহক হিসাবে ইংরেজদের দ্বারা নির্মিত হয় নি?

উত্তর : সাধারণ্যে প্রচলিত অনেক ভুল ধারণার এটি অন্যতম। প্রাচীন হিন্দুদের দ্বারা গম্বুজের ওপরে নির্মিত এই শীর্ষদণ্ডটি হয়তো উঁচু মানের বিদ্যুৎ পরিবাহক হতে পারে, কিন্তু ইংরেজরা এটি নির্মাণ করেন নি।

প্রশ্ন : আল্লাহো আকবর (ঈশ্বর মহান) এই কথাগুলো কি ফার্সীতে শীর্ষদণ্ডটির ওপর খোদিত নেই ?

উত্তর : তাতে কি হয়েছে ? তাজমহল এবং এর পরিমণ্ডলের অন্যান্য প্রাসাদ জবরদখলের পর শাজাহান সর্বত্র ফার্সী খোদাই করিয়েছিলেন। তাই, শীর্ষদণ্ডে কিছু ফার্সী খোদাই থাকলেও এতে প্রমাণ হয়না যে, 'শাজাহানই তাজমহলের নির্মাতা। অন্যপক্ষে, এই ওপর খোদাইতেই প্রমাণ হয় যে, শাজাহান প্রাসাদটি আত্মসাৎ করেছিলেন। কারণ, লালপাথরের চত্বরে খোদিত শীর্ষদণ্ডটির পুরোমাপের নক্সাতে এই 'আল্লাহো আকবর' কথাগুলো নেই। শাজাহান তাজের প্রকৃত নির্মাতাহলে গম্বুজের শীর্ষদণ্ডের ওপরে খোদিত লিপি চত্বরে খোদিত নক্সার মধ্যেও পাওয়া যেতো।

প্রশ্ন : শাজাহান যে তাজের নির্মাতা—এই কল্পকথা কে প্রথম চালু করেন ?

উত্তর : কল্পকথাটি প্রথম চালু করেন পরবর্তীকালের কোন সংকীর্ণমনা মুসলিম সভা বিদূষক। শাজাহান তাঁর স্ত্রীকে একটি পুরাতন জবরদখল করা হিন্দু প্রাসাদে সমাহিত করেছেন এটি স্বীকার করা তাঁরা অপমানজনক মনে করতেন। বার বার উচ্চারিত হওয়ার জন্যই লোকে পরে এই কল্পকথায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তাছাড়া, এই কল্পকথার উৎপত্তি হয়তো সাধারণ মানসের একটি ভ্রান্ত ধারণা থেকে। সমস্ত মধ্যযুগীয় হিন্দু প্রাসাদেই মুসলিম কবরের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এই সব প্রাসাদের আদি পর্যটকেরা প্রাসাদগুলিকে অভ্যন্তরে কবরস্থ মৃত ব্যক্তির নামে নামাঙ্কিত করে গেছেন। কালের প্রবাহে ঐ প্রাসাদগুলিকে কবরের জন্য নির্মিত বলে ভুল ধারণা করে আসা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাসাদগুলির অস্তিত্ব ছিলো আগে থেকেই। অভ্যন্তরস্থ মুসলিম কবর হচ্ছে দখল করা হিন্দু প্রাসাদে পরবর্তীকালের সংযোজন। অনেক ক্ষেত্রেই কবরগুলো ভূয়ো। একটি প্রহরীও না রেখে ইসলামের নামে চিরতরে প্রাসাদগুলোর দখল রাখার উদ্দেশ্যেই ভ্রান্ত ধারণার পরিপোষক এই ত্রিভুজাকৃতি কবরের স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিলো। জাল ধর্মীয় চিহ্নেরও বিঘ্ন উৎপাদনে হিন্দু অনীহার এই জ্ঞানের সম্যক ব্যবহার করেছিলেন মধ্যযুগীয় মুসলিমরা। এমন কি, এযুগেও, রাতারাতি জাল কবর নির্মাণ করিয়ে খালি জমি বা প্রাসাদের দখল দাবী করার এই প্রিয় প্রথা দেখা যায়।

প্রশ্ন : গবেষণা দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত পশ্চিমী পর্যটকেরা কেন তাজ নির্মাণে শাজাহান ইতিকথার অলীকত্বে নিঃসন্দিগ্ধ নন ?

উত্তর : এই বিশ্বাসটি ভুল যে, সাধারণ পশ্চিমী পর্যটকের জ্ঞানতৃষা বা সত্যি উদ্‌ঘাটনের আগ্রহ একজন সাধারণ ভারতীয় অপেক্ষা অনেক বেশী। অন্য যে কোন লোকের মতোই সাহেবেরাও অনেকেই অন্তঃসার শূন্য। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক

দেশের সাধারণ একজন দর্শক হিসেবে তিনি ভারতের কোন প্রাসাদের মালিকানা বিতর্কিত কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছুক নন। পশ্চিমী পর্যটকের একমাত্র আগ্রহ হচ্ছে প্রাসাদটি স্বচক্ষে দেখা। তাছাড়া, দেহজ প্রেমের কাহিনীর লঘুমর্মিতা তাঁকে আপ্লুত করে তোলে সহজেই। পশ্চিমী দর্শক ভাবতে পারেন না যে, নারীর প্রতি দেহজ ভালবাসা খুব একটা উঁচুস্তরের হতে পারে না। এতে সৃজনমূলক কাজের প্রেরণাও অনুপস্থিত। পশ্চিমী দেশের দর্শকের সময় বা আগ্রহ দুটোই কম থাকে। তাই তিনি কোন প্রাসাদ দেখে এর মালিকানার বির্তর্কে জড়াতে চান না। তাছাড়া, এই ধরণের দর্শকেরা প্রায়ই চালিত হন সরকারী ভাষ্যের সাহয্যে। ফলে, তাঁরা বিরোধী মত সমূহকে চমকসৃষ্টির সস্তা প্রচেষ্টা বলে ভেবে নেন। কিছু পশ্চিমী পর্যটক অবশ্য তাজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা খুঁটিয়ে দেখে চিঠিতে তা জানিয়েছেন।

প্রশ্ন : ইতিহাসের শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা কেন তাজমহল সম্পর্কে আপনার মতবাদ মেনে নেন নি ?

উত্তর : বেশ কিছু ইতিহাসের শিক্ষক ও অধ্যাপক তাজমহলের হিন্দু উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যে সম্পূর্ন আস্থা জানিয়েছেন। চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এবং তাঁদের পুস্তক, প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ও বক্তৃতায় আমাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা আমাদের মতেরই পুষ্টি জুগিয়েছেন। প্রকাশ্যে যাঁরা আমাদের মতবাদের সমর্থন জানান নি, তাঁদের অনেকই হয়তো লাজুক স্বভাবের অথবা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যেতে সাহস পান নি। এ ছাড়াও হয়তো তাঁদেব উপরওলা-ভীতি রয়েছে। অন্যথায়, তাঁরা হয়তো কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদের গোঁড়া পৃষ্ঠপোষক বলে হিন্দুদের কৃতিত্ব উদ্‌ঘাটনকারী গবেষণায় উৎসাহ হারিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাসের কিছু উঁচু মহলের অধ্যাপক ও সরকারের পর্যটন, পুরাতত্ব ও সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ তাজ সম্পর্কে শাজাহান-ইতিকথার অন্তঃসার শূন্যতা স্বীকার করতে ভয় পান কেন না, এতে তাঁদের বৃত্তির দিক দিয়ে অসুবিধায় পডতে হয়। সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন চাকুরীজীবি হিসেবে তাঁরা কেবলমাত্র সরকারী ভাষ্যেরই পরিপোষণ ও প্রচার করেন, নয় তো নীরবতাই পছন্দ করেন। সাধারণ মানুষ শান্তিতে দৈনন্দিন কাজে লিপ্তথাকতে চান, এমন কি সত্যি প্রতিষ্ঠার দাবীতে কোন বিক্ষোভে তাঁরা নিজেদের জড়াতে চান না। সরকারীভাবে আমাদের ভাষ্য গৃহীত হলে তাঁরা অনৌৎসক্যের সঙ্গেই তা মেনে নেবেন।

মুসলিমদের এক বিরাট অংশের সাধারণ ঝোঁক হচ্ছে তাজ সম্পর্কে নতুন আবিষ্কার অস্বীকার করা। অনেকেই আমাদের আবিষ্কারকে তাঁদের সম্প্রদায়ের

সম্মানহানিকর মনে করেন। কেউ কেউ আবার এই আবিষ্কার ধামা চাপা দেবার চেষ্টায় ব্রতী হন।

বিশ্বের জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন সংস্থা যথা লণ্ডনের School of Oriental and African Studies, সিমলার The Institute of Advanced Studies, লণ্ডনের Royal Asiatic society এবং প্রত্ন তত্ত্ব ওসংগ্রহশালার উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাজ সম্পর্কে আমাদের গবেষণার ফলকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁদের সমগ্র কর্মজীবনে তাজ সম্পর্কে শাজাহান-ইতিকথার মতো একটি অলীক মতবাদের পুষ্টি ও প্রচারের লজ্জাই তাঁদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং অনুরূপ সংস্থায় তাঁদের সমকক্ষ ব্যক্তিরা শাজাহান ইতিকথার ওপর অনেক বই ও প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন এবং ছাত্রদেরও এ নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভে সাহায্য করেছেন। তাঁরা যে একটি ভিত্তিহীন ধারণা এযাবৎ পোষণ ও প্রচার করে এসেছেন, একথা স্বীকারের মতো সহৃদয়তা বা সততা তাঁদের অনেকেরই নেই।

মনুষ্য চরিত্রের দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত এইসব বিভিন্ন কারণেই অধ্যাপক ও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আমলা প্রভৃতিরা তাজ প্রসঙ্গে আমাদের আবিষ্কারের ব্যাপারে চোখ, কান বন্ধ করে বসে আছেন।

প্রশ্ন : শিবাজী প্রমুখ শাসকেরা তাজমহল পুনর্দখল করেননি কেন ? এটি হিন্দু প্রাসাদ হলে তাঁদের তা অজানা থাকার কথা নয়।

উত্তর : প্রশ্নটির উদ্ভব কতগুলো ভ্রান্তধারণা থেকে। ভারতের সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাসাদ ও বিরাট দুর্গের অভাব ছিলো না। তাজমহলের মত সৌন্দর্যশালী শত শত প্রাসাদ ভারতে ছিলো। মুসলিম ঐতিহাসিকেরা তার কিছু নিজেরাই উল্লেখ করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বিস্ময়ে হতবাক মুসলিম ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, বিদিশা ও মথুরায় এমন সব আড়ম্বরপূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাসাদ ও মন্দির ছিলো, পাঁচ হাজার শ্রমিক দুশো বছরেও যা নির্মাণ করে উঠতে পারতো না। তাই, মনে করা ভুল যে, তাজই ছিলো ভারতের একমাত্র সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাসাদ আর কেবল এটিকে বিদেশী মুসলিমের দখল মুক্ত করার জন্য প্রত্যেক ভারতীয়ের জীবন পণ করা উচিত ছিলো। সুন্দর উত্তরের আটক থেকে সুদূর দক্ষিণের আর্কট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সমস্ত প্রাসাদ, মন্দির ও দুর্গ মুসলিম দখলে থাকাকালে কেবলমাত্র তাজকে রক্ষা করার ঔচিত্যের দাবী জানানো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আর, যেহেতু হিন্দুরা তাজমহল সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তাই প্রাসাদটি হিন্দুর হতে পারে না—এই প্রচ্ছন্ন ধারণাটিও ভুল। শিবাজীর মতো স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধা সমগ্র ভারতকেই বিদেশী আক্রমণকারীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো সিন্ধু থেকে কন্যা-

কুমারিকা পর্যন্ত ভূভাগের সমস্ত প্রাসাদ ও অঞ্চলের কর্তৃত্ব ও দখল পাওয়া। তাছাড়া, শিবাজীর মতো শাসকের সমগ্র মুঘল শক্তিকে উৎখাত করার মতো ক্ষমতা ছিলো না। মুঘল রাজত্ব ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বজায় থাকা থেকেই এ কথার সত্যতা বোঝা যায়।

প্রশ্ন: তাজমহলের যদি মানসিংহের মঞ্জিল হিসেবে পরিচিত থেকে থাকে, তবে জয়পুর রাজসভার কাগজপত্রে তার কিছু ইঙ্গিত থাকা উচিত নয় কি?

উত্তর: অবশ্যই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পুঁথিখানা নামে পরিচিত জয়পুর রাজকীয় সংগ্রহশালা শাসকের নিজস্ব কর্তৃত্বে রয়েছে এবং বাস্তবে কেউই এই নথিগুলি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পান নি। কারণ সম্ভবত এই যে, সমসাময়িক রাজপুত সমাজে তীব্র ঘৃণার পাত্র বিদেশী মুঘলদের সাথে অন্তরঙ্গতার বিবরণ হয়তো নথিগুলোতে আছে। এই ধরনের প্রমাণ কিভাবে গোপন করা হয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে, আকবর কর্তৃক লুন্ঠিতা জয়পুরের তিন রাজকন্যার নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে, রাজসভার কাগজপত্রে হয়তো রাজপরিবারের গর্বের সম্পত্তি এই তাজমহলের জবরদখল পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। এগুলো খুঁটিয়ে দেখে সত্যিকারের ইতিহাস খুঁজে নিতে হলে এমনকি তীক্ষ্ণবুদ্ধি গবেষকেরও উদ্ভাবনীপ্রতিভার প্রয়োজন। সমসাময়িক কিছু তথাকথিত ঐতিহাসিকের সাথে সাক্ষ্য বা পত্রালাপের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাঁরা পুঁথিখানার তাজ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখেছেন বলে দাবী জানান। তাঁরা নাকি এমন একটুকরো দলিল খুঁজে পেয়েছেন, যাতে লেখা আছে জয়সিংহ আগ্রায় একখণ্ড উন্মুক্ত জমি শাজাহানকে বিক্রী করেছেন তাজমহল নির্মাণের জন্য। আগ্রায় বহুবছর ধরে ইতিহাসের অধ্যাপক Dr. A. L. Srivastava এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ হয়েছে। দলিলে ক্রয়মূল্যের কি উল্লেখ আছে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, কোন নির্দিষ্ট মূল্যের কথা বলা নেই। একটি ধোঁয়াটে নথির ওপর এই করুণ নির্ভরতা থেকেই তাঁদের বৃত্তিগত দক্ষতার নমুনা পাওয়া যায়। ক্রয়মূল্যের উল্লেখবিহীন বিক্রয় কোবালার কথা বলা আর ডেনমার্কের যুবরাজ নন এমন হ্যামলেটের কথা বলা একই পর্যায়ের। ইঙ্গ-মুসলিম ঝোঁক থাকার দরুণ এরা এই জটিল বিষয়েও কোন ফলপ্রসূ গবেষণা রাখতে পারেন নি। আইনে যে দক্ষতা থাকলে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিতর থেকে আলাদা করে নেওয়া যায় অথবা প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা যে যুক্তিজ্ঞানের সাহায্যে লুপ্ত সূত্র আবিষ্কার করা যায়, তার কোনটিই এই ধরণের গবেষকদের নেই। মুঘলদের সঙ্গে জয়সিংহের আদান প্রদানের সমস্ত কাগজপত্র, বিশেষ করে ১৬২৮ খৃঃ থেকে ১৬৩২ খৃঃ পর্যন্ত সমস্ত নথি খুঁটিয়ে দেখলে তাজমহল প্রাসাদটি জবর দখলের উল্লেখের কিছু সূত্র পাওয়া যাবে।

জয়পুরের প্রাক্তন রাজা এবং বিকানীরের Rajasthan state Archives এর Director মহোদয় লেখককে জানিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে কোন বিক্রয় কোবালার অস্তিত্ব তাঁদের জানা নেই। এও সম্ভব হতে পারে যে, জয়পুরের শাসকেরা তাজমহলের নির্মাতা নন। জয় ক্রয়, বদল, দান বা যৌতুক হিসাবে হয়তো এটি তাঁদের অধিকারে আসে।

প্রশ্ন : সুষমামণ্ডিত তাজমহল যদি হিন্দু প্রাসাদই হয়, তবে আগেকার লেখায় এর উল্লেখ নেই কেন ?

উত্তর : শাজাহানই যে তাজমহল নির্মাণ করিয়েছেন, এই ধারণাটি ঐতিহাসিক ও সাধারণ লোকের মনে এতটা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থেকে তাঁদের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছে যে, তারা তাজমহল সম্পর্কে আগেকার কোন উল্লেখ খুঁজে পান নি। এরপর তাঁরা যদি খোলামনে তাঁদের অধীত মূলগ্রন্থগুলি আবার পড়েন, তাঁরা তাজমহল সম্পর্কে বেশ কিছু পূর্বেকার উল্লেখ পাবেন। এই পুস্তকেই আমরা দেখিয়েছি যে, শাজাহানের অতিবৃদ্ধ পিতামহ বাবরের লেখাতেও তাজমহলের উল্লেখ আছে এবং প্রকৃতপক্ষে বাবর এই প্রাসাদেই মৃত্যু বরণ করেন। আরও দেখানো হয়েছে যে, বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমের লেখাতেও এই প্রাসাদের উল্লেখ আছে। পূর্বেকার অন্যান্য সমস্ত নথি ও বিবরণী এভাবে বিবেচনা সহকারে খুঁটিয়ে দেখলে অনুরূপ আরো অসংখ্য উল্লেখের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, রাজত্ববদলের আগে রাস্তাঘাট ও জনপদের নাম পরিবর্তনের কথা মনে রাখলে, বর্তমানে আমরা যা তাজমহল বলে জানি, তার একাধিক ভিন্ন নামকরণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে, কোন শহরে বেশ কিছু সৌন্দর্যমণ্ডিত বিরাট প্রাসাদ থাকলে তদানীন্তন লেখায় এদের প্রত্যেকটিকে আলাদা করে দেখানোর জন্য বিশদ বর্ণনা রাখা কঠিন। প্রত্যেকটি প্রাসাদ সম্পর্কেই বিরাট, বর্ণাঢ্য, সৌন্দর্যশালী প্রভৃতি বিশেষ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে, মুসলিম আক্রমণ ও হত্যালীলার ডামাডোলে তাজের মতো প্রাসাদের কর্তৃত্ব হাতবদল হয় অবিরত। কখনো মন্দির কখনো বা প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহৃত এই সৌধের অধিক বিবরণ রাখাও হয় দুঃসাধ্য।

প্রশ্ন : তাজমহলের শেষ হিন্দু মালিক কোন বিবরণী রেখে যাননি বা তাঁর দাবী আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন নি কেন ?

উত্তর : মুহম্মদ-বিন-কাসিম থেকে শুরু করে হাজার বছরের মুসলিম আক্রমণে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের সমস্ত দুর্গ মন্দির প্রাসাদ, বিপনী, উদ্যান এবং খামারের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হিন্দুদের অধস্তন পুরুষেরা বর্তমান কালে তাঁদের দাবী নিয়ে কেন উপস্থিত হন নি, তা বুঝলেই আমরা

প্রশ্নটির উত্তর পাবো। দেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যখন বিদেশী আক্রমণকারীর দখলে আসে, প্রজারা তখন যুদ্ধের অথবা হত্যাকাণ্ডের বলি হয়। শত্রুরা অধিকৃত প্রাসাদসমূহ দখল করে রাখে দীর্ঘকাল ধরে। পরবর্ত্তী কোন যুগে অধস্তন বংশধরদের এসবের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া হবে এই আশায় কি কোন উৎসাদিত মালিক ও তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা ঐ সব সম্পত্তির প্রবেশমুখে অনিশ্চিতকাল ধরে অপেক্ষা করতে পারেন? মহামারী, গণহত্যা দাঙ্গা, ভূমিকম্প বা জীবিকার প্রয়োজনে সমাজের সামগ্রিক জীবনধারা পালটে যায় এবং আজন্ম পরিচিত পরিবেশ থেকে শতশত লোক ছিটকে বেরিয়ে আসে। সমগ্র পরিবারও কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কখনো পরিবার বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে বংশের আদিপুরুষের নামও অধস্তন পুরুষদের মন থেকে মুছে যায়। হাজার বছর ধরে এমন ব্যাপার বারবার ঘটতে থাকা সত্বেও কারো পক্ষে কি পূর্বেকার দলিলপত্র অটুটভাবে রক্ষা করা সম্ভব? হারিয়ে যাওয়া, চুরি হওয়া, পুড়ে যাওয়া, ইঁদুর প্রভৃতির খোরাক হওয়া বা জলে ডুবে নষ্ট হওয়া; এই হচ্ছে পুরাতন নথির স্বাভাবিক পরিণতি।

প্রশ্ন : আপনাদের বক্তব্য কি এই যে, শাজাহান একটি পূর্বতন হিন্দু প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলে তার মালমশলা দিয়ে বর্তমান তাজমহল বানিয়েছিলেন?

উত্তর : অবশ্যই না। বইটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠককে বোঝানো যে, বর্তমানে সাধারণের চোখে তাজমহল যেরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে, অবিকল সেই আকৃতিতেই শাজাহান প্রাসাদটি জবরদখল করে নিয়েছিলেন। বাহ্যিক যা কিছু পরিবর্তনই তিনি করুন না কেন, তা প্রাসাদটির সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে। এর আকৃতি অথবা সৌন্দর্য সুষমায় কোন সংযোজন শাজাহান করান নি। আদি হিন্দু তাজমহলের সৌন্দর্য ছিলো আরো গভীর মুক্তার মতো সাদা এর দেয়াল এখন কালো ক্ষুদে হরফের খোদাইয়ে মলিন হয়ে গিয়েছে। আদি হিন্দু মন্দির প্রাসাদ সমুচ্চয়ে ছিলো আরো অনেক আনুষঙ্গিক শিবির ও প্রাসাদ। চারদিকের ছড়ানো ধ্বংসস্তূপে তার সাক্ষ্য রয়ে গিয়েছে। বর্তমানে যে তাজমহল আমরা দেখি তা একটি খণ্ডিত, কালিমালিপ্ত সৌধ। মর্মরের ভিত্তি থেকে যমুনার সমতলে ভূগর্ভের বিভিন্ন তলা এখনো অবহেলিত ও লুক্কায়িত অবস্থায় বুজিয়ে রাখা হয়েছে। ভূগর্ভের এই সমস্ত কক্ষের দেয়ালে যে সব সুদৃশ্য নক্সা কাটা আছে তাকেও মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশ্ন : তাজমহলকে মুসলিম কবর হিসেবে দেখা আর একে হিন্দু মন্দির প্রাসাদ হিসেবে দেখা, বাস্তবে এর ফলে কি পার্থক্য এসে যায়?

উত্তর : অনেক কিছুই এসে যায়। প্রথমত, মুসলিম কবর দেখতে ইচ্ছুকেরা সমাধিকক্ষে একবার উঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসেই মনে করেন যে, তাঁদের কাজ

সম্পন্ন হয়েছে। ফলে তাজ-প্রাসাদ ও এর পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্য ও বিরাটত্ব সম্পর্কে তাঁরা অনবহিত থেকে যান। তাছাড়া, তাজের মতো বিরাট আকারের একটি পরম সুন্দর প্রাসাদে প্রবেশ করলে যে যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন উদয় হওয়া উচিত, তাও মনে তেমন সাড়া জাগায় না। আবার কেউ তাজের প্রকৃত স্বরূপ জেনে যদি এই প্রাসাদে যান, তিনি হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে যাবেন। বেশ যত্ন নিয়েই এর বারান্দা, সিঁড়ি, হল, ঝোলানো বারান্দা, ভূগর্ভকক্ষ, গ্যালারী, চত্বর প্রবেশপথ, আস্তাবল, বহিরঙ্গের সৌধসমূহ ইত্যাদি দেখে এর বিরাটত্বের অনুভব পাবেন। তাজ প্রাসাদের পর্যটকেরা এরপর কেবল যে যথেষ্ট সময় নিয়ে এর আনাচকানাচ ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখবেন তাই নয়, এর সীমার বাইরের চারপাশ ঘুরে যে সমস্ত লাল পাথরের সৌধের ভগ্নাবশেষ পরিবেষ্টনকারী দেয়ালের ঠিক বাইরেই রয়েছে, তাও খুঁজে নেবেন। জনগণ যদি তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, বহুতল বিশিষ্ট তাজমহলের বুজিয়ে দেওয়া সমস্ত কক্ষ তাঁদের সম্মুখে উন্মুক্ত করতে সরকার বাধ্য হবেন। প্রবেশমূল্য আদায় করে সরকারের কেবলমাত্র সমাধিকক্ষ পর্যন্তই দর্শকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। এপর্যন্ত, সরকার ও জনগণ ভুল করে বিশ্বাস করে এসেছেন যে, তাজমহল একটি সমাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সমাধিকক্ষ পর্যন্ত জনতার প্রবেশ সীমাবদ্ধ রাখা হয়তো ভুল হয়নি। কিন্তু অতঃপর সরকার ও জনগণের সচেতনভাবে তাজ মন্দির প্রাসাদের অস্তিত্বের মূল্যায়ন করা উচিত।

প্রশ্ন : শাজাহান যদি একটি হিন্দু মন্দির প্রাসাদ জবরদখল করে কবরে রূপান্তরিত করেই যাবেন, সেখানেই ব্যাপারটির ইতি না টেনে অতীতকে খোঁড়া-খুঁড়ি করার যৌক্তিকতা কি?

উত্তর : প্রশ্নের মধ্যেই অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমত, বিদেশীর অধিকারভুক্ত দেশের অধিবাসী যেমন যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে উৎসুক হবেন, তেমনি জবরদখল হওয়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্রাসাদেরও আদি ইতিহাস জেনে এর সঠিক ব্যবহার প্রচলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, তাজ প্রাসাদকে হিন্দু মন্দির প্রাসাদ হিসেবে না দেখে মুসলিম কবর হিসাবে দেখলে এর পরিসর সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। তৃতীয় বিবেচ্য হচ্ছে যে, প্রকৃত সত্য যেখানে গুজবের কুয়াশায় আবৃত থাকে, তেমন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গবেষণা নিরন্তর চালিয়ে যেতে হবে। তাজমহলও এর ব্যতিক্রম নয়। চতুর্থত, একমাত্র অতীতের কথাই ইতিহাসের মুখ্য বিবেচ্য। তাই, অতীতকে ঘাটানো হচ্ছে কেন, ঐতিহাসিকের কাছে এই প্রশ্ন করা একান্তই উদ্ভট। ইতিহাসকে যদি, জনগণের জীবনে অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হতো, তবে আইনের সাহায্যেই এর চর্চা বন্ধ হয়ে যেতো। পৃথিবীর কোন দেশেই

ইতিহাস নিষিদ্ধ না হওয়ায় বোঝা যায় যে, জনগণ মিথ্যার নির্মোক থেকে সত্যিকে খুঁজে বার করার জন্য অবিরত ঐতিহাসিক গবেষণায় উৎসাহী।

প্রশ্ন : তাজমহল সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য আপনি আবিষ্কার করেছেন, বিগত কয়েকশো বছর ধরে ঐতিহাসিকেরা তা করতে পারেন নি কেন ?

উত্তর : কারণ, পূর্বসূরীদের প্রতি সরল বিশ্বাস তাঁদের গবেষণা প্রবণতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তাঁরা চলে আসা কাহিনীগুলোকে অযৌক্তিক গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত সন্দেহের কণ্ঠরোধ করে রেখেছেন। তাজ নির্মাণের খরচ, নির্মাণের সময়, নক্সা কারকের নাম, তাজে উৎকীর্ণ বিভিন্ন লিপিতে শাজাহানের দাবীর অনুপস্থিতি, মমতাজের মৃত্যু ও সমাধির তারিখ সম্পর্কে নীরবতা প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জাজ্বল্যমান অসঙ্গতিকে তাঁরা এলেবেলে ব্যাখ্যা দিয়ে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁরা তাজমহল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি।

প্রশ্ন : আপনার আগে ইতিহাসের অনেক দিকপাল তাজমহল সম্পর্কে গবেষণা চালিয়েছেন। নতুন আর কি তথ্য আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ?

উত্তর : পূর্ববর্ত্তী গবেষকেরা খাপছাড়া ভাবে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁরা প্রাসঙ্গিক অসঙ্গতি এবং এর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন নি। আমরা কোন বিশেষ তথ্য হাজির করেছি, এমন দাবী রাখছি না। পুলিশের কর্মচারীর মতোই আমাদের ভূমিকা। অজ্ঞাতসূত্রে কোন অপরাধ সম্পর্কে খবর পেয়ে তিনি কেবল নোটবই এবং পেন্সিল সম্বল করেই অকুস্থলে যান। তদন্ত চলাকালেই অপরাধে বিভিন্ন প্রমাণ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তাঁকে বাড়ী থেকে এই সমস্ত প্রমাণ বয়ে নিয়ে যেতে হয় না। অনুরূপভাবে, মমতাজ যখন আমাদের জন্মের প্রায় '২৮৭' বছর আগে মারা গিয়েছেন এবং তাজ সম্বন্ধে যা বলার সবই আগ্রা থেকে টিম্বাকটু পর্যন্ত ছড়ানো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, নতুন কি তথ্য আমার পক্ষে হাজির করা সম্ভব ? আমার জন্মের প্রায় '২৮৭' বছর পূর্বে মমতাজের মৃত্যু হয়েছিলো বলছি এই জন্য যে, আমার জন্মের সঠিক তারিখ লিপিবদ্ধ থাকলেও তাজ প্রসাদের অধিষ্ঠাত্রী বলে প্রচারিত'মমতাজের মৃত্যুর সঠিক তারিখ ঐতিহাসিকের অজানা। আমার সমস্ত প্রচলিত সাক্ষ্য আহরণ ও প্রণালীবদ্ধভাবে এগুলোকে সাজিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। সমস্ত উপস্থিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণ বা এর জবরদখল করা, কোন মতবাদটা সঠিক মনে হয়, পাঠকের বিচারের ওপর তা ছেড়ে দেওয়াই আমার প্রয়াসের লক্ষ্য। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই যে, সমস্ত প্রচলিত সাক্ষ্য পুনরায় আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয় চাতুরী করে পাশ কাটিয়ে গিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে, নয়তো নির্বোধের মত

অবহেলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তাজমহল সম্পর্কে Tavernier এর মন্তব্য এবং খুবই খাপছাড়াভাবে ব্যবহৃত হয়ে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। বাদশানামার স্বীকারোক্তি হয় ভুলে যাওয়া হয়েছে নয়তো চাপা দেওয়া হয়েছে। বাদশানামা দু-তিনবার পড়েছেন এমন একজন বয়স্ক বিদগ্ধ ব্যক্তি আমার কাছে অকপটে স্বীকার করেছেন যে, এর প্রথম খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠায় শাজাহান কর্তৃক এই হিন্দু প্রাসাদ জবরদখলের স্বীকারোক্তি তাঁর নজর বরাবর এড়িয়ে গিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম ঐতিহাসিকের সাক্ষ্যও আমি পেয়েছি, যাঁরা এই পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনগড়া কিছু অর্থহীন প্রলাপোক্তি করে ব্যাপারটা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। এর দ্বারাই বোঝা যায়, ভারতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু লোক ইতিহাসকে অতীতের ঘটনার সত্যি বিবরণ হিসেবে না দেখে তাঁদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপোষণের হাতিয়ার হিসেবেই দেখতে চান। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে আমি বহু প্রতিনিধির হাতে তাজমহলকে হিন্দু প্রাসাদ বলে বাদশানামার স্বীকারোক্তি চার লাইন মুদ্রিত লিপি বিতরণ করি। তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিলো খুবই আশ্চর্যজনক এবং দুঃখদায়কও বটে। তাঁরা প্রশংসার কোন বাক্য বা অগ্রাহ্যের কোন উল্লেখ না করে কয়েকবার চোখের পাতা ফেলেই কর্তব্য সমাধা করলেন। আমার মনে হয় যে, তাঁদের এরূপ নির্বাক থাকার পিছনে অতিরিক্ত কারণ ছিলো। কোন প্রতিষ্ঠান বা ইতিহাস বিভাগের প্রধান হিসেবে তাঁদের খুব সুনাম। সমগ্র কর্মজীবনে তাঁরা যা শিখিয়েছেন বা বিশ্বাস করে এসেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাজমহলকে জবরদখল করা হিন্দু প্রাসাদ হিসেবে স্বীকার করা তাঁদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। এই ঘটনা থেকে আমার প্রত্যয় হলো যে, উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেও অধিকাংশ লোকেই চলে আসা মিথ্যাকেই অবলম্বন করে থাকতে চাইবেন সত্যের পোষকতা না করে, যদি সেই নগ্ন সত্য তাঁদের বিন্দুমাত্রও অসুবিধার কারণ হয়ে থাকে। তাই প্রকৃত সত্যের প্রচার ও শিক্ষাদান এই তথাকথিত পণ্ডিতদের রুচিকর হয় নি। অহংকারই ছিলো তাঁদের একমাত্র বিবেচ্য।

প্রশ্ন : যদিও বাদশানামায় স্বীকার করা আছে যে, মমতাজের সমাধির জন্য একটি হিন্দু প্রাসাদ জবরদখল করা হয়েছিলো, তথাপি শেষের দিকের দুই ছত্রে কি জ্যামিতিকদের ডাকা ও ভিত্তি স্থাপনের কথা বলা হয়নি ?

উত্তর : অতি সূক্ষ্ম মিথ্যের ভেজাল থেকে সত্যিকে আলাদা করার কৃতিত্বই প্রকৃত গবেষকের মাপকাঠি। বাদশানামার পরিচ্ছেদেই লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, একটি প্রাসাদ দখল করে তাতে মমতাজকে সমাহিত করার পুরো ঘটনা মাত্র ছ' লাইনের বর্ণনাতেই আবদ্ধ আছে। এই অর্থব্যঞ্জক তথ্যই প্রকৃত গবেষককে

বোঝাতে সক্ষম হবে যে, ঢক্কানিনাদে প্রচারিত একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণের কাহিনী সম্পূর্ণ অলীক। আরেকটি সূত্রেও লক্ষ্য করতে হবে যে, ঐ পরিচ্ছেদে প্রথমে সমাধির কথা বলা হয়েছে, পরে রাজমিস্ত্রী ও জ্যামিতিবিদদের ডাকানোর কথা বলা হয়েছে। দখলীকৃত প্রাসাদের বিভিন্ন উচ্চতায় দেয়ালে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ করানোর জন্য এঁদের প্রয়োজন হয়েছিলো। একতলার অষ্টকোণ কক্ষে একটি ও ঠিক তার নীচের তলার কক্ষে আরেকটি'মোট দুটি কবর খননের কাজেও এদের লাগানো হয়েছিলো। আরেকটি তথ্যও ভেবে দেখতে হবে যে, বেশ কিছু সংখ্যক মধ্যযুগীয় মুসলিম কাহিনীকার, ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে' এই ধরণের বাক্যাংশ বারবার ব্যবহার করেছেন। এভাবে তাঁরা কিছুটা নির্লজ্জ ও ধোঁয়াটেভাবে দখল করা বিভিন্ন হিন্দু প্রাসাদের নির্মাণ কৃতিত্ব তাঁদের মুসলিম পৃষ্টপোষকদের দিতে চেয়েছেন। বিবেককে কিছুটা শান্ত রাখার জন্য আরো স্পষ্টভাবে এই মিথ্যে কৃতিত্ব জাহির করা তাঁরা দক্ষতার সাথে এড়িয়ে গেছেন, পাছে তাঁদের সমসাময়িকদের কেউ নিজের পৃষ্টপোষকের প্রতি এই অন্যায় কৃতিত্ব অর্পণের জালিয়াতি ধরে ফেলেন। ঐতিহাসিকদের জানা আবশ্যক যে, ঐ মুসলিম কাহিনীকারেরা কোন নির্দিষ্ট সুলতান বা সভাসদের নির্দিষ্ট কিছু নির্মাণের স্পষ্ট উল্লেখ থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁরা কেবল ভিত্তি স্থাপন করেছেন', ইত্যাদি ধোঁয়াটে বাক্যাংশই ব্যবহার করেছেন। কাজেই, বাদশানামায় ব্যবহৃত ঐ বাক্যাংশে একটি মিথ্যে দাবীই রাখা হয়েছে বুঝতে হবে কেন না, লেখক তাঁর প্রভু শাজাহান যে ঘৃণিত পৌত্তলিক হিন্দুর একটি প্রাসাদ জবরদখল করে তাতে মমতাজকে সমাহিত করেন, এই তথ্যের পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছেন। এই ব্যাপারে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ইতিহাস গবেষণায় আমার পূর্বসূরীরা অত্যন্ত সরলবিশ্বাসী প্রমাণিত হয়েছেন। তাঁরা মুসলিম কাহিনীকারদের দ্বারা কুউদ্দেশ্যে বহু ব্যবহৃত এই 'ভিত্তি স্থাপন' বাক্যাংশের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁদের মুসলিম প্রভুরা সত্যিই কোন কবর, মসজিদ, দুর্গ, খাল, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করে থাকলে এই লেখকেরা প্রাসঙ্গিক নক্সা, খরচের হিসাব, নির্দেশের অনুলিপিও এই ধরণের অন্যান্য নথির অবশ্যই উল্লেখ রাখতেন। মাত্র ছয় ছত্রে পুরো প্রকল্পটির বর্ণনা না সেরে তাঁরা হয়তো একটি দুর্গ নির্মাণ বা নগর স্থাপনের বর্ণনায় একটি গোটা বই-ই লিখে ফেলতেন।

প্রশ্ন : আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, মমতাজের প্রতি শাজাহানের ভালোবাসাই তাজমহল নির্মাণের যথেষ্ট প্রেরণা ?

উত্তর : এই প্রশ্নের জবাব নানা দিক দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমার বা অন্যের বিশ্বাসের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রত্যেক দাবীর সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকা দরকার। মমতাজের প্রতি শাজাহানের আসক্তির কাহিনীই অলীক।

জনসাধারণকে যেটুকু ইতিহাসে পড়ানো হয় তাতে দেখি যে, একমাত্র যে মুঘল সম্রাটের পত্নীর প্রতি অত্যধিক অনুরাগের কথা লেখা আছে, তা হচ্ছে নূরজাহানের প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রেম। শাজাহানের মমতাজের প্রতি স্বর্গীয় ভালোবাসা ছিলো বলে যাঁরা দাবী করেন, তাঁদের উচিত উদাহরণ দিয়ে দেখানো যে, এই আসক্তির জন্য সম্রাট প্রায়ই রাজকার্যে অবহেলা করতেন। যেহেতু এরকম কোন প্রমাণই নেই বা রোমিও জুলিয়েটের মতো শাজাহান মমতাজের ভালোবাসা নিয়ে কোন প্রামাণ্য পুস্তকও নেই, মমতাজের প্রতি শাজাহানের অত্যধিক আসক্তির কথা বিশ্বাস করলে ভুল হবে। অবশ্যই বুঝতে হবে যে, নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা একটু নীচুস্তরের অনুভূতি। যৌন প্রেরণায় দেহের তাগিদের ভালোবাসায় নারীর প্রতি যে আসক্তি জন্মে, তা উঁচুস্তরের কোন সৃজনশীল প্রেরণার সহায় হয় না। ঈশ্বর, নিজের দেশ, মাতা বা সন্তানের প্রতি ভালোবাসার মত উচ্চতর কোন অনুভূতিই মহৎ কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা দেয়। নারীর প্রতি যৌনতাসঞ্জাত ভালোবাসা লোককে ধর্ষণ, হত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি কুকর্মের দিকেই ঠেলে নিয়ে যায়। মমতাজের প্রতি শাজাহানের ভালোবাসাতেই তাজমহলের সৃষ্টি, একথা বলাটা অবাস্তব, কেননা, নারী পুরুষের এই তথাকথিত ভালোবাসার একমাত্র ফসল, হয় পুত্র নয় কন্যা, প্রাসাদ কখনোই নয়। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা যাচাই করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ আপনার মতে তাজমহলকে জড়িয়ে শাজাহান ইতিকথার মতো প্রকাণ্ড অসত্য চালানোর জন্য দায়ী কে বা কারা ?

উত্তরঃ কোন ভিত্তি না থাকা স্বত্বেও এই প্রকাণ্ড মিথ্যে গড়ে তোলার দায়িত্ব সমানভাবেই মধ্যযুগীয় মুসলিম এবং মুসলিম সমর্থক সংকীর্ণমনা রাজসভার চাটুকারদের ওপর বর্তায়। বিশদ প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে শোনা কথার ওপর অযৌক্তিক বিশ্বাস ন্যস্ত করে নিজের কাজে অবহেলা দেখানো তথাকথিত ঐতিহাসিক ও গবেষকরাও এজন্য দায়ী। এছাড়া কিছু পদ্য লেখক কবিত্বশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের কল্পনাকে অবাধে বিচরণ করতে দিয়ে, যৌনতাগিদকে স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত করে সমান দায়ীত্বের অংশভাক্ হয়েছেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

আমলাতান্ত্রিক গা বাঁচানো

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের পর এমন কিছু ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যা থেকে সারা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবি মহলে তাজমহল সমস্যার পাশ কাটানোর চেষ্টা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

আগ্রার প্রায় ৩৬ মাইল দূরবর্তী কোন স্থানে একটি তৈল শোধনাগার স্থাপনে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কিছু তীব্র প্রতিবাদ শোনা গেছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, প্রস্তাবিত শোধনাগারের ক্ষয়কারী ধোঁয়া তাজমহলের মর্মরকে কলুষিত ও ক্রমে বিনষ্ট করবে।

এই সম্ভাবিত ক্ষতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদকারীরা, শাজাহানের অন্তত পাঁচশো বছর আগে তাজের অস্তিত্বের প্রমাণ করা আমাদের গবেষণা সম্পর্কে অজ্ঞতার ভান করেন। কেননা প্রতিটি সংবাদপত্রেই এই শোধনাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রবন্ধে একঘেঁয়ে ভাবে তাজমহলকে শাজাহানের কীর্তি বলেই চালানো হয়েছে। অর্থাৎ, তাজমহলের বাহ্যিক সৌন্দর্যের কলুষের সম্ভাবনায় যাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার, গত তিনশো বছর ধরে তাজের ইতিহাসে চাপানো কলঙ্কের প্রতি তাঁরা উদাসীন। মনে হয় যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও সরকারের নিযুক্ত ঐতিহাসিকেরা শাজাহানের পূর্বে তাজমহলের ইতিহাসকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে দেবার এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। কারণ, কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের সোচ্চার প্রতিবাদের মুখে সরকার যখন সম্ভাব্য কলুষের তদন্তের ব্যাপারে একটি সমিতি গঠন করেছেন, সেক্ষেত্রে তাজমহল যে সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবর নয় বরং একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ, ১৯৬৫ সালে আমাদের এই আবিষ্কার প্রকাশিত হবার পরও সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

এমন কি, এই তদন্ত সমিতির সদস্যরাও, বশংবদের মতো সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দূষণের প্রতিই তাঁদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও জনসংযোগ কর্তারাও এই ষড়যন্ত্রের অংশভাক্। কেননা, সম্ভাব্য দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকদের দীর্ঘ পত্রের জন্য তাঁরা তাঁদের কাগজ প্রায় খোলাই রেখেছিলেন। কিন্তু, তাজের প্রকৃত ইতিহাস কলুষিত করার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমস্ত চিঠি তাঁরা চালাকি করে চেপে গিয়েছেন।

নতুন গবেষণার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার অলসতা থেকে কিছুটা উদ্ভূত, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের এই নগ্ন পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বেচ্ছাচারী

আচরণের আরো নানা কারণ থাকতে পারে। স্কুলে যা পড়ে এসেছেন, তা মিথ্যে ভাবাটা তাঁদের পক্ষে কঠিন। শাজাহান-ইতিকথার পৃষ্ঠপোষক কিছু ঐতিহাসিকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার অনীহা বা শাজাহান মমতাজের তথাকথিত প্রেমগাথা ক্রমাগত উদগীরণ করে শস্তায় অর্থ উপার্জনের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতাও এর কারণ হতে পারে।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আমার আট সপ্তাহ ব্যাপী অবস্থান কালে তাজমহলের এই প্রচলিত কালিমালিপ্ত ইতিহাসের প্রতি বৃটিশ সংবাদ মাধ্যমের আগ্রহ জাগরূক করার সকল চেষ্টাই শীতল দৃষ্টিতে প্রতিহত করা হয়েছে। তাঁদের এই ঔদ্ধত্যের পশ্চাতে ওপরের সব কয়টি কারণ তো ছিলোই, উপরন্তু ছিলো আমার মতো একজন হিন্দুর উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের প্রতি তাঁদের সহজাত সুতীব্র ঘৃণা।

সব দিক থেকে কোণঠাসা হয়ে আমার অবস্থা হলো অতীব শোচনীয়। পৃথিবীতে কি নিষ্ঠুরতা, পাপ, স্বেচ্ছাচার ও ভণ্ডামির এতোই প্রাবল্য যে, এতবড একটা আবিষ্কার এবং প্রচণ্ড একটি জালিয়াতি উন্মোচনের এই অক্লান্ত প্রয়াস সাধারণের গোচরে আনার সমস্ত পথই সার্থকভাবে বন্ধ করে দেওয়া যাবে? এই প্রশ্নই আমার মন নিরন্তর জাগরূক রইলো।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাস এলো। ঐ মাসের শেষ দিকে আমার ভারতে ফিরে আসার কথা। ঐ সময় Sunday Times পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁদের কারো সংবাদদাতার বেদনাদায়ক হত্যায় সম্পাদক Harold Evans-এর সতর্কবাণী ছাপা হয়েছিলো। মৃত ব্যক্তির সত্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাকে সম্পাদক অতি উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

এই ঘটনাকে সূত্র হিসেবে নিয়ে আমি Harold-কে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম, সত্যির প্রতি তাঁর যদি এতোই সুতীব্র অনুরাগ থেকে থাকে, তাহলে ১৯৬৫ সাল থেকে তাঁদের 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে পাঠানো আমার সমস্ত চিঠিপত্র তাঁরা চেপে গিয়েছেন কেন? ঐ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ঐস্লামিক উৎসবে এক প্রদর্শনীতে অধিকৃত প্রাসাদগুলোকে মুসলিমদের কীর্তি বলে দেখানো হচ্ছিলো। এর প্রতিবাদে এবং বিশ্বের পর্যটকের আকর্ষণ তাজমহলের যে শাজাহানের পূর্বে অস্তিত্ব ও ইতিহাস আছে, তা জানিয়েই আমি ওসব চিঠি লিখেছিলাম।

চিঠিতে আরো যোগ করেছিলম যে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়া যদি প্রশংসিত হয়ে থাকে, তবে তাজমহলের কেলেঙ্কারি উদঘাটন আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, সারা পৃথিবীতেই এর গুরুত্ব অনুভূত হবে। বাস্তবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, ভ্রমণ সাহিত্য রচয়িতা, পরিদর্শক, সাংবাদিক, লেখক, গ্রন্থকার, সবাই যেন একযোগে ষড়যন্ত্র করে তাজের

প্রকৃত পরিচয় উন্মোচনে গড়িমসি করে চলেছেন, যদিও আমার গবেষণায় এটিকে শাজাহানের পূর্ববর্তী কালের শিবমন্দির হিসেবে আমি প্রতিপন্ন করেছি। হয়তো তারা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং তাজের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁদের সমস্ত লেখা ও লেখানো যে অমূলক ও ভিত্তিহীন একথা স্বীকারের লজ্জাই তাঁদের এই নীরবতার কারণ। ১৯৬৭ সালে লণ্ডনে আট মাস অবস্থিতি কালে আমি Royal Asiatic Society, School of Oriental and African Studies, London University, British Museum এবং Victoria and Albert Museum-এর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি যে, সাধারণভাবে মুসলিম স্থাপত্য বিশেষত তাজমহল সম্পর্কে তাঁদের ধারণার আমূল পরিবর্তন দরকার, কিন্তু তাঁরা কেউই চোখের পলক পর্যন্ত নড়ান নি। যতদিন তাঁদের বেতন ও শিক্ষাগত পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাঁরা প্রচলিত মিথ্যাই চালিয়ে গিয়ে সন্তুষ্টি অনুভব করবেন।

লণ্ডন-এর Sunday Times এর Harold Evans-কে আরো কয়েকবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিলো। অবশেষে তিনি তাঁর কাগজের Spectrum শাখার সম্পাদক Peter Watson-কে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। Watson সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ চেয়ে পাঠালেন। আমি তাঁকে The Tajmahal is a temple-palace, ১০৬টি প্রমাণের সারাংশ নিয়ে লেখা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং বেশ কিছু জোরালো ফটো পাঠিয়ে দিলাম।

এরপর ছয় মাস অতিক্রান্ত হলো। লণ্ডনের এক বন্ধু টেলিফোনে Watson-কে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না।

এতেই বোঝা যায় যে, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকেরা তাঁদের লেখায় সর্বজ্ঞতা, ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতা, সততা ও সত্যের প্রতি অনুরাগের মোহ সৃষ্টি করলেও আমাদের সমাজের হীনতম মানুষের মতোই তাঁরাও অবিশ্বাসের যোগ্য।

লণ্ডনের Sunday Times-এর এই ঘটনার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সত্যের প্রতি অনুরাগে সোচ্চার ব্যক্তিদের বাইরের খোলসটুকুতেই ঐ অনুরাগ সীমাবদ্ধ। তাজমহলের হিন্দু উৎপত্তির কথা তাঁদের কাগজে লিখলে কোন শারীরিক, আর্থিক বা আইনগত ঝুঁকি নিতে হবে না, একথা বারবার সম্পাদকের গোচরে আনলেও তিনি সত্য প্রকাশে স্পষ্টতই ভীত ছিলেন। উলঙ্গ সত্যের বোঝা বহন করা বা এর মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাধ্য তাঁর নেই।

ইত্যবসরে, আমাদের আবিষ্কারের সমর্থনে আরো নানা তথ্য হাজির হতে শুরু করেছে। জলন্ত যে দৃষ্টান্তটি সবার চোখ এড়িয়ে গেছে তা হচ্ছে, তাজমহলের ছাদের নীচু প্রাচিরের সর্বাঙ্গে সর্পাকৃতি নক্সা রয়েছে। তাজমহলের উৎপত্তি যে তেজমহালয় নামে এক শিবমন্দির হিসেবে, আমাদের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এইটি।

জাফরির খোদাইয়ের সর্বত্রও এই ক্ষুদ্রাকৃতি সর্পচিহ্ন দেখা যায়। আগ্রা শহরের পুরাতন দিল্লী দরজায় এখনও কুণ্ডলীকৃত সর্পের আকৃতির একটি পদ্ম চিহ্ন দেখা যায়। বোঝা যায় যে, অগ্রকোট অর্থাৎ আগ্রা শৈব উপাসনার একটি প্রাচীন কেন্দ্র ছিলো।

এই অগ্রকোট অর্থাৎ আগ্রায় শিবের উপাসনা অতি প্রাচীনকাল হতেই প্রচলিত ছিলো। মাত্র ৩৬ মাইল দূরবর্তী এর উপনগরী বটেশ্বরে যমুনার তীরে সারিবদ্ধ ১০১টি শিবমন্দির এখনো আছে। এদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই তাজমহল ওরফে তেজ মহালয়ের সাদৃশ্য আছে। তাজমহল দর্শনার্থীদের প্রত্যেকের একই সঙ্গে বটেশ্বরের ঐ মন্দিরগুলো দেখে আসা উচিত, যাতে সাদৃশ্যটি তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারেন।

পুস্তকের অন্য জায়গায় আমরা যে বটেশ্বর লিপির উল্লেখ করেছি তাতে বলা আছে যে, ঐ শ্বেত মর্মরের সৌধের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ভগবান শিব আর তাঁর চিরন্তন আবাস হিমালয়ের কৈলাস পর্বতে ফিরে যেতে চান নি। স্পষ্টই বোঝা যায়, বটেশ্বরে যাঁরা ১০১টি শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদেরই একই নক্সার উজ্জ্বলতম রত্ন এই তেজ মহালয় ওরফে তাজমহলের সৃষ্টি করা। ভারতীয় যোদ্ধার জাত ক্ষত্রিয়দের উপাস্য দেবতা শিবের উদ্দেশ্যে এটি নিবেদিত হয়েছিলো।

তাজমহলের হিন্দু উৎপত্তির সমর্থনসূচক আরেকটি যে তথ্য জানা গেছে তা হচ্ছে, কবরের চারপাশে (যার নীচে সম্ভবত শিবলিঙ্গ রয়ে গেছে) জাফরির ওপরের ঢাকনায় পবিত্র হিন্দু কলসের প্রতিমূর্তি খোদিত রয়েছে। এই কলসের সংখ্যা ঠিক ১০৮, হিন্দুদের পরম পবিত্র আধ্যাত্মিক সংখ্যা। হিন্দু ঐতিহ্যে ৮ এবং ১০৮ সংখ্যাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক দ্যোতনাসূচক। ঈশ্বরের প্রতিনাম বা পবিত্র মন্ত্রও ১০৮ বা তার গুণনীয়ক। হিন্দুর জপমালাতেও রুদ্রাক্ষের সংখ্যা ১০৮।

হিন্দু রাজার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা সাধারণত হতো আটজন। যোগ-সিদ্ধিও আটরকম। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদেরও আটটি বিভাগ। হিন্দুদের মরচে-না-ধরা ধাতুস্তম্ভ ও শীর্ষচূড়াতেও আটটি ধাতুর সংমিশ্রণ ঘটেছে। যে পবিত্র মন্ত্রে হিন্দু নরনারীর বিবাহ হয় তারও আটটি পবিত্র ভাগ। হিন্দু রাজকীয় চিহ্নেও আটটি পবিত্র বস্তুর প্রতিমূর্তি থাকতো। ঈশ্বর এবং রাজার উদ্দেশ্যে নির্মিত সমস্ত নগর, দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মিত হতো অষ্টকোণ করে অথবা অষ্টকোণের সাদৃশ্যে। রাজকীয় মোহরও হতো অষ্টকোণ। একমাত্র হিন্দুদেরই আট দিকের প্রত্যেকটির আলাদা নাম ও অধিপতি নির্দিষ্ট আছে। প্রাচীন হিন্দু সঞ্জীবনী রসায়ন চ্যবন-প্রাশেও আটটি প্রয়োজনীয় উপাদান আছে। হিন্দু সাধুসন্তের দীর্ঘ উপাধিতে ১০৮ বা ১০০৮ সংখ্যাগুলো সংযোজিত হয়। হিন্দু ঐতিহ্যে এই ৮ সংখ্যাটির ওপর আসক্তি ও এর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অগণিত। একই ঐতিহ্যের অনুকরণে

তাজমহলও অষ্টকোণ। মুসলিম কবর হিসেবে তাজমহলের নক্সা করা হয়ে থাকলে এটি কখনো অষ্টকোণ হতো না। কেবল ভারতেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র ঐতিহাসিক সৌধ নির্মাণের মুসলিম কৃতিত্বর দাবীর অসারতা প্রমাণ করতে এই একক প্রমাণই যথেষ্ট।

স্থাপত্যের ইতিহাসের জনৈক মার্কিন অধ্যাপক আমাদের গবেষণা অনুধাবন করে Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় তাজমহলের শিবমন্দির হিসেবে উৎপত্তির বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে ঐ পরিমণ্ডলে বাদন গৃহের অস্তিত্বের উল্লেখ করেন।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই মুঘল-ইতিহাস পারদর্শী অধ্যাপক Grabar প্রথাগত তাজ ইতিকথার সমর্থন করতে গিয়ে আমাদের উদ্‌যাপিত প্রমাণগুলো নড়বড়ে বলে আখ্যা দেন। বাদন গৃহের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তুরস্কের কোন এক মসজিদেও নাকি অনুরূপ বাদন-গৃহ আছে।

অজ্ঞাতসারেই Prof. Grabar স্বরচিত এক ফাঁদে পা দিয়েছেন। তুরস্কের কোন এক মসজিদে যদি বাদন-গৃহ থেকেই থাকে, তাতে আমাদের এই বক্তব্যেরই পুষ্টি হয় যে, সারা পৃথিবী জুড়ে চোখ জুড়ানো সমস্ত মুসলিম মসজিদ ও কবর আত্মসাৎ করা অমুসলিম মন্দির ও প্রাসাদ বই আর কিছুই নয়।

একটি স্বতঃস্ফূর্ত পরীক্ষা হচ্ছে, এমন কি তুরস্কেও মুসলিমদের দিনে পাঁচবার প্রার্থনায় যোগ দেবার আহ্বান জানানোর সময় ঐ বাদন-গৃহে সঙ্গীতের চর্চা হয় কিনা। তাজমহলেও ঐ বাদন-গৃহটি নীরব করে রাখা হয়েছে সেদিন থেকে, যখন ঐ তেজমহালয় নামে শিবমন্দিরটি ইসলামের নামে দখল ও ব্যবহার করা হয়।

Harvard এর অধ্যাপক Grabar-এর এই এলোমেলো যুক্তিতে সারা পৃথিবী জুড়ে ইতিহাস চর্চার বিরাট ত্রুটি ধরা পড়ে। মনে হয়, তথাকথিত সমস্ত বিদগ্ধ ঐতিহাসিকেরাই যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণ যাচাইয়ের কাজে দুর্বল।

সারা পৃথিবীতে এরূপ আরো বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক সৌধ অনুসন্ধান করে দেখা দরকার, এগুলোতেও বাদন-গৃহ আছে কিনা। যদি থাকে, তবে স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঐ দখলীকৃত প্রাসাদ একটি প্রাক্-মুসলিম যুগের মন্দির বা সৌধ।

তাজমহলের ভিত্তির চারকোণে চারিটি স্তম্ভের তাৎপর্যও হয়তো সাধারণের বিভ্রান্তির হাত এড়ায় না। লোকে ভুল করে এগুলোকে মিনার বলেই মনে করেন। তাঁরা ভুলে যান যে, তাজমহলকে একটি মুসলিম স্মৃতিসৌধ ভাবলে এর কোন মিনার থাকা উচিত নয়। কারণ, মিনারে উঠে মুয়াজ্জিম আজান দিয়ে থাকেন অর্থাৎ জনতাকে প্রার্থনার জন্য সমবেত হতে বলেন। কিন্তু, সাধারণত

মুসলিমরা প্রার্থনার জন্য কবরে সমবেত হন না বলে এখানে মিনার থাকা অপ্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, মিনারগুলো ভিত্তি থেকে না উঠে ছাদের ওপর থেকে শুরু হওয়া উচিত ছিলো। আবার, পশ্চিমের ঐ তথাকথিত মসজিদেও একটিও মিনার নেই। সাধারণ লোক হয়তো এত স্পষ্ট অসঙ্গতির কথা ভেবে দেখেন নি। কিন্তু এই জাজ্বল্যমান অসঙ্গতিতেই বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় ঐ মর্মর প্রাসাদটি স্মৃতিসৌধ তো নয়ই, পশ্চিমের লালপাথরের বাড়ীটিও মসজিদ নয়। পূর্ব ও পশ্চিমের একই ধরণের দুটো লালপাথরের বাড়ী ঐ শিবমন্দিরের ধর্মশালা বা সরাই হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

তাজমহল সম্পর্কে আমাদের গবেষণার একটি আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, প্রাচীনকালে আগ্রা ছিলো একটি বৃহৎ এবং সুদৃঢ় হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজধানী। তাই, পরমসুন্দর তেজ মহালয়ের অবস্থিতি ছিলো এখানে। মুসলিম আক্রমণকারীরা আগ্রাকে তাঁদের রাজধানী করায় বোঝা যায় যে, আগেও রাজধানী হিসেবে আগ্রার প্রসিদ্ধি ছিলো। শৌর্য, ক্ষমতা ও গৌরবের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানই পরবর্তী আগন্তুকরা তাদের কর্মকেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়। আগ্রা অর্থাৎ অগ্রকোট নামও রাজত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীই বোঝায়।

আমরা আশা রাখি যে, বিবেকী লেখকরা এরপর শাজাহানের কীর্তি হিসেবে তাজমহলকে নিয়ে লেখা বন্ধ করবেন। আরো আশা করি যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, ভ্রমণসংস্থা ও সংবাদপত্রগুলি শাজাহানকে তাজমহলের নির্মাতা বলে অবিরত ঢক্কানিনাদ বন্ধ করবেন। তাজমহলের সত্যিকারের পরিচয় উদ্ঘাটনে আগ্রহী লোকেরা এগিয়ে এসে আইনের সাহায্য নেবেন।

গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্যাবলীর নির্দেশিকা

1. P. 3, The history of India as told by its own Historians, Vol. VII, the Posthumous papers of the late Sir H.M. Elliot, K. C. B, edited by Professor John Dowson, M. R. A. S., published by Kitab Mahal (Private) Ltd. 56-A, Zero Road, Allahabad-1.
2. Persian Text of Mullah Abdul Hamid's Badshahnama, in two volumes, published by the Asiatic Society of Bengal in the Bibliotheca Indica Series. Photostat was obtained from the copy in the National Archives, Government of India, in December 1965. Copies of that publication are available in all important insututional libraries through-out the world, dealing with Indian medieaval history.
3. This point has been more fully dealt with in chapter II of the Author's book 'Some Blunders of Indian Historical Research', published in July 1966.
4. P. 253, Elliot & Dowson, Vol. VI. It is stated 'De Sacy also mentions the exaggerated account of property and expenditure, as to the number of elephants, horses etc. and the cost of buildings and such like in the Memoirs (of Jahangir), translated by Price, compared with the more moderate statements given in Anderson's extract.
5. Information of Tavernier may also be had from Pp T 3-4 Maharashtriya Jnyankosh, Vol. 14, edited by Dr. S. T. Ketkar and associates.
6. P. 109-111, Travels in India, Vol. I by Jean Baptiste Travernier' Baron on Aubonne. Translated from the original French edition of 1671. With a biographical sketch of the author, notes, appendics etc. by Dr. V. Ball, L. D, F. R. S., F. G. S in two volumes, Macmillan & Co., London, 1819.
7. P. 758, Encyclopedia Britannica, Vol. 1 ; 1964 ed.
8. P. 714, Badshahnama, Vol. II states, "Wa panj lakh rupaya bar rauzaya munavvaraa ki binaaya maanind ann barruje zameen deede aasman na deeda.'

9. P. 29, The Taj, by Kanwar Lal, published by R K. Publishing House, 57 Daryaganj, Delhi, Price Rs. 30/-.
10. P. 403 Badshahnama, Vol I line 'Sale ayandeh'.
11. Pp 35-36 Maharashtriya Jnyankosh, ibid, Vol. 15.
12. Pp. 758, Encyclopedia Britannica, 1964 ed Vol 21.
13. Pp. 109-111. Travels in India, ibid.
14. P. 19, Vol II.
15. P. 503, Badshahnama, Vol I last line.
16. Pp. 35-36 Maharashtriya Jnyankosh, idid, Vol. 15.
17. The Illustrated Weekly of India dated December 30, 1951, ibid.
18. P. 154, Keene's Handbook for Visitors to Agra and its Neighbourhood, Rewritten and brought up to date by E. A Duncan, Thacker's Handbook of Hindusthan.
19. P. 52, Rambles and Recollections of an Indian Official, Vol. II by Lt Col. W. H. Sleeman. Republished.by A. C. Majumdar, 1888, printed at Mufid i-Am Press, Lahore.
20. P. 154, Keene's Handbook, ibid.
21. ibid.
22. P. 10, The Taj by Kanwar Lal, ibid.
23. P. 14, Guide to the Taj at Agra (compilation) printed at the Victoria Press, Lahore, by Azezuddin.
24. P. 151, Keene's Handbook, ibid.
25. Pp 35-36 Maharashtriya Jnyankosh, ibid, Vol. 15.
26. P. 758, Encylopedia Britannica, ibid. Vol. 15.
27. History of the Shahjahan at Delhi, by Professor B. P Saxena.
28. P. 152, Keene's Handbook, ibid.
29. Pp 42-43, The Taj by Kanwar Lal, ibid.
30. The Illustrated weekly of India, ibid.
31. Pp. 1047 the 19th Century and After, Vol. III. a monthly review edited by James Knowles, article titled 'The Taj and the Designers.'
32. Preface to Albiruni's India by Dr. Edward. C. Sachau.
33. P. 1040, the 19th Century and After, Vol. III, ibid.
34. Transactions of the Archaeological Society of Agra, January to June, 1878.
35. P 14 of the Volume.
36. P 152, Keene's Handbook, ibid.
37. Pp 44-45, The Taj by Kanwar Lal, ibid.

38. P 8, The Taj and its Environments, 2nd ed, printed by R. G. Bansal & Co., 339, Kassairal Bazar, Agra.
39. P 1041, the 19th Century and after, ibid, Vol. III.
40 Pp VII-IX, Transactions of Archaeological Society of Agrå, January to June, 1878.
41. P 281, Elliot & Dowson History bid, Vol. III.
42. P 36 Elliot & Dowson, History, ibid, Vol. VII.
43 Pp 42-43, The Taj by Kanwar Lal ibid.
44. P 26 ibid.
45. P 27, ibid.
46 P 13, Maharashtriya Jnyankosh, ibid.
47. P 69 The Taj by Kanwar Lal, ibid.
48 P 38, Keene's Handbook, ibid.
49. P III, Travels in India by Tavernier, ibid.
50. Pp 5-6, Elliot & Dowson, History, ibid, Vol. VII.
51. P 178, ibid.
52. Pp 3-133 ibid.
53. Pp 19 25, ibid.
54. ibid.
55. Pp 178-179, ibid.
56. Pp 446-447, ibid, Vol. III, Translation of Malfuzai-i-Timuri or Tuzaki-Timuri, the Autobiography of Timur.
57. Pp 447-448, ibid.
58. Pp 192 and 251, Memoirs of Zehir-Ed-Din Mahammad Babur, Emperor of Hindhusthan, Vol. II, written by himself in the chagtai Turki.

    Translated by John Leyden and William Erskine, annotated and revised by Sir Lucas King in two volumes Humphery Milford, Oxford University Press, 1921.
59. P 90, Akbar the great Moghul by Vincent Smith.
60. P 951, Elliot & Dowson, History. ibid, Vol. VI.
61. Pp 257-260, ibid.
62. P 349, ibid.
63 P 27, ibid.
64. P 3, The Taj and its Environments, ibid.
66. Even Mumtaj's year of birth, like every other detail, seems to be fictitious. According to Mulla Abdul Hamid Lahori, quoted earlier in this chapter, Mumtaj Mahal was in her fortieth year when she died. Since she died around 1639, she must have been born circa 1590, anb yet in Maulavi Moinuddin's book, the date of Mumtaj's birth is stated to be 1594.

66. 11, Agra—Historical & Descriptive, with an account of Akbar & his court and of the Modern City of Agra by Syed Mohammed Lataf (Khan Bahadur,) printed at Calcutta Central Press Co. Ltd., 40. Canning St., Calcutta, 1896.

67. In the preceding foot-note we have shown how Mullah Addul Hamid claims that Mumtaj was in her fortieth year (and not the thirty seventh) when she died.

68. Pp 176-177 Stori do.Mogor or Mogul India 1653-1703 byNiccolas Manucci.

69. P 758, Endyclopedia Britannica, Vol- I.

70. Pp 109 111, Travels in India, ibid, Vol. 1.

71. P 37, The Taj and its Environments, ibid.

72. P 39, ibid. Perhaps he means the multistoreyed redstone tower on the opposite side near the Jawaab alias Jammat Khanna.

73. P 339, Travels in the Mogul Empire by Francis Bernier. Translated by Irving Brock in two Volumes. William Pickering, Chancery Lane, London 1825.

74. P 251, Ibid.

75. P 14, Guide to the Taj of Agra ; ibid,

76 Published by S. D Kale and M. D. Kale, price Rs 2·50. Obtainable from Mr. M.D. Kale, Advocate, Madhya Pradesh, India.

77. (i) Taj Mahal was a Rajput Palace.
(ii) Some Blunders of Indian Historical Researh.

78. P 45, Elliot & Dowson, History, ibid, Vol. VII.

79. P 6, ibid

80. P 45, ibid

81 Pp 45-46, ibid

82. P 5, Imperial Agra of the Moghuls by K. C. Majumdar.

83. P 38, foot note, Keene's Handbook, ibid.

84. P 24, Rambles and Recollections of an Indian Official, ibid.

85. P 171, Keene's Handbook, ibid.

86. History of the Shahjahan at Delhi by Prof. B. P. Saxena,

87, Dealt with in more details in this author's Some Blunders of Indian Historical Research, in a special chapter on the topic.